
Sewam Sam
কাজী
আনোয়ার
হোসেন
পাশের
কামরা
BanglaPDF.Net

রানা-৯৮

পাশের কামরা

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

ডিউকের ছদ্মবেশে রানা যতই মাস্তানী করুক না কেন,আসলে এ পরিচয়ে অত্যন্ত দুর্বল ও একা সে। এবং এই দুর্বলতার সুযোগই নিল অপরিচিত এক লোক। একটা টেলিফোন করে ফাসিয়ে দিল ওকে অদ্ভুত এক খুনের মামলায়। এইবার বুঝ ঠেলা।

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
৩৬, বাংলাবাজার
ঢাকা।

PASHER KAMRA

By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলা দেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
একা।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
টানে সবাইকে কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
এক টানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

প্রতিটি কাহিনী আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

এক

'চাকরি খুজতাছেন ? ডিউক সাহেবের আপিসে ? হেঁ-হেঁ· হেসেই গড়িয়ে পড়ে লোকটা। 'দেহেন, আমি তার পাশের আপিসে এক বচ্ছর ধইরা আছি···বেবাকই জানি···

কিন্তু বেকার যুবক তবু দমে না। বলে, 'তা একটু খোঁজ-খবর নিলে ক্ষতি কি···?'

'ক্ষতি? আছে।' লোকটা মুখ নামিয়ে আনে। 'ডিউক সাব কেডা, জানেন কিছু? সে কিমুন মানু, করেডা কি, কেমনে তার চলে, কই এসব কিছু জানা আছে আপনের?'

'কেন? সাইনবোর্ডে তো লেখাই আছে—কনসালট্যান্ট।'

যুবকের চোখের সামনে বুড়ো আঙুল নাচায় লোকটা। 'আরে শোন, ছালটেন ফালটেন কিছু না। মাস্তান—শহর ঢাকার জবরদস্ত মাস্তান। আবার জিগান, ক্ষতি কি? আরে সাব, জান লইয়া টানাটানি পইড়া যাইব···'

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় বেকার যুবক। 'কিন্তু এমন সাজানো গোছানো অফিস···'

'ওগুলা অইল বাইরের শো। উপরে ফিটফাট, ভিতরে…বুঝলেন না? আগে যেখানে আছিল সেখানে তারা নিয়া গোলমাল বাধছে—তাই এইখানে আইসা উঠছে। রঙ্গি বিল্ডিং অইল সব বিজিনেস-পার্টির আপিস—দেখতাছেন না সব চেরাবোল কোম্পানী, সিনেমা কোম্পানী, ইনডেন কোম্পানী—মানে অইল বেবাকই কোম্পানীর আপিস, ডিউক ওস্তাদ সাবের একখানা সাইনবোর্ড লটকাইয়া রাখছে—মইধ্যে মইধ্যে এহানে আইসা থাহেও।'

'উনি এখানে থাকেন?' হঠাৎ একটু উৎসাহিত হয়ে ওঠে বেকার যুবক। 'তাহলে তো কাজ কাম কিছু আছেই…'

'কচুডা আছে। ঘরের পুলাপানগো মাঝেমধ্যে আমরাই কইরা দেই—বকশিস দেয়।' হঠাৎ যুবকের দিকে ঝুঁকে পড়ে লোকটা। অনেকটা শাসাবার ভঙ্গিতে বলে, তা মতলবটা কি? আমার এই বকশিসের চাকরিটা খাইবার চান নাকি? মনে রাখবেন, আমার নাম হুকুম আলি…

হুকুম আলি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠায় একটু থতমত খেয়ে যায় যুবক, কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে আবার সে তার দুরবস্থার একটা বয়ান শুরু করে। কিন্তু এসব একেবারেই শুনতে রাজি নয় হুকুম আলি, তার উত্তেজনা আরো বাড়তেই থাকে। বলে, 'সোজা রাস্তা মাপেন, দুরবস্থা সাব। এহানের সব লোক ডিউক সাবের উপরে চেতা, ডরায় দেইখা বাইরে কিছু কয় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রঙ্গি বিল্ডিং থেইকা তারে খেদাইবার তালে আছে। খামোকা ঝুট-ঝামেলায় মইধ্যে নিজেরে টাইনা আইনেন না—কাইটা পড়েন।'

করুণ মুখে উঠে দাঁড়াল যুবক। 'আচ্ছা ভাই, আসি,' বলে বর্ণবীথি বাণীচিত্রের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

পাশের কামরা

সামনেই সারি সারি অ্যাপার্টমেন্ট। দরজায় হরেক রকম সাইন-বোর্ড। প্রথমেই বর্ণবীথি বাণীচিত্র, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক এরা। তারপর জোহরা ট্রাভেল। ছোট একটা প্যাসেজ, প্যাসেজের ওপাশেই আরেকটা সাইনবোর্ড—মিঃ ডিউক, কনসালট্যান্ট। পাশেই বেশ বড় একটা সাইনবোর্ড—জাকের আলি চৌধুরী, ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট। প্যাসেজের মুখে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেকার যুবকটি, দেখল, বর্ণবীথি বাণীচিত্রের দরজায় দাঁড়িয়ে তার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হুকুম আলি। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে প্যাসেজ ধরে সোজা হাঁটতে শুরু করল সে যুবকটি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল হুকুম আলি. তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে থামল ডিউকের অফিসের সামনে। টোকা দিল দরজায়।

'কাম ইন,' কবাট খোলার আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল রানা। 'কি ব্যাপার, হুকুম আলি?'

'ভিড়, স্যার। ঝুট-ঝামেলা। চাকরির জন্যে বহুত মানু লাইন দিতাছে। তাই কই কি…'

'দরজায় একটা নো ভ্যাকেন্সি সাইনবোর্ড, এই তো? ঠিক আছে…'

ঠিক এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। ইঙ্গিতে হুকুম আলিকে বিদায় নিতে বলে রিস্টওয়াচ দেখল রানা। ছ'টা বেজে দশ। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল ও, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে তুলে বলল, 'ডিউক বলছি।'

ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড কেউ কথা বলল না অপর প্রান্ত থেকে। লাইনের মধ্যে দিয়ে রানার কানে ভেসে এল একটা প্লেন স্টার্ট

নেবার শব্দ। তেমন জোরাল নয় আওয়াজটা, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কয়েকটা অস্পষ্ট, অস্থান কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল রানা। কিন্তু হঠাৎ করেই সেগুলো আর শোনা গেল না। রানার মনে হল, যে-লোকটা ডায়াল করেছে সে বোধহয় বন্ধ করে দিল টেলিফোন বুথের দরজা।

তারপর হঠাৎ করেই কানে এল ভারি গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর, 'মিঃ ডিউক ?'

'বলুন।'

অপরপ্রান্তে আবার একটু বিরতি, যেন মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে লোকটা। 'আমাকে আপনি চিনবেন না, তবে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি আমি

'জানি না কি শুনেছেন।' গলাটা আরো গম্ভীর করে বলল রানা। 'আপনি কে বলছেন ?'

আবার কিছুক্ষণ বিরতি। তারপর গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ। রানার মনে হল, কিভাবে শুরু করবে তা যেন ভেবে পাচ্ছে না। 'আমার হাতে সময় খুব কম। এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। আমি আপনার সাহায্য চাই।'

'ও, তাহলে এই শুনেছেন—আমি সাহায্য করি ?'

'আমার খুব বিপদ, মিঃ ডিউক। আগে আমার কথাটা শুনুন, প্লীজ।'

রাইটিং প্যাড আর বলপয়েন্ট টেনে নিল রানা। 'আপনার নাম আর ঠিকানা বলুন।'

'আতিকুল্লাহ খান, ৩৮/খ, উত্তর বাসাবো।'

লিখে নিল রানা। 'এবার বলুন, কি সাহায্য দরকার আপনার ?'

'আমার···মানে, আমার পরিবারের খুব বিপদ। আমার স্ত্রীর ওপর হুমকি এসেছে।' আবার কিছুক্ষণ বিরতি। আবার অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল একটা প্লেন স্টার্ট নেবার আওয়াজ। আত্তিকুল্লাহ খান কিছু বলল, কিন্তু জেট ইঞ্জিনের আওয়াজে তার কথা স্পষ্ট শুনতে পেল না রানা।

'শুনতে পাচ্ছি না, আবার বলুন···

ক্ষীণ হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল প্লেনের আওয়াজ। তারপর হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে শুরু করল লোকটা। 'বিশেষ কাজে কোলকাতা যেতে হচ্ছে আমাকে। এই খানিক আগে খবর পেলাম, আমার স্ত্রীর একটা বিপদ হতে পারে। এই রকম একটা ভয়ংকর খবর, ওকে জানান উচিত মনে হল না। পুলিশের কথা ভাবছিলাম, তখনই আপনার কথা মনে পড়ল। এমন একটা ব্যাপার যে কি বলব, মিঃ ডিউক—আমি পরশু, মানে রোববারে ফিরে আসছি, তখন সব খুলে বলব। ভেবে দেখলাম, আপনার সাহায্যটাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল হবে। আর বিপদটা ঘটতে পারে আজ রাতেই··· তিন বছরের একটা ছেলে আছে আমাদের···মিঃ ডিউক···'

সাহায্য? এই রকম আরো অনেকগুলো টেলিফোন কলের কথা মনে পড়ে গেল রানার। ওগুলোর মতো এটাও কোন ফাঁদ বা অপ-কৌশল নয় তো? কে জানে। তবে, সন্দেহ করে ভদ্রলোকের সাহা-য্যের অনুরোধ এড়িয়ে যাবারও তো কোন মানে হয় না। একটু বরং বাজিয়ে দেখা যাক।

'আপনি কি করেন, মিঃ খান?'

হঠাৎ যেন কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা। 'আমি নিউম্যানে আছি।'

নিউম্যান করপোরেশন নাম করা একটা বহুজাতিক সংস্থা। বাংলাদেশে এদের ওষুধ, প্রসাধনী ইত্যাদির বিরাট কারবার। বাজারে এদের তৈরি জিনিসের যেমন ছড়াছড়ি, রেডিও-টেলিভিশন পত্রিকা খুললে এদের বিজ্ঞাপনেরও তেমনি ধুমধাম।

'আমার সাহায্য পেতে হলে কিছু শর্ত মেনে নিতে হয়, আশা করি সে-সবও শুনেছেন আপনি?' ব্যাপারটার দ্রুত সমাপ্তি চাইছে রানা। ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। খেলতে এসেছে, কাজেই খেলতে হবে সনাতন নিয়মেই।

'হ্যাঁ, শুনেছি। ফী র অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স করতে হয়। পার্টির যদি অন্য কোন মতলব থাকে, সে-টাকা আর ফেরত পাওয়া যায় না। আমি একজন বিপদগ্রস্ত লোক, মিঃ ডিউক, এর মধ্যে আর কিছু নেই। আমার বিপদটা জেনুইন। কিছু লোক বেশ কিছুদিন থেকে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে, ওদেরই নতুন চাল, আমার স্ত্রীর ক্ষতি করবে—আপনাকে সব আমি খুলে বলব। এখন কাইগুলি বলুন কত অ্যাডভান্স পাঠাব আপনাকে?'

'পাঁচ হাজার।'

'ঠিক আছে,' এক কথায় রাজি হয়ে গেল আতিকুল্লাহ খান। 'এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার স্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত মনে বিদেশে যেতে পারি তো, মিঃ ডিউক?'

'আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব। কিন্তু আপনি একবার সময় করে আমার এখানে আসতে পারেন না, মিঃ খান? এসব ব্যাপারে ক্লায়েন্টের সাথে সামনাসামনি বসে কথা বলতে চাই আমি।'

'আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এখন আমার হাতে একেবারেই

সময় নেই। প্লেন টেক-অফ করতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। কোলকাতা থেকে ফিরে, রোববারেই, আপনার সাথে দেখা করব আমি। এই ক'টা দিন, মানে আমি যে সময়টুকু থাকব না, আপনি দয়া করে আমার স্ত্রীর ওপর খেয়াল রাখবেন, মিঃ ডিউক। বাচ্চা একটা ছেলে আছে আমার···আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি তো?'

'নিশ্চিন্ত? আল্লাহ ভরসা।' লাইনে আবার প্লেনের আওয়াজ শুনতে পেল রানা, এবারের শব্দটা মনে হল ল্যাণ্ড করার। 'কিন্তু আপনার স্ত্রী সম্পর্কে এখনও আমি কিছু জানতে পারিনি, মিঃ খান। তাঁর চেহারার বর্ণনা···'

'বললাম তো, ৩৮/খ, উত্তর বাসাবো আমার ঠিকানা। আর সময় নেই আমার, মিঃ ডিউক। যেতে হচ্ছে এখনই। রোববারে দেখা হবে। খোদা হাফেজ।' কেটে গেল লাইন।

রিসিভার রেখে দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। ভাবল, তড়িঘড়ি ঠিকানা বদল করে এই রদ্দি বিল্ডিঙে মস্তান আসা উচিত হয়নি। তখন ভেবেছিল, মাস্তান ইমেজটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এই বাচাল লোকজনের এলাকাটাই হবে তার জন্যে সুবিধাজনক। তবে মাস্তান ইমেজটার মতো কনসালট্যান্ট লেখা সাইনবোর্ডটাও কম ভোগাচ্ছে না ওকে। পৃথিবীতে কত বিচিত্র রকমেরই যে মানুষ আছে, আর তাদের কত বিচিত্র রকম সমস্যা আর উদ্দেশ্য। তবে ক্যাপাটে টাইপের মক্কেলরাই বেশি গোলমাল পাকায়। আজকের এই আতিকুল্লাহ খানও বোধহয় তাই—ক্যাপাটে। বিপদ টিপদ হয়ত বানানো কথা, সন্দেহ হয় বাতিক থাকতে পারে, বউকে বোধহয় সন্দেহ করে। দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে এই সুযোগে বউ কিছু করে কিনা জানতে চায়। এই সূত্রে মাস্তান ডিউকের সাথে পরিচয়ও হয়ে গেল, কারো সাথে

বউয়ের ক্ষতিনষ্টি থাকলে তাকে যথাসময়ে ধোলাই দেয়া যাবে—শেষ পর্যন্ত হয়ত এই রকম কিছু প্রমাণিত হবে। সে যাই হোক, টেলি-ফোনে এই রকম একটা ভৌতিক গলা শুনে ছুটে যেতে রাজি নয় সে, ভাবল রানা। তবে, ভদ্রলোককে যখন কথা দিয়েই ফেলেছে, দায়িত্বটা এড়িয়ে যাওয়াও তো আর সম্ভব নয় এখন। ঠিক আছে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, সোহেল বা গিলটি, যাকে হোক একজনকে পাঠিয়ে দিলেই হবে। তার নিজের যাবার দরকার নেই।

ঠিক এই সময় টোকা পড়ল দরজায়। আবার হুকুম আলি? না, ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতর ঢুকল পত্রবাহক টাইপের একজন। হ্যাঁ, পত্রবাহকই। এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর মোটাসোটা একটা এনভেলাপ রাখল সে। হাতের খাতাটা খুলল, এগিয়ে দিল সই করার জন্যে।

একহারা, লম্বা চেহারা লোকটার, মুখে ভাঁজের হিজিবিজি দাগ। চোখ দুটো অবশ্য বেশ সতর্ক, রানার সই করাটা বেশ খেয়াল করে দেখল। তারপর খাতাটা টেনে নিয়ে ফের বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

এনভেলাপ খুলল রানা। ভেতরে পাঁচ শো টাকার দশটা নোট আর ছোট একটা চিরকুট। চিরকুটে লেখা: 'প্রেরক: আতিকুল্লাহ খান, ৩৮/খ, উত্তর বাসাবো, ঢাকা-১৪।'

অবাক হল রানা। এত তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক এখানে টাকা পাঠাল কিভাবে? বিদেশের মতো ঢাকায়ও কি তবে এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার সার্ভিস চালু হয়ে গেছে? বছর কয়েক আগে চালু হবে বলে শুনেছিল বটে, কিন্তু তারপর আর খবর রাখা হয়ে ওঠেনি। বেশি বেশি দেশের বাইরে থাকলে এই হয়। দেশের অনেক নতুন ব্যাপার

জানতে হয় অনেক পরে। এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার সার্ভিসও হয়ত অনেক দিন হল চালু হয়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ তার জানায় সুযোগ হল। যাই হোক, ওদের সাথে এরকম টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই আছে আতিকুল্লাহ খানের। রানার সাথে কথা শেষ করে টেলিফোনে টাকা পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছে কোম্পানীকে। আর এই কোম্পানীর অফিস রক্সি বিল্ডিঙে বা আশপাশে কোথাও থাকাও বিচিত্র নয়।

টেলিফোন-গাইডের পাতা ওল্টাল রানা। নিউম্যান করপোরেশনের নির্ধারিত অংশে কোথাও আতিকুল্লাহ খানের নাম পাওয়া গেল না। চেয়ার ছেড়ে উঠতে হল ওকে। বুক-শেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মিউনিসিপ্যালিটির স্ট্রীট ডাইরেক্টরিটা নেড়েচেড়ে দেখল। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। ৩৮/খ, উত্তর বাসাবোয় অন্য এক ভদ্রলোক থাকেন, কোন আতিকুল্লাহ খানের নাম সেখানে নেই।

ব্যাপারটা কি হতে পারে? ভদ্রলোক কি তবে নিউম্যান করপোরেশনের কোন নতুন পদস্থ কর্মকর্তা? আর ওই বাড়িটা কি তিনি ভাড়া নিয়ে আছেন? কেমন যেন একটু খটকা লাগছে, তবে এমনটি হতেও তো পারে। 'ধুস···মরুকগে।' আতিকুল্লাহ খানকে মাথা থেকে বের করে দিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল রানা। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েশ করে একটা টান দিল সিগারেটে। ভাবল, সন্ধ্যাটা আজ কি করে, কার সাথে কাটান যায়। প্রিয় বান্ধবীদের কয়েকটা মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। বাছাই পর্ব শুরু হয়ে গেল মনের ভিতর, ঠিক এই সময় সিগারেটের ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলতে গিয়ে চোখ পড়ল এনভেলাপটার ওপর। আকাশ থেকে যেন ধপ করে মাটিতে পড়ল রানা। 'টাকা নিয়েছি।' বিড় বিড় করে নিজের

সাথেই কথা বলছে ও। এখন আর দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব নয়। তাছাড়া, এর ভেতর কোন গোলমাল আছে তার এই ধারণাটা যদি সত্যি না হয়? যদি সত্যি কোন বিপদ হয় ভদ্রমহিলার? এর সাথে হয়ত জড়িয়ে পড়বে একটা শিশুও।

আবার রিস্টওয়াচ দেখল ও। ছ'টা পঁয়ত্রিশ। সাড়ে সাতটার আগে শাহের বা সৈকতকে পাওয়া যাবে না, ওরা কাজে ব্যস্ত থাকবে, জানে ও। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল একটু। অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। প্রিয় বান্ধবীদের একজনকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়ার আগে জরুরী একটা কাজ সারতে হবে ওকে। কামিজের মেয়ে পপি * আছে বোর্ডিঙে, প্রতি শুক্রবারে তাকে দেখতে যায় ও, তাছাড়া, বোর্ডিঙ স্কুলের বেতন ইত্যাদি দেবার আজই শেষ তারিখ।

দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এল রানা। করিডোর ধরে হেঁটে লিফটের কাছে চলে এল। রানার ঠিক পাশের কামরাটা ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট জাফের আলি চৌধুরীর অফিস। তার ভরাট কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, বেশ জোর গলায় কি যেন একটা ডিকটেশন দিচ্ছে সেক্রেটারীকে। ভদ্রলোক যেচেই কয়েকবার আলাপ করতে এসেছেন রানার সাথে, কিন্তু তার আলাপ ওই একটাই—বিজনেসটা তেমন জমিয়ে তোলা যাচ্ছে না।

বর্ণবীথি বাণীচিত্রের দরজা থেকে হুকুম আলি কিন্তু দেখে ফেলেছে রানাকে। এলিভেটর নিচে থেকে উঠে আসার আগেই প্রায় উড়তে উড়তে পৌঁছে গেল সে। 'স্যার কি রাইতের কামে চললেন?'

হুকুম আলি লোকটা কথাবার্তায় এই রকমই, কিন্তু মানুষ সে

---

* বিষ নিঃশ্বাস দ্রষ্টব্য।

খারাপ না। মাস্তান ডিউকের ব্যাপারে তার আগ্রহ আর কৌতূহলের সীমা নেই ; শুধু নগদ প্রাপ্তির আশায় ফরমাশ খাটে না, এক ধরনের বীরপূজার ভাবও আছে তার মধ্যে। মাস্তান জীবনের কল্পিত কিছু দুঃসাহসিক কাহিনী মাঝে-মধ্যে তাকে শোনায় রানা, সে একদম হাঁ হয়ে শোনে।

'অফিস থেকে তোমার এখন ছুটি, তাই না ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, যেন "রাইতের কামে" তাকে নিয়ে যেতে চায় ও। কিন্তু এই রকম ভয়ংকর আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাবার বুদ্ধিও হুকুম আলি রাখে।

'কি যে কন সাব, ফিলিম কোম্পানীর কাম কি আর শেষ অইতে চায়! তার মইদ্যে এহন আবার নতুন ফিলিম রিলিজ দেওনের টাইম।' হঠাৎ কৌতূহলে চোখ দুটো চক চক করে ওঠে হুকুম আলির। 'তা স্যার, আইজকার কামটা কি ?'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে টেলিফোনের আলাপ কিছুটা শুনে থাকবে হুকুম আলি, সেজন্যেই বোধহয় আজকের কৌতূহল একটু বেশি। গম্ভীর হয়েই বলল রানা, 'তেমন কিছু না। এক ভদ্রলোকের বউ বিপদে পড়েছেন, তার ওপর নজর রাখতে হবে।'

যেন দুর্ধর্ষ ফাইটিং ছবির গন্ধ পেল হুকুম আলি। 'তাই নিকি ?' আগ্রহ আর উত্তেজনায় চোখ দুটো তার গোল গোল হয়ে ওঠে। 'কিমুন দেখতে ?'

'তুমি সুচিত্রা সেনকে দেখেছ ?'

'কত।'

'নার্গিসকে ?'

'হ।' উৎসাহে একদিকে প্রায় কাত হয়ে পড়ে হুকুম আলি।

'ভদ্রমহিলা ওদের কারো মতো দেখতে নন,' বলে একটু হাসল

রানা।

একটু হকচকিয়ে গিয়ে চোখ পিট পিট করল হুকুম আলি, তারপর বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল। 'আপনে স্যার আমার লগে মসকরা করেন হেঁ-হেঁ...'

নিচে নেমে এসে গাড়িতে চড়ল রানা। সিগারেট ধরাতে গিয়ে একজনের কথা মনে পড়ে গেল। শিমুল। এখনও প্রিয় বান্ধবী হয়ে ওঠেনি সে, কিন্তু প্রায় রোজই একবার করে টেলিফোন করে মেয়েটা। কোন এক ছাত্র সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা না কি যেন, বলে, ডিউককে নাকি তার ভীষণ ভাল লাগে। অথচ সময়ের অভাবে তার সাথে এতদিন বেরুতে পারেনি রানা। দেখা যাক আজকের এই নিরানন্দ সন্ধ্যেটা কেমন কাটে তার সাথে। এত সহজে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরে মনটা খুশি হয়ে উঠল। নোটবুক বের করে দেখে নিল শিমুলের বাড়ির ফোন নাম্বারটা টোকা আছে কিনা। আছে। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ও।

সাতটার সময় বোর্ডিঙ স্কুলে পৌঁছুল রানা। বেতন ইত্যাদি মিটিয়ে দিয়ে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের খোলা মাঠে চলে এল ও। আলো জ্বেলে ব্যাডমিন্টন খেলছে একদল ছেলে-মেয়ে। সবার বয়স ছয় থেকে দশের মধ্যে। ওকে দেখতে পেয়েই খেলা ফেলে কাকা বলে ছুটে এল পপি। তার পিছু পিছু পায়ে পায়ে এগিয়ে এল আরেকটা ছেলে। এই ছেলেটাকে আগেও পপির সাথে দেখেছে রানা, কিন্তু পরিচয় বা নাম জানা হয়নি। সুন্দর দেখতে ছেলেটা, পপির প্রায় সমবয়েসী, এক দেড় বছরের ছোট হলেও হতে পারে। দ্রুত ছুটে আসছে পপি, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে

দ্রুত একটা হিসেব করে নিল রানা—তা, পপির বয়সও তো কম হল না। আগামী জুনে ছয় বছরে পড়বে। ক্লাস টুতে পড়ে, মন্দ নয়।

ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পপি রানাকে। শরীর কেমন আছে, পড়াশোনা ঠিক মতো করছে কিনা, নতুন কি কি দুষ্টামি আবিষ্কার করেছে—এই ধরনের নানান প্রশ্ন করে পকেট থেকে চারটে চকলেটের প্যাকেট বের করল রানা, ওর হাত থেকে সেগুলো ছোঁ মেরে নিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার দিকে তাকাল পপি। 'এই, শোন!' হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে। 'কাকা তোমার জন্যেও চকলেট এনেছে, এস, নিয়ে যাও, সাদেক!'

'তুমি জানলে কিভাবে...'

প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল রানা, চটপট উত্তর দিল পপি, 'বা-রে, সেদিন তুমি না দু'প্যাকেট নিয়ে এসেছিলে! তা থেকে সাদেককে এক প্যাকেট দিয়েছিলাম আমি, সেজন্যেই তো আজ চার প্যাকেট নিয়ে এসেছ।'

'কি বুদ্ধি মেয়ের!' পপির মাথায় ছোট্ট একটা চাঁটি লাগিয়ে দিল রানা, ছেলেটা নিজের জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল ও। 'এস, পপি ডাকছে তোমাকে।'

গুটি গুটি পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। তার হাতে চকলেটের দুটো প্যাকেট গুঁজে দিল পপি। রানা হাসি হাসি মুখে জানতে চাইল, 'তোমার নাম বুঝি সাদেক? পপির বন্ধু?'

রানার চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট কণ্ঠে ছেলেটা বলল, 'আমার নাম মীর সাদেকুর রহমান।' কেন যেন, বলার ভঙ্গিটা যান্ত্রিক, শেখান বুলির মতো শোনাল রানার কানে। হয়ত তাই-ই, যাতে নাম বলতে ভুল না করে সেজন্যে মা-বাবা পাখি পড়ান পড়িয়ে

ছেড়েছে।

'বেশ, বেশ,' উৎসাহ দেখিয়ে বলল রানা। 'কোন্ ক্লাসে পড় তুমি?'

'তাও জান না?' আশ্চর্য হয়ে উত্তর দেয় পপি, 'ও তো আমার ক্লাসেই পড়ে। দু'বছর ধরে আমি ফার্স্ট, ও সেকেণ্ড—অনেক চেষ্টা করছে যাতে ফার্স্ট হতে পারে, কিন্তু আমিও তো পড়ায় ফাঁকি দিই না...' একটু যেন বিষণ্ণ দেখাল পপিকে। 'ওর কোন চান্স নেই, কাকা।'

হেসে উঠল রানা।

বোর্ডিং স্কুল থেকে বেরিয়ে ম্যাণ্ডারিনে পৌঁছুল রানা। বারে ঢোকার আগে টেলিফোন করল শিমুলকে। বাড়িতেই পাওয়া গেল তাকে। রানা তার সঙ্গ চায়, কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্যে বোবা হয়ে গেল মেয়েটা, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে অত্যন্ত পরিণত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে বলল, 'আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। বাড়িতে কিছু মেহমান আছে, ওদেরকে বিদায় না করে বেরুতে পারব না।' আসলে ওসব কিছু না, ভাবল রানা, এই আধ ঘণ্টা ধরে সাজগোজ করবে শিমুল।

বারে একটা কোল্ড ড্রিংক নিয়ে বসেছে রানা, এই সময় মনে পড়ল আতিকুল্লাহ খানের কথা। তাড়াতাড়ি উঠে টেলিফোনের কাছে চলে এল ও। প্রথমে ফোন করল শাহেদকে। ওর বউ বলল, শাহেদ বাড়িতে নেই। খানিক আগে বেরিয়ে গেছে, কোথায় গেছে বলে যায়নি। ম্যাণ্ডারিনের ফোন নাম্বারটা দিয়ে রাখল রানা, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরলে তাকে যেন ফোন করে।

আধ ঘণ্টা পর নয়, প্রায় এক ঘণ্টা পর পৌঁছুল শিমুল। এর আগে দেখা সাধারণ বেশের ছিমছাম মেয়েটিকে চিনতে কষ্ট হল

রানার। রঙচঙে জামদানী পরেছে, প্রসাধনের আড়ালে হারিয়ে গেছে মুখের স্বাভাবিক কমনীয়তা। হরিণীর মতো চঞ্চল পদক্ষেপে বারের ভেতর ঢুকল সে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। কারো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা রানার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল সে, মিষ্টি হেসে বলল, 'সরি, একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি কিছু মনে করনি তো?'

'না-না,' শান্ত হেসে বলল রানা। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'বস।' তারপর যা শুনবার জন্যে এতক্ষণ ধরে সেজেছে, সেই কথাটা বলল, 'তোমাকে যা সুন্দর মানিয়েছে না।'

একটু লালচে হল শিমুলের চেহারা। 'রিয়েলি?'

হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল রানা, শিমুলের জন্যে কোক আনতে বলল। 'কোন তাড়া নেই তো?' ওয়েটার চলে যেতে শিমুলকে জিজ্ঞেস করল ও। 'রাতটা আমার সাথে গল্প করে কাটাতে পারবে?'

উত্তেজনায় চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল শিমুলের। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে শরীর শিরশির করছে মেয়েটার। 'না বাবা। বাইরে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে আব্বা আর আস্ত রাখবেন না।'

খানিক পর রিস্টওয়াচ দেখল রানা। শিমুল জেদ ধরেছে, ডিউকের জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর গল্পটা এখনই ওকে শোনাতে হবে। মনে মনে কি শোনাবে তাও ফেঁদে ফেলেছে রানা। শাহেদের ফোন আসার সময় এখনও উতরে যায়নি, কাজেই গল্পটা শুরু করল ও।

কিন্তু রাত সাড়ে ন'টার পরও যখন শাহেদের ফোন এল না, মনে মনে তাকে বাদ দিয়ে সৈকতের কথা ভাবতে শুরু করল রানা।

গল্পের মাঝখানে 'আসছি' বলে আবার টেলিফোনের কাছে চলে এল ও। ফোন করল সৈকতের বাড়িতে। 'কে, মাসুদ ভাই?' সৈকতের বোন ফোন ধরল অপরপ্রান্তে। 'সৈকতদা তো সেই বিকেলে বেরিয়েছে…না, কোথায় গেছে বলে যায়নি।…না, কোথায় যেতে পারে আমার কোন ধারণা নেই…ফেরে তো সেই অনেক রাতে… এটা কিন্তু ভীষণ অন্যায়, মাসুদ ভাই। যখনই ফোন করেন, শুধু সৈকতদার খোঁজ নেন, এ বাড়িতে আমরা আর কেউ নেই?' রানা যতদূর জানে, বাড়িটায় সৈকতের এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া বোনটি ছাড়া আর কেউ থাকে না। 'কই, ভুলেও তো একদিন আমাদের বাড়িতে এলেন না।'

'ঠিক আছে, আসব একদিন।' বলে তাড়াতাড়ি রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

চিন্তায় পড়ে গেল ও। রিস্টওয়াচ দেখল। পৌনে দশটা। শাহেদ নেই, সৈকত নেই—তবে কি মুকুল, কায়েস এদেরকেও পাওয়া যাবে না?

ভয়ে ভয়ে ফোন করল আবার রানা। প্রথম কায়েসকে। সদ্য বিয়ে করেছে, বাড়িতে থাকারই ষোলো আনা সম্ভাবনা, তবে রানা যদি কোন কাজ দেয় আনন্দের সাথে সেটা করে দেবে সে। কিন্তু ওর বউ জানাল, কায়েস তো গতকাল সিলেট গেছে।

রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রানা। অসহায় বোধ করছে ও। মুকুলই এখন শেষ ভরসা। তাকে যদি পাওয়া না যায়…সর্বনাশ! ডায়াল করতে শুরু করেও হাতটা পাথর হয়ে গেল রানার। ছি, ছি! মনেই ছিল না। টিভির 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানে ধাঁধার উত্তর দিয়ে বাংলাদেশ বিমানের রিটার্ন টিকেট পেয়েছিল,

সেটা নিয়ে সিঙ্গাপুর গেছে মুকুল, ফিরে আসবে পরশু।

এখন উপায়? হাতে রিসিভার নিয়ে ঝাড়া এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল রানা। একে একে আরো কয়েকজনের কথা মনে পড়ল। দু'একজন জরুরী কাজে ব্যস্ত, তাদেরকে পাওয়া যাবে না। দু'এক-জনকে পাওয়া গেলেও, তাদেরকে এই রকম ছোটখাট কাজ দেয়া সম্ভব নয়। আবার রিস্টওয়াচ দেখল ও। দশটা। নিজের ওপর শুধু বিরক্ত নয়, আতিকুল্লাহ খানের স্ত্রীর ভাল-মন্দ ভেবে উদ্বেগ বোধ করল ও। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। বৃথা চেষ্টা জেনেও আরো কয়েক জায়গায় ফোন করল ও। দু'জনকে পাওয়া গেল, কিন্তু তাদের ব্যস্ততার নমুনা শুনে নিজের সমস্যার কথাটা চেপে গেল ও। সবশেষে আবার শাহেদ আর সৈকতের বাড়িতে ফোন করল। ফেরেনি ওরা।

পরাজয় মেনে নিল রানা। মাথা নিচু করে ফিরে এল টেবিলে। ওকে দেখেই উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল শিমুল, 'কি ব্যাপার, ডিউক?'

'কিছু না,' মেজাজ খিঁচড়ে থাকলেও অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বলল রানা, 'খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।' ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিল ও।

রাতটা ডিউকের সাথে কাটানো হচ্ছে না, বুঝতে পেরে মনক্ষুণ্ণ হল শিমুল, রানা সেটা টেরও পেল, কিন্তু কেউই এ-ব্যাপারে কোন কথা বলল না। একটু পরেই টেবিল সাজিয়ে দিয়ে গেল ওয়েটার। হাত চালিয়ে খাওয়া শেষ করল ওরা।

সোয়া এগারোটায় বাদাবোর পৌঁছল রানা। পথে শিমুলকে

তাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। দেরি হয়ে গেলেও, আচরণে কোন রকম তাড়াহুড়োর ভাব নেই ওর মধ্যে। খুব আস্তে গাড়ি চালিয়ে ৩৮/খ নম্বর বাড়িটা পেরিয়ে এল। গজ ত্রিশেক দূরে রাস্তার ধারে ফাঁকা একটা জায়গা, সেখানেই গাড়ি দাঁড় করাল ও। স্টার্ট বন্ধ করে ড্রাইভারের সীট ছেড়ে পেছনের সীটে এসে বসল। এখান থেকে বাড়ির প্রবেশ পথটা পরিষ্কার দেখা যায়।

অপেক্ষা ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে! মনে মনে ভাবল রানা। বাড়টার দিকে তাকিয়ে থেকে বিপদের কোন আলামত চোখে পড়ল না। ভেতরে টোলভিশন চলছে, বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে তার আওয়াজ। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল ও। বেশ রাত হয়েছে, রাস্তায় লোক চলাচল একেবারেই নেই, আশপাশের বাড়ি-ঘরগুলো একটু দূরে দূরে, অন্তত এখন পর্যন্ত কোন জানালা খুলে কেউ লক্ষ্য করছে না ওর গাড়িটাকে।

আধ ঘণ্টা বসে থাকল রানা। নিজের ওপর রাগে ফুঁসছে, তাছাড়া আর করার আছেই বা কি এখন! এর মধ্যে দুটো রিক্সা আর একটা প্রাইভেট মোটর গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে গেছে। আরোহীরা কেউই ওর দিকে তাকায়নি ভাল করে। বারটার দিকে নড়ে-চড়ে উঠল ও। একটা সিগারেট ধরাল। গাড়ি থেকে বেরুতে যাবে, এই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল—আচমকা লাফিয়ে নেমে এল ঘম-কাল অন্ধকার। বাড়িটার প্রবেশ-পথের ওপর চোখ রেখে সিগারেট ফুঁকছে ও, আর ভাবছে আজ ঘুম থেকে উঠে কার মুখ দেখেছিল…

সাড়ে বারটার দিকে ক্লান্তি অনুভব করল রানা। ঘুম তাড়াবার জন্যে আবার একটা সিগারেট ধরাল। এখন পর্যন্ত বাড়িটার গেট দিয়ে একটা বিড়ালও ঢোকেনি বা বেরিয়ে আসেনি। কিন্তু বিদ্যুৎ না

থাকায় নজর রাখতে অসুবিধে হচ্ছে ওর। খানিক পর গাড়ি ছেড়ে নামল ও, রাস্তা পেরোল, চলে এল বাড়িটার গেট পর্যন্ত। ছোট্ট একটা উঠোন দেখা গেল ভেতরে। কিন্তু বাড়ির ভেতর কোন আলো নেই। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় মোমবাতি বা লণ্ঠনের যে ক্ষীণ আলোর আশা করা গিয়েছিল তাও নেই। ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হল না। বাড়ির পিছন দিকটাও ঘুরে এল রানা। না, কোন ঘরে কোথাও আলো নেই। তাহলে টিভির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল যে? পাশের বাড়ির? শুনতে ভুল করেছে ও? হয়ত তাই।

গাড়িতে ফিরে এল রানা। বেশ একটু হতাশ হয়ে পড়েছে ও। মনে হয়, আতিকুল্লাহ খান এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হবার সাথে সাথে তার স্ত্রীও বেরিয়ে পড়েছেন. হয়ত কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন, অথবা··· চিন্তার লাগাম টেনে ধরল ও। অনুমান করে কোন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে যা তা একটা কিছু ভাবা উচিত নয়। তিনি যে বিপদে পড়েননি, তাই বা কে বলবে। দোষটা তো তারই, সময় মতো নজর রাখার জন্যে আসতে ব্যর্থ হয়েছে সে। গাড়িতে ফিরে এসে আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। ভাবছে কি করা যায়। সারারাত এখানে বসে কাটিয়ে দেবার কোন মানে হয় না। একটার মতো বাজে, কোথাও গিয়ে থাকলে, আজ রাতে কি আর ফিরবেন ভদ্রমহিলা? মনে হয় না। কিন্তু তিনি যে বাড়িতে নেই, তাও কি জোর করে বলা যায়? যায় না। হয়ত বিপদ সম্পর্কে তিনিও সচেতন। তাই আলো না জ্বেলে, কোন আওয়াজ না করে এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন মানুষে মনে করে বাড়িতে কেউ নেই। বিশ্লেষণটা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নিজের ওপর অসন্তোষ তাতে আরো বেড়ে গেল। রাতটা এখন এই গাড়ির ভেতর বসেই কাটাতে হবে

তাকে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত। বলা যায় না, রাত আরো খানিকটা বাড়লে সত্যি বিপদ হতে পারে ভদ্রমহিলার।

কিন্তু অপরদিকে অদ্ভুত এক ধরনের অস্বস্তিবোধ করছে রানা, ক্রমেই একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে ওর মনে।

রাত দুটোর দিকে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। চোখে মুখে রোদ এসে লাগতে ভাঙল সে-ঘুম। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ও। গলার কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। ইস্! অন্তত চারটি ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। অথচ এই সময়টাতেই বেশি সজাগ থাকার কথা ওর।

রাস্তার মোড়ে দেখা গেল খবরের কাগজের হকারকে। ৩৮/খ নম্বর বাড়িটাকে ছাড়িয়ে ঠিক উল্টোদিকের একটা বাড়িতে ঢুকল সে। একটু পরই বেরিয়ে এল আবার, গাড়ি থেকে নেমে তার পিছু নিল রানা। আধা-বয়েসী লোক, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল রানার দিকে। তারপর ফিরে দাঁড়াল।

'৩৮/খ নম্বর বাড়িতে পেপার দিলে না যে?' জানতে চাইল রানা।

'হেরা কেউ নাই অহন।' ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল হকারের। 'কেন কন দেহি? আপনারে তো আগে কুনো দিন দেহি নাই?'

চালাক-চতুর লোক, উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে কোন কথা আদায় করা যাবে না। পকেটে হাত ভরে দশ টাকার একটা নোট বের করল রানা। 'ওই বাড়ির লোকদের চেন তুমি?'

'চিনি। কিন্তু হেরা তো ঈদের ছুটিতে দ্যাশের বাড়িতে বেড়াইতে গেছে।

'হেয়া কারা? নাম কি?'

'গজনফর আলি।'

'কিন্তু আমি জানি বাড়িটায় এখন আতিকুল্লাহ খান থাকেন, স্ত্রী আর একটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে।'

দশ টাকার নোটের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল লোকটা। 'আপনে ভুল হুনছেন, সাব। অহন বাড়িটায় কেউ থাহে না। মহল্লার সকল বাড়িতে আমিই পেপার দেই, আর আমি জানুম না?'

'কিন্তু গজনফর সাহেব আর কাউকে বাড়িটা ভাড়াও তো দিয়ে যেতে পারেন?'

'আজ আট-নয় বচ্ছর ধইরা গজনফর সাবে আমার পেপার নিতাছে। আইজ তক্ এই বাড়ি ভাড়া দেয় নাই। পরতেক বচ্ছর ঈদের মাসটা তারা দ্যাশের বাড়িতে কাটায়।'

ঘুরে চলতে শুরু করল লোকটা।

'তুমি এই এলাকায় আতিকুল্লাহ খান বলে কাউকে চেন না?' নোটটা সামনে বাড়িয়ে দিল রানা।

'এই মহল্লার পরতেকরে আমি চিনি, সাব,' দশ টাকার নোটটা আস্তে করে পকেটে ফেলে বলল লোকটা। 'আতিকুল্লাহ নামে এহানে কেউ নাই।' হনহনিয়ে চলে গেল হকার, ওপাশের একটা গলিতে গিয়ে ঢুকল।

বাড়ির নম্বর ঠিক আছে তো? সন্দেহ জাগল রানার মনে। উঁহু, কোন ভুল হতে পারে না। টেলিফোনে নম্বরটা স্পষ্ট শুনেছে ও। তাছাড়া, আতিকুল্লাহর পাঠানো এনভেলাপে যে চিরকুট ছিল তাতে এই নম্বরই লেখা ছিল। তাহলে? ব্যাপারটা কি? ফাঁকা একটা বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করল

লোকটা? রাস্তা পেরিয়ে বাড়িটার গেটের কাছে আবার চলে এল ও। দিনের আলোয় সব এখন পরিষ্কার। দরজা-জানালা তো বটেই, জানালার ভেতরের শাটারগুলো পর্যন্ত কেলা। বাড়িটা একেবারে খালি, কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই।

গাড়িতে ফিরে এল রানা। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল। মেজাজ যে শুধু খিঁচড়ে গেছে তাই নয়, শুধু সে নিজের ওপর রাগ হয়েছে, তাও নয়; ওর বুদ্ধিকে অপমান করা হয়েছে বলে আফিকুল্লাহ খানের ওপর প্রচণ্ড রেগে গেছে ও।

নির্জন ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি ছুটিয়ে রশি মিন্ডিতে পৌঁছুতে পনের মিনিটের বেশি লাগল না ওর।

চাবি বের করে অফিস ঘরের দরজা খুলতে যাবে রানা, কিন্তু তার আগে হাতলে হাত দিয়েই বুঝল ও, দরজা খোলা রয়েছে। অথচ গতরাতে চাবি লাগাতে ভুল হয়নি তার, চাবি লাগিয়ে কবাট ঠেলে দেখেছে সে-কথাও স্পষ্ট মনে আছে তার। একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। ঢুকতেই চোখে পড়ল, ভেতরের দরজা হাট করে খোলা, অথচ ওটাতেও চাবি লাগিয়ে গেছে ও।

সম্ভবত চীনা একটা মেয়ে, দেখতে খুব মিষ্টি, বসে আছে চেয়ারে। ভাঁজ করা হাত দুটো কোলের ওপর। চোখ দুটো শান্ত, কোন চঞ্চলতা নেই। সরু একটা রক্তের ধারা নেমে গেছে ঠিক বাঁ স্তনের নিচে থেকে। মনে হল, খুব কাছ থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাথে গুলি করা হয়েছে। মেয়েটার চেহারায় একটুও আতংকের ছাপ নেই। আতংকিত হয়ে ওঠার আগেই মারা গেছে সে। খুনী বোধ হয় পরিচিত কেউ হবে। একটা হাত বাড়িয়ে মেয়েটার গাল স্পর্শ করল রানা। ঠাণ্ডা। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছে।

মেঝের দিকে ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল রানা। শুধু অপমান নয়, আতিকুল্লাহ খান তার বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ধীরে ধীরে একটা হাত বাড়াল ও। ক্র্যাডল থেকে তুলে নিল ফোনের রিসিভার। থানার নম্বরে ডায়াল শুরু করল।

দুই

পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করার সময় তার এই মঙ্গোলীয় অতিথিকে ভাল করে দেখল রানা। একে বিদেশী মেয়ে, তায় চীনা, বয়স আন্দাজ করা কঠিন। তবে বিশ থেকে চব্বিশের মধ্যেই হবে বলে ধারণা করল ও। পরনের জামা-কাপড়গুলো বেশ দামী, পায়ে আনকোরা নতুন জুতো। হাতের নখগুলোয় যত্নের স্পর্শ, চুলগুলো সযত্নে পরিপাটি করা। সাথে ভ্যানিটি ব্যাগ দেখল না-ও, ভুরু কুঁচকে আশপাশে একটু খোঁজাখুঁজিও করল, নেই। সম্ভবত খুনী নিয়ে গেছে ওটা। কিন্তু না, এই মেয়েকে কস্মিনকালেও দেখেনি রানা।

একটু পরই অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল সিঁড়িতে। সবার আগে ঘরে ঢুকল গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। আগেও দু'একবার তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে ডিউকের। লোকটার চেহারায় ধূর্ততার ছাপ থাকলেও কথায় বা কাজে তার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু

সার্জেন্ট আলতাফকে পিছনে নিয়ে এমন একটা ভারিক্কি চালে ঘরের ভেতর ঢুকল সে, যেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পায়ে ঠেলে সামান্য একটা ব্যাপার দেখতে এসেছে। দু'জনের কেউই রানার দিকে তাকাল না। সোজা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল লাশের সামনে। ঝাড়া তিন মিনিট পরীক্ষা করল। লাশের পাশে কিছু পরীক্ষা করার জন্যে এক সময় হাঁটু মুড়ে বসল আলতাফ। ফয়েজ আহমেদকে সাথে নিয়ে বাইরের ঘরে বেরিয়ে এল রানা।

এরই মধ্যে ফয়েজ আহমেদের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। ডেস্কের ওপর বসল সে, ঝুলে থাকা পা দুটো দোলাতে দোলাতে বলল, 'সত্যি কথা বললে নিজের উপকার করা হবে, ডিউক। মেয়েটা কি তোমার কোন ক্লায়েন্ট ছিল?'

'না। ওকে আমি চিনি না, কোন দিন দেখিনি। খানিক আগে ঘরে ঢুকে ঠিক ওভাবে বসে থাকতে দেখেছি চেয়ারে।'

'হুঁ,' এমন ভাবে মাথা দোলাল ফয়েজ আহমেদ যেন সে আশাই করেছিল ডিউক সত্যি কথাটা বলবে না। 'তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও। নিশ্চয়ই তুমি রোজ এত সকালে অফিস খোল না। আজ কেন এসেছ?'

গত রাতে যা যা ঘটেছে সবই খুলে বলল রানা। প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ করে আলতাফ আর তার সঙ্গীরাও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুনল সব।

'হ্যাণ্ডব্যাগ?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ। 'সেটা কোথায়?'

'আমিও খুঁজেছি। পাইনি। বোধহয় খুনী ওটা নিয়ে গেছে।'

এতক্ষণে সোজাসুজি রানার চোখে তাকাল ফয়েজ আহমেদ।

'নিশ্চয়ই খুব দামী কিছু ছিল মেয়েটার সাথে। কিন্তু যত দামীই হোক, সেটার লোভে একেবারে খুনই করে ফেললে ?'

এই হল বেচারা ফয়েজ আহমেদ। খুব তাড়াতাড়ি খুব সহজ সরল সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত। অবশ্য টেলিফোন করার সময়ই রানার মনে হয়েছিল, ফয়েজের প্রথম সন্দেহটা ওর ওপরই পড়বে।

'হ্যাঁ, খুন করে ফেললাম,' কৃত্রিম বোকার হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল রানা। 'চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার ছিল ওর ভ্যানিটি ব্যাগে, দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার নিজের অফিসে ওকে খুন করলে পুলিশ আমাকে সন্দেহ করবে, এই কথাটা তখন মনে ছিল না। ইন্সপেক্টর, প্লীজ, ভুলটা সংশোধনের একটা সুযোগ দিন আমাকে।' হাসি থামিয়ে চেহারাটা গম্ভীর করে তুলল রানা। 'কাউকে নিজের অফিসে খুন করব, আমাকে দেখে অত বোকা মনে হয় আপনার ? খুন যদি একান্তই দরকার হয়, ঠিকানা খুঁজে বের করে সেখানেই···'

'এটা একটা মার্ডার কেস, কাজেই মস্করা করে ব্যাপারটার গুরুত্ব কমাবার চেষ্টা কর না,' থমথমে গলায় বলল ফয়েজ আহমেদ।

'এটা একটা মার্ডার কেস, কাজেই বোকার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে খুনীকে বেঁচে যাওয়ার সুযোগ দেবেন না।'

কটমট করে তাকাল ইন্সপেক্টর। 'আমাকে বোঝাও, এখানে কি করতে এসেছিল মেয়েটা, তোমার অফিসে ঢুকলই বা কিভাবে ?'

'জানি না। তবে অনুমান করতে পারি ?'

'সেই অনুমানটাই বয়ান করে কৃতার্থ কর আমাকে।'

গতকালকের টেলিফোন ও রাতে বাড়ি পাহারার কথা আবার বলল রানা। তারপর বলল, 'হয়ত আমার কোন সাহায্য দরকার

ছিল মেয়েটার। কিন্তু ওর সাথে আমার দেখা হোক তা চায়নি আতিকুল্লাহ খান। মেয়েটার যখন আমার চেম্বারে আসার কথা তার আগেই আমাকে ফাঁকা একটা বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিল। তালাগুলো সাধারণ, খুলতে কোন অসুবিধে হয়নি তার। ঘরে ঢুকে মেয়েটা দেখে আমার ডেস্কের ওপাশে বসে আছে একজন লোক, মানে খান, কিন্তু খানকেই ডিউক বলে মনে করে সে। লোকটাকে চিনত না মেয়েটা, ওর মুখে আতংকের কোন ছাপ নেই দেখেই বলছি কথাটা।'

সার্জেন্ট আলতাফের দিকে তাকাল ফয়েজ আহমেদ। 'বুঝতে পারছ কিছু? ডিউক সাহেবের না মাথা, তাতে আর তোমাদেরকে করে কম্মে খেতে হবে না।' পরমুহূর্তে দম মেরে গেল সে, মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত ধরে কি যেন গভীর ভাবে চিন্তা করল, সবশেষে হঠাৎ মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তা মেয়েটা কি টেলিফোন না করেই এসেছিল?'

'হয়ত টেলিফোন করেই এসেছিল। তখন আতিকুল্লাহ খান আমার অফিসে চলে এসেছে। রিসিভার তুলে বলেছে, যেন ডিউক বলছে, চলে এস আমার এখানে।'

আবার কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল ফয়েজ আহমেদ। তারপর উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে আবার কি মনে করে ফিরে এল রানার সামনে। 'বিদেশী মেয়ে, ওর পরিচয় ইত্যাদি বের করতে খুব একটা সময় লাগবে না। কিন্তু ওই আতিকুল্লাহ…সে কি আর দেখা করবে তোমার সাথে?'

'কোন সম্ভাবনা নেই।'

'হুঁ,' মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। তারপর রিস্ট-

ওয়াচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'তোমার চেহারা দেখছি একেবারে চুপসে গেছে। চা খাবে নাকি? যাও, গলাটা ভিজিয়ে এস। আর, হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে লোকজনের সাথে বেশি কথাটথা বল না যেন। তোমার সাথে বসব আমি আধ-ঘণ্টা পর।'

খুব সদয় ব্যবহার? মোটেই না, আসলে কিছুক্ষণের জন্যে রানাকে কাটাতে চাইছে ফয়েজ আহমেদ। রানাও কেটে পড়তে চায়, সাথে সাথে দরজার দিকে এগোল সে। পেছন থেকে ভারি গলায় সতর্ক করে দিল ফয়েজ আহমেদ, 'শুধু চা খেয়েই কিন্তু ফিরে আসবে। তোমার আর কোথাও যাওয়া চলবে না।'

বাইরে বেরিয়ে এসে কোন দিকে তাকাল না রানা, সোজা ক্যান্টিনের দিকে এগোল। পেছনে বুট জুতোর আওয়াজ শুনে বুঝল, পুলিশ-প্রহরায় চা খেতে হবে।

ডিম পোচ আর চায়ের কথা বলে একটা চেয়ারে বসল রানা, টেবিলের তলা দিয়ে ছড়িয়ে দিল পা দুটো। হঠাৎ দেখল, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে হুকুম আলি, ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে পুলিশের গাড়ি আর অ্যামবুলেন্স দেখছে। রানাকে দেখেই তার চেহারায় উত্তেজনা ফুটে উঠল। হন হন করে এগিয়ে এল সে। রানার দিকে ঝুঁকে, ফিস ফিস করে জানতে চাইল, 'ব্যাপারডা কি, স্যার? মনে অইল আপনের অফিসে?'

ক্যান্টিনের ঠিক বাইরেই, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ কনস্টেবল। তার দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল রানা, 'আচ্ছা, হুকুম আলি, কাল রাত ক'টায় এখান থেকে গেছ তুমি?'

'এগারোটার দিকে, স্যার। কিন্তু স্যার আপনের অফিসে কি

অইছে তা তো কইলেন না ?'

'খুন। একটা মেয়ে খুন হয়েছে।'

'খুন ?' চমকে উঠল হুকুম আলি।

ওপর নিচে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'একটা মাইয়ামানুষ ?' হুকুম আলির কণ্ঠনালী তড়াক তড়াক করে লাফাচ্ছে।

'হ্যাঁ। একটা চীনা মেয়ে।'

খুন শুনে সেই যে কপালে উঠেছে হুকুম আলির ভুরু জোড়া তা আর নামছে না। তাকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'কাল আমি বেরিয়ে যাবার পর কোন চীনা মেয়েকে বিল্ডিঙে দেখেছ ?'

মাথা নাড়ল হুকুম আলি। না।'

ডিম পোচ আর চা দিয়ে গেল বেয়ারা। খিদে থাকলেও, মুখে রুচি নেই রানার। সব কেমন বিস্বাদ লাগল ওর। কাল রাত এগারটায় শিমুলকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়া পর্যন্ত ওর একটা অ্যালিবাই আছে। তারপর ? তারপর তো গজনফর আলির খালি বাড়ি সারারাত পাহারা দিয়েছে একা। মেয়েটা যদি এগারটার পর খুন হয়ে থাকে ?

'আমি বেরিয়ে যাবার পর অপরিচিত কাউকে আমার অফিসের কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখনি তাহলে ?'

'না, স্যার। মনে পড়তাছে না। বিল্ডিঙের দারোয়ান তো সাড়ে দশটা বাজতেই তালা লাগাইয়া দিছিল, আমাগোর যাওনের সময় খুইলা দিছিল গেট।' আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় হুকুম আলি। 'খুন, আপনে ঠিক জাইনা কইতাছেন, স্যার ? করল কেডা ?'

'জানি না,' বলল রানা। 'চুপ করে থাক।' চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভাল লাগছে না ওর। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও। ফয়েজ আহমেদকে নিয়ে বিপদ হল, সব কিছু নিজের মতো করে বুঝতে চায় সে। পানির মতো সহজ ব্যাপারও তার কাছে ভীষণ জটিল মনে হয়, আবার সাংঘাতিক কঠিন কোন সমস্যার সমাধান নিজের মতো করে এক নিমেষে সেরে ফেলে। ওকে সন্দেহ হয়েছে তার, কাজেই খুনী নিজে এসে ধরা দিলেও ডিউকের পিছন ছাড়বে না সে।

দু'জন লোক ঢুকল ক্যান্টিনে, ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে ম্যানেজারের সাথে 'পুলিশ কেন' 'কি হয়েছে' ইত্যাদি আলাপ শুরু করল। দু'তিন চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা, বেরিয়ে এল ক্যান্টিন থেকে। পিছু নিল পুলিশ। পিছন থেকে হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল, 'যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কেন? অফিসে। অসুবিধে আছে কিছু?'

'স্যার না ডাকলে ওখানে আপনার ফেরা চলবে না। নিচে গিয়ে গাড়িতে বসতে পারেন।'

তর্ক করা বৃথা। এলিভেটরে চড়ে নিচে নেমে এল রানা। পুলিশটাও সাথে সাথে থাকল। ফটকের কাছে দাঁড় করান পুলিশের গাড়ির ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা। এরই মধ্যে চারপাশে ভিড় জমে গেছে। কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছে ওকে। কারো দিকে না তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছে, ততই বিচ্ছিরি লাগছে ওর। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, বেশ মাথা খাটিয়েই ফাঁদে ফেলা হয়েছে তাকে।

ঘণ্টাখানেক পর লাশ নিয়ে চলে গেল অ্যামবুলেন্স, তার সাথেই

চলে গেল মেডিকেল অফিসার, পুলিশের একটা গাড়ি। মেডিকেল অফিসার গাড়িতে ওঠার আগে পাহারারত কনস্টেবলকে ইঙ্গিতে কি যেন বলল। রানা বুঝল, ডাক পড়েছে ওর।

পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে ফটক পেরোতে যাচ্ছে ও, এই সময় জাকের আলি চৌধুরী, সেই ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট, তার গাড়ি থেকে নেমে রানার পাশে চলে এল। এক সাথেই এলিভেটরে চড়ল ওরা।

জাকের আলি চৌধুরীর চলনে বলনে একটা খেলোয়াড় সুলভ ভাব আছে—বেশ ক্ষিপ্র এবং স্মার্ট। বয়সও এমন কিছু বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়েছে কিনা সন্দেহ। মাঝে-মধ্যে দেখা হয় রানার সাথে, হয় অফিসে ঢোকার মুখে, নয় এলিভেটরে, সাধারণ দু'চারটে কথা-বার্তাও হয়। হুকুম আলির মতো, এরও বিখ্যাত মাস্তান ডিউক সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ—কিন্তু সরাসরি তা কখনই প্রকাশ পায় না। চুটিয়ে গল্প করার সুযোগ না ঘটলেও, দাপট দেখান টুকরো গল্প একেও দু'একটা শুনিয়েছে রানা, সেগুলো বেশ উপভোগও করেছে জাকের চৌধুরী।

'পুলিশ কেন, জানেন কিছু?' জানতে চাইল জাকের আলি চৌধুরী। এলিভেটর উঠতে শুরু করেছে ওপরে।

'সকালে অফিস খুলে দেখি আমার চেম্বারে একটা চীনা মেয়ের লাশ।'

'লাশ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জাকের চৌধুরী। ধীরে ধীরে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল। 'ওহ্, নো! তা কি করে সম্ভব!'

'একজন খুনীর পক্ষে জ্যান্ত একটা মানুষকে লাশে পরিণত করা খুবই সম্ভব,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'গুলি করে খুন করা হয়েছে মেয়েটাকে।'

আঁতকে উঠল জাকের চৌধুরী। 'গুলি করেছে? মানে, খুন?'

'হ্যাঁ,' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'কাল রাতে আপনার অফিস বন্ধ করেছেন কখন? আমি যখন বেরিয়ে গেলাম, তখনও আপনি ছিলেন, তাই না?'

'এই সাড়ে দশটার দিকে। দারোয়ান এসে গেটে তালা লাগাল, আমিও একটু পর চলে গেলাম। কেন বলুন তো?'

'যাওয়ার সময় আমার অফিসে আলো জ্বলতে দেখেছিলেন কিনা মনে পড়ে?'

'কই, না! আপনি তো কাল সাতটার দিকে চলে গেলেন, তাই না?'

জবাব দিল না রানা। ক্রমেই অস্বস্তি বাড়ছে ওর। এখন দেখা যাচ্ছে, মেয়েটা খুন হয়েছে এগারটার পর। তার মানে, যেসময়ের পর থেকে ওর কোন অ্যালিবাই নেই।

লিফট থেকে বেরিয়ে রানা দেখল, সার্জেন্ট আলতাফ আর বিল্ডিঙের দারোয়ান নিচে নামার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে কোন ভাবান্তর হল না আলতাফের, কিন্তু দারোয়ানের চোখ জোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল কোটর থেকে। হুকুম আলিকে কোথাও দেখল না রানা। ওর অফিসের সামনে টুলের ওপর দু'জন পুলিশ কনস্টেবলকে বসে থাকতে দেখে কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল জাকের চৌধুরী। চট্ করে একবার আড়চোখে তাকাল রানার দিকে, বলল, 'আপনাকে তো এখন বোধহয় ব্যস্ত থাকতে হবে। যদি কোন প্রয়োজন হয়, বলবেন।'

'ধন্যবাদ।'

ডেস্কের পেছনে, রানার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে গো-

য়েন্দা ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। রানাকে দেখেই জানতে চাইল, 'ফায়ার-আর্মস আছে তোমার কাছে?'

'আছে।'

'লাইসেন্স?'

'আছে।'

'কি আর্মস?'

'পয়েন্ট থ্রি-টু ওয়ালথার পি. পি. কে।'

হাত পাতল ফয়েজ আহমেদ। 'দাও।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'ডান দিকের ড্রয়ারে, ওপরের দেরাজে আছে।'

অপলক দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে ঝাড়া পনের সেকেণ্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকল ফয়েজ আহমেদ। তারপর বলল, 'নেই। দুটো কামরার কোথাও খুঁজতে বাকি রাখা হয়নি। নেই।'

বিপদটা আরো খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হল না রানার। তবু শান্তভাবেই উত্তর দিল, 'ওখানেই থাকার কথা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফয়েজ আহমেদ। 'তোমার জন্যে আরো একটা দুঃসংবাদ আছে, ডিউক। মেয়েটাকে একটা পয়েন্ট থ্রি-টু পিস্তল দিয়েই গুলি করা হয়েছে। মেডিকেল অফিসারের বিশ্বাস, মেয়েটা মারা গেছে আজ ভোর তিনটে নাগাদ। মিছেই পানি ঘোলা করছ, ডিউক। তোমাকে আমি এই শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি, সত্যি কথা বলে হয়রানীর হাত থেকে বাঁচাও আমাকে, তা না হলে তোমার কপালে খারাবী আছে।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর জানতে চাইল, 'কি ছিল মেয়েটার ব্যাগে?'

অনেক কষ্টে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখল রানা। 'আবার সেই বোকার

পাশের কামরা

মতো কথা। নিজের অফিসে ক্লায়েন্টকে বসিয়ে নিজেরই পিস্তল দিয়ে তাকে খুন করার মতো বুদ্ধু কেউ আছে ?'

'কি জানি।' রানাকে বাধা দিয়ে বলল ফয়েজ আহমেদ। 'হয়ত জুৎসই একটা অ্যালিবাই আগেভাগেই তৈরি করে তারপর কাজে নেমেছ তুমি।'

'কাল সারারাত কি করেছি, কোথায় ছিলাম সবই তো আপনাকে বলেছি। সেরকম কোন প্ল্যান থাকলে অ্যালিবাইটা ভোর তিনটে পর্যন্ত করে রাখতাম।'

'দেখ, ডিউক,' অস্থির অথচ অন্তরঙ্গ সুরে বলল ফয়েজ আহমেদ, 'এটা একটা মার্ডার কেস। পত্রিকার লোকেরা এটার পেছনে আদা-জল খেয়ে লাগবে। জীবনটাকে হেল বানিয়ে ছাড়বে ওরা। ওদেরকে দেয়ার জন্যে বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু আমার দরকার। তখন অনুমান করে কি বলতে যাচ্ছিলে, বল, আমি শুনব। তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমিও তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আমার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা আছে, তাতে অনায়াসে তোমাকে আমি গ্রেফতার করতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে তা আমি করছি না, তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। এখন প্রমাণ কর যে আমার ধারণা ঠিক নয়, ভুল।'

ডেস্কে বসে একমনে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল রানা, তারপর বলল, 'ধরা যাক, মেয়েটা কোলকাতা থেকে এসেছে। এখানকার, মানে ঢাকার কাউকে, ধরুন আমাকেই, জরুরী কিছু বলার ছিল তার। খুনী প্ল্যান মাফিক আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিল তাকে। কাল সন্ধ্যে সাতটার দিকে সিদ্ধান্ত নেয় মেয়েটা, রাতের ফ্লাইটেই ঢাকায় পৌঁছুবে সে। ঢাকায় পৌঁছেই যাতে আমাকে পায়, তার জন্যে ওই সাতটার সময় ঢাকায়, আমার নাম্বারে টেলিফোন করেছিল সে।

তখন কিন্তু অফিসে নেই আমি, আমাকে ফাঁকা বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে আমার চেম্বারে বসে আছে আতিকুল্লাহ খান। মেয়েটা তাকে আমি, মানে ডিউক মনে করে জানাল, রাত দুটো নাগাদ ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছুবে সে। আতিকুল্লাহ তাকে বলল, সে যেন সোজা অফিসে চলে আসে। এয়ারপোর্ট থেকে মেয়েটা এলও তাই। আতিকুল্লাহকে আমি মনে করে মেয়েটা তার কথা সব বলল, এবং সব শোনার পর তাকে গুলি করল আতিকু…'

'তোমার পিস্তল দিয়ে?'

হ্যাঁ, আমার পিস্তল দিয়ে।'

'কিন্তু হক্সি বিল্ডিঙের গেট তো রাত এগারটায় বন্ধ হয়ে যায়? তালাও ভাঙা হয়নি। আতিকুল্লাহ বা মেয়েটা ভেতরে ঢুকল কিভাবে?'

'দারোয়ান গেট বন্ধ করার আগেই আতিকুল্লাহ ঢুকে পড়ে। আমি যে কাছেপিঠে নেই, তা তো সে জানতই—কাজেই নিশ্চিন্ত মনে আমার চেয়ারে বসে ফোন ধরেছে, তারপর মেয়েটার আসার সময় হতেই নিচে নেমে খুলে দিয়েছে গেট। গেটে তো ইয়েল লক, কাজেই ভেতর থেকে খুলতে কোন অসুবিধেই হয়নি তার।'

'জমজমাট সিনেমার গল্প!' তেতো হাসি ফুটল ফয়েজ আহমেদের ঠোঁটের কোণে।

'আমার অনুমানটা অবশ্য যাচাই করে দেখতে হবে। এয়ারপোর্টে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাদের জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই জানা যাবে কিছু

'আর বানানো আতিকুল্লাহ খান? তার খবর কে দেবে, কাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে?

'আতিকুল্লাহ কোন বানানো লোক নয়,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

'এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার সার্ভিসে গিয়ে খোঁজ নিলেই জানা যাবে ওদেরকে দিয়ে সে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। আর আমি উত্তর বাসাবোর একটা বাড়ির সামনে সারারাত ছিলাম, ভাল করে খোঁজ করলে তারও সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। রাত দুটো-তিনটের দিকে আমার পাশ দিয়ে যদি কোন গাড়ি গিয়ে থাকে, তাহলে আরোহী বা ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমাকে লক্ষ্য করেছে। আর সকালে হকার লোকটা যে আমাকে দেখেছে তা তো বলেইছি।'

'এত কথায় আমার কাজ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, রাত একটা থেকে চারটে পর্যন্ত কোথায় ছিলে তুমি?'

'বলেছি তো—গজনফর আলির বাড়ির সামনে।'

'দেখি, তোমার পকেট সার্চ করতে দাও,' কাঁধ ঝাঁকাল ফয়েজ আহমেদ। 'আমাদের রেকর্ড ঠিক রাখার জন্যে···'

'পাগল না গর্দভ আপনি?' রেগেই গেছে রানা। 'মেয়েটার কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকলে সেটা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াব আমি?' কেউ ওর পকেটে হাত দেবার আগেই পকেট থেকে সমস্ত জিনিস এক এক করে বের করে টেবিলের ওপর রাখল ও। সেগুলোর ওপর নামমাত্র একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ফয়েজ আহমেদ।

বলল, 'হুঁ, ঠিক আছে। ডেস্ক ঘুরে এল, এগোল দরজার দিকে। 'তবে, শহর ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না তোমার। আরো কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তোমাকে গ্রেফতার করেও লাভ নেই, ফসকে বেরিয়ে যাবে তুমি। সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে নিতে দাও, তারপর তোমাকে আমি দেখে নেব।' দরজাটা হাট করে খুলে রেখে গট গট করে বেরিয়ে গেল সে।

সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল রানা। এখনও জোরাল কোন

কেস দাঁড় করান যায়নি ওর বিরুদ্ধে, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাবে ফয়েজ আহমেদ। সেই সাথে, জানে রানা, ওকে আরো ভালভাবে ফাঁসাবার জন্যে পুলিশের সামনে আরো কিছু সূত্র ছড়িয়ে দেবে খুনী। পিস্তলটা সেই মতলবেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

অফিস বন্ধ করে নিচে নেমে এল ও। গাড়িতে উঠে বসার পর মনে পড়ল, ভুলে ফেলে রেখে এসেছে সিগারেটের প্যাকেট। ড্যাশ-বোর্ডের নিচের কম্পার্টমেন্টে একটা প্যাকেট থাকার কথা। ভেতরে হাত ভরতেই শক্ত, ঠাণ্ডা কি যেন একটা ঠেকল। সারা শরীরে একটা ভয়ের ঝাঁকুনি অনুভব করল রানা।

হাত কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকে এক এক করে বের করল ও প্রথমে একটা পিস্তল, ওর নিজের পিস্তল, তারপর গোসাপের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা হাতব্যাগ।

তিন

সি. আই. ডি হেড কোয়ার্টার।

গাড়ি থেকে নেমে অফিস ভবনের দিকে পা বাড়াল ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ, এই সময় পেছন থেকে ডাক এল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল নিজের গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে রঙবাজ চূড়ামণি ডিউক। কাঁধ দুটো শক্ত হয়ে গেল ফয়েজ আহমেদের। তিরিক্ষি মেজাজে প্রশ্ন করল, 'তুমি! তুমি এখানে কি করছ?'

হাতের মুঠো খুলে দেখাল রানা। 'দেখুন, কিছু নেই। ছিনতাই-

টিনতাই করতে আসিনি। আপনার সাথে আমার কথা আছে।'

'বল কি কথা।'

'আমার গাড়িটা সার্চ করতে ভুলে গিয়েছিলেন আপনি, তাই ওটা নিয়ে এসেছি।'

আবার শক্ত হল ফয়েজ আহমেদের কাঁধ। 'তোমার গাড়ি সার্চ করতে হবে কেন?'

'সার্চ শুরু করলেই বুঝতে পারবেন কেন। যদি জিজ্ঞেস করেন, প্রথমে দেখতে বলব ড্যাশবোর্ডের নিচের খুপরিটা।' গাড়ির দরজা খুলে দিল রানা। 'আসুন, দেখুন।'

ঝুঁকে পড়ে খুপরিটা দেখল ফয়েজ আহমেদ। রাগের ভাবটা সাথে সাথে মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। বোকা বোকা দেখাল তাকে। কিন্তু বুদ্ধি করে পিস্তল বা হাতব্যাগ কোনটাই স্পর্শ করল না সে। প্রায় বিশ সেকেণ্ড পর সোজা হল সে, তাকাল রানার চোখে। 'ডিউক। তোমার পিস্তল ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'হাতব্যাগটা ওই চীনা মেয়ের?'

'তাও কি বলার অপেক্ষা রাখে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফয়েজ আহমেদ, রানার চোখে চোখ রেখে কি যেন দ্রুত ভাবছে কিম্বা ভাবার চেষ্টা করছে। তারপর ভারি গলায় বলল, 'এস।'

'কোথায়?'

'আমার অফিস ঘরে।'

অবাক দেখাল রানাকে। 'কেন?'

'কেন আবার, জবানবন্দি দেবার জন্যে। মেয়েটাকে যে খুন

করেছ তা স্বীকার করে একটা বিবৃতিতে সই করতে হবে তোমাকে। এস। তাড়াতাড়ি কর। তোমাকে দ্বিতীয় বার সুযোগ দেয়া যায় না।'

'দ্বিতীয় সুযোগ?' বলল রানা। 'ধরুন, জিনিসগুলো দেখাবার জন্যে আনিনি আমি। তাহলেই তো আর দ্বিতীয় সুযোগের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমি যখন ওগুলো দেখাবার জন্যে এসেছি, দ্বিতীয় সুযোগ আমাকে দিতেই হবে।'

রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি ফয়েজ আহমেদ, অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করেছে সে। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, 'গাড়িটায় কি সব সময় চাবি দিয়ে রাখ?' অর্থাৎ মাথা খাটাতে শুরু করেছে গোয়েন্দা প্রবর।

'হ্যাঁ, তবে ডুপ্লিকেট চাবিও একটা আছে। সেটা পিস্তল যে-দেরাজে থাকে সেখানেই রাখি। খুঁজে দেখিনি বটে, কিন্তু জানি চাবিটা সেখানে এখন আর পাওয়া যাবে না।'

কানের নিচেটা চুলকাতে চুলকাতে ফয়েজ আহমেদ বলল, 'বোধহয় তাই। পিস্তলটা খোঁজার সময় দেরাজে তো কোন চাবি দেখলাম না।'

সার্জেন্ট আলতাফ এসে দাঁড়াল। গাড়ি, পিস্তল, হাতব্যাগ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল তাকে ইন্সপেক্টর, তারপর রানাকে নিয়ে নিজের অফিস কামরায় ঢুকল সে। চেয়ারে বসেই মেজাজ গরম হয়ে উঠল তার। ঝাঁঝের সাথে বলল, 'ওই পিস্তল দিয়েই যদি খুন করা হয়ে থাকে, আর ওটা যদি তোমার—হাত ব্যাগটা যদি মেয়েটার হয়—তুমি মরেছ, ডিউক। তোমার মাস্তান-গিরি খতম।'

'তাই নাকি?' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা। 'জিনিস দুটো যদি গায়েব করে ফেলতাম, কারো সাধ্য হত না খুঁজে বের করার।

কিন্তু আমি তা চাইনি, ইন্সপেক্টর। আমি চাই এই খুনের একটা কিনারা হোক। খুনী আমার বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করেছে. আমি সেটা গ্রহণ করতে চাই। পুরো ব্যাপারটাই একটা প্ল্যান-মাফিক সাজান হয়েছে, সে চাইছে আমাকে খুনী ভেবে নিয়ে আপনি শুধু আমার পেছনেই লেগে থাকুন।'

বেশ কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকল ফয়েজ আহমেদ। তারপর মুখ তুলে বলল, 'ঠিক আছে, ডিউক, তোমাকে আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু মুশকিল কি জান, বড় কর্তাকে বোঝানো কঠিন হবে। হাতের কাছে হাজতে পোরার মতো কেউ আছে শুনলে ধৈর্য ধরে কিছু শুনতে চাইবেন বলে মনে হয় না। কাজেই তোমাকে নিয়ে কি করা হবে তা ঠিক করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন।' উঠে দাঁড়াল সে, চিন্তিতভাবে বেরিয়ে গেল অফিস-কামরা থেকে।

বলল বটে কিছু সময়, কিন্তু ঝাড়া দশ ঘণ্টা নজরবন্দী করে রাখা হল ডিউককে। অস্বস্তিকর এক পরিবেশে ছোট একটা ঘরে সময়টা কাটাতে হল ওকে। অবশ্য দু'একজন তরুণ পুলিশ অফিসারের সঙ্গ পাওয়া গেল, লাঞ্চটাও মন্দ ছিল না, তবু এরকম একটা প্রতীক্ষার কথা ভাবা যায় না। তাই ডাক পড়ামাত্র রানা প্রায় ছুটে চলে এল ফয়েজ আহমেদের কামরায়। এক রাশ ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তার নিচে যেন তলিয়ে আছে লোকটা, অন্তত রানার তাই মনে হল। ইঙ্গিতে বসতে বলল ওকে, অনেকক্ষণ কথা না বলে একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর নিজে একটা সিগারেট ধরাল, রানার সিগারেটটাও ধরিয়ে দিল। বলল 'বুঝলে, ডিউক, তুমি খুব লাকি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা একটু একটু করে ছাড়ল রানা। 'লাকি?'

'হ্যাঁ। দেখ, বার-তের ঘণ্টা ধরে আমার পুরো টীম এই কেস-

টার পেছনে খাটছে। আমরা একজন সাক্ষী পেয়েছি, তিনি তোমাকে রাত আড়াইটা তিনটের দিকে উত্তর বাসাবোয় দেখেছেন, নিজের গাড়িতে বসে ছিলে তুমি, ঘুমোচ্ছিলে। ভদ্রলোক তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে অত রাতে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন।' সিগারেটে কষে একটা টান দিল ইন্সপেক্টর, তারপর আবার বলল, 'এখন ধরে নেয়া যাক, মেয়েটাকে তুমি খুন করনি।'

'এবার তাহলে খুনীর পেছনে লাগছেন আপনি ?'

'কিন্তু সূত্র কোথায় ?' অসহায় দেখাল ফয়েজ আহমেদকে। 'কোত্থেকে তার খোঁজ শুরু করব ?'

'চীনা মেয়েটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারলেন ?'

'ওর সম্পর্কে জানতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। এয়ারপোর্ট থেকেই সব জানা গেছে। হঙকঙ থেকে এসেছিল, নাম মীর সুজি কোয়াও...'

'মীর ?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'হ্যাঁ, প্রথমে আমারও অবাক লেগেছিল,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'আসল ব্যাপারটা হল, মেয়েটা মীর মোখলেসুর রহমানের পুত্রবধূ।'

ভুরু জোড়া আবার একটু কুঁচকে উঠল রানার। 'মীর মোখলেসুর রহমান, মানে...'

'হ্যাঁ কোটিপতি, শিল্পপতি মীর মোখলেসুর রহমানের কথাই বলছি আমি। তার ছেলে মীর শফিকুর রহমান এই বছরখানেক হল হঙকঙে বিয়ে করে মেয়েটাকে। একটা মোটর দুর্ঘটনায় হঠাৎ করে মারা গেছে শফিক। তার লাশ এখানে নিয়ে আসছিল মেয়েটা।'

'কেন ?'

'মীর সাহেব চেয়েছিলেন তাঁদের পারিবারিক গোরস্তানেই

ছেলেকে মাটি দেবেন। লাশ আনা বাবদ যাবতীয় খরচও তিনি পাঠিয়েছিলেন।'

'সে-লাশ এখন কোথায়?'

'এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে বোধহয় মীর-মঞ্জিলে কবর দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'আপনি নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন?'

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল ফয়েজ আহমেদ। 'আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ নাকি? হ্যাঁ, আমি নিজে গিয়ে কফিন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব খুঁটিয়ে দেখে এসেছি। কোথাও কোন ঘাপলা নেই। রাত দেড়টায় এয়ার-পোর্টে নামে মেয়েটা। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে যায় রক্সি বিল্ডিঙে। এখন প্রশ্ন হল, বিদেশী একটা মেয়ে, যে ঢাকায় আর কখনও আসেনি, সে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তোমার সাথে দেখা করার জন্যে এল কেন?'

'আমার সাথে নয়,' শুধরে দিল রানা। 'আমার নাম ভাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকা আর একজনের সাথে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ফয়েজ আহমেদ। 'কিন্তু কেন গেল ওখানে?'

'মীর সাহেবের সাথে দেখা করেছেন?'

চর্বিসর্বস্ব বেঢপ মুখটা কদাকার হয়ে উঠল ফয়েজ আহমেদের। 'করেছি বৈকি! কোটিপতি কিনা, রবই আলাদা! চোখ গরম করে শাসিয়ে দিয়েছেন আমাকে, বলেছেন, তাড়াতাড়ি ওর পুত্রবধূর খুনী-কে ধরে দিতে না পারলে আমাকে নাকি দায়িত্ব পালনের অযোগ্য ঘোষণা করার ব্যবস্থা করবেন।' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'বড় কর্তারা আবার তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু··· হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে

কোটিপতি মীর সাহেব আমাকে বেকায়দায় ফেলতে পারেন।'

হাসিটা চেপে গেল রানা। জানতে চাইল, 'বুড়ো কোন সাহায্য করবেন বলে মনে হয়?'

'এই সব ধনী বুড়োদের সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই, ডিউক। এরা সাহায্য পেতে অভ্যস্ত, করতে নয়।'

'সেই এক্সপ্রেস মেসেঞ্জারের খোঁজ পেয়েছেন—যার হাত দিয়ে টাকা পাঠানো হয়েছিল আমার কাছে?'

'পেয়েছি, কিন্তু ঘোড়ার ডিম কিছুই জানা যায়নি। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জান, এক্সপ্রেস অফিসে এনভেলাপটা পাঠানো হয়েছিল বিকেল চারটের দিকে, আর নির্দেশ দেয়া ছিল তোমাকে যেন ওটা পৌঁছে দেয়া হয় পৌনে সাতটার দিকে। অফিসের বুড়ো কেরাণীরা কেউই খেয়াল করে রাখেনি কে দিয়ে গিয়েছিল এনভেলাপটা।

'আর নিউম্যান করপোরেশন—ওখানে কেউ আছে আতি-কুল্লাহ খান নামে?'

'না,' আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ফয়েজ আহমেদ। 'মেলা কাজ করেছি আজ। আর না। দেখা যাক, কাল কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় কিনা।'

রানাও উঠল। আর একটা মাত্র প্রশ্ন করার ছিল ওর। 'খুনটা কি আমার পিস্তল দিয়েই…?'

'হ্যাঁ। তবে পিস্তলে হাতের কোন ছাপ পাওয়া যায়নি। গাড়িতেও না। যে-ই হোক সে, ব্যাটা মহা ধুরন্ধর। তবে একটা না একটা, কোথাও না কোথাও ভুল তো সে করেছেই…সব খুনীই তা করে…'

'সব খুনীই নয়,' বলল রানা। 'অনেকেই।'

চার

পরদিন সকাল। রক্সি বিল্ডিং. ডিউকের অফিস। খটাখট একটা চিঠি টাইপ করছে রানা, এই সময় খুক করে কেশে কে যেন টোকা দিল দরজায়। ভেতরে আসতে বলল রানা, কবাট খুলে উঁকি দিল পাশের কামরার ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট জাকের চৌধুরী। সারা মুখে অপ্রতিভ, জোর করা হাসি টেনে বলল সে, 'ব্যস্ত?'

জাকের চৌধুরী এবং হুকুম আলি, এরা দু'জন আজ যে তাকে এক-বার করে হলেও বিরক্ত করবে তা মনে মনে আগেই আঁচ করে রেখে-ছিল রানা। কাজেই ঝামেলা সেরে ফেলাই দরকার ভেবে বলল, 'না। আসুন। কি হল না হল, খুব জানতে ইচ্ছে করছে না?'

ভেতরে ঢুকল জাকের চৌধুরী। দীর্ঘ ঋজু শরীরটা কেমন যেন নুয়ে পড়া দেখাচ্ছে আজ। চোখের মণি দুটো অশান্ত। 'না মানে,' বিব্রত দেখাল তাকে। এগিয়ে এসে বসল রানার সামনের একটা চে-য়ারে। 'বোধহয় অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি আমার প্রতি-বেশী, ভাল-মন্দ খবর যদি না রাখি, সেটা খুব খারাপ দেখায়, বিশেষ করে বিপদের সময়...তাই জানতে এলাম, পুলিশ কি খুনীর পরিচয় জানতে পেরেছে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা।

'সেদিন সন্ধ্যেয় আপনি চলে যাবার পর…'খানিক ইতস্তত করে আবার বলল জাকের চৌধুরী, 'অবশ্য এটা তেমন কোন তথ্য নয়, আপনার কোন সাহায্যে লাগবে বলে মনে হয় না। তবু, শুনেছি, খুন-খারাবীর মতো ভয়ংকর কেসে খুঁটিনাটি অনেক তথ্য নাকি সাংঘাতিক কাজে লেগে যায়। কথাটা হল, সেদিন আপনি চলে যাবার পর আপনার টেলিফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজেছিল।'

'হুঁ,' মনে মনে একটু নিরাশই হল রানা। ভেবেছিল, হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে জাকের চৌধুরীর কাছ থেকে। 'ধন্যবাদ। পুলিশকে জানাব, ওদের কাছে এটা একটা দরকারী খবর হতে পারে।'

ব্যাকব্রাশ করা লম্বা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জাকের চৌধুরী বলল, 'কেসটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। মেয়েটা আপনার অফিসে ঢুকল কিভাবে? এই প্রশ্নে পুলিশ বোধহয় আপনাকে একটু বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করবে, তাই না?' রানা কি বলে শোনার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, সেখানে রাজ্যের কৌতূহল।

'বেকায়দায় ফেলবে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হয় না। অনেক আগে থেকেই আমার অফিসে ঢুকে বসে ছিল খুনী, সে ই বিল্ডিঙের গেট আর আমার অফিসের দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়েছে মেয়েটাকে।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল জাকের চৌধুরী। 'যাক, আপনি তাহলে বেঁচে গেলেন। আচ্ছা, মেয়েটা সম্পর্কে জানা গেল কিছু?'

'হংকং থেকে এসেছিল। নাম মীর সুজি কোয়াও।'

'মীর?' সচকিত হয়ে উঠল জাকের চৌধুরী। 'আমি একজ মীর শফিকুর রহমানকে চিনি···.হ্যাঁ, যতদূর মনে পড়ছে, হংকঙেই গিয়েছিল সে···আমার ছোটবেলার বন্ধু, একসাথে স্কুলে পড়তাম··· তার কেউ নয় তো?'

'হ্যাঁ, সে-ই।' সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'চা আনাব?' দ্রুত মাথা নাড়ল জাকের চৌধুরী। রানা আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল না। 'বলছেন, তাকে চিনতেন আপনি? ভালই হল। শফিকুর রহমান সম্পর্কে আমি আগ্রহী। কি জানেন তার সম্পর্কে, বলুন তো? ওই চীনা মেয়েটা, সুজি কোয়াও শফিকুর রহমানের স্ত্রী ছিল।'

বেশ একটু হতভম্ব দেখাল জাকের চৌধুরীকে। 'বলেন কি! শফিকের স্ত্রী! আমাদের শফিক একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল?' ঘন ঘন এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না! ওর বাবা, মোখলেসুর রহমান···আরিব্বাপ!··· সাংঘাতিক কড়া মেজাজের মানুষ, তিনি ছেলের এই বিয়ে মেনে নেবেন বলে তো মনে হয় না! তা, এখানে কি করতে এসেছিল মেয়েটা?'

'স্বামীর লাশ কবর দেয়া হবে এখানে, সেটা নিয়ে আসছিল।'

স্তব্ধ, পাথর হয়ে গেল জাকের চৌধুরী ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড পর ফিস ফিস করে জানতে চাইল, 'শফিক শফিক মারা গেছে?'

'কার অ্যাক্সিডেন্ট। গত হপ্তায়।' জাকের চৌধুরীকে খানিক ধাতস্থ হবার সুযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'ওর সম্পর্কে যা জানেন সব আমাকে বলুন, মিঃ চৌধুরী।'

দু'আঙুলের ফাঁকে গোঁজা সিগারেটের ছাইয়ের দিকে একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকল জাফের চৌধুরী। আরো খানিক পর মুখ তুলে তাকাল সে। 'কি জানেন, আমরা ওর বন্ধুরা অনেক আগে থেকেই বলাবলি করতাম, নির্ঘাৎ কোন অপঘাতে মৃত্যু হবে শফিকের। সাং-ঘাতিক চঞ্চল প্রকৃতির ছিল ও, সেই ছোটবেলা থেকেই। আমাদের ভীতুর ডিম বলে গাল দিত, আর নিজে এমন সব দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসত যে সে-সব দেখে ভয়েই আমরা আধমরা হয়ে যেতাম। হৈ-চৈ না করে এক সেকেণ্ড থাকতে পারত না। গাড়ি চালাত ফুল স্পীডে। মেয়ে দেখলেই হয়, পিছনে লাগা চাই। তারপর আমি কলেজে ভর্তি হলাম, ওর সাথে খুব কম দেখা হত। তবে খবর পেতাম। নিজের এলাকায় হীরো বনে গেল ও। মদ ধরল। মারপিট, মেয়েমানুষ, নেশা এইসব নিয়েই সময় কাটাত। ইচ্ছে করেই ওর সাথে কোন যোগাযোগ রাখিনি। তারপর শুনলাম, ওর বাবা ওকে হংকং পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা সে ও তো আজ বছর পাঁচ-ছয় আগের কথা।' অন্যমনস্ক ভাবে টান দিল সিগারেটে। 'ওখানে গিয়ে ও তা-হলে একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল আবার?'

মুখে সিগারেট তুলতে যাচ্ছিল রানা, মাঝ পথে স্থির হয়ে গেল হাতটা। 'আবার?'

একটু যেন থতমত খেয়ে গেল জাফের চৌধুরী। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনার অবশ্য জানার কথা নয়। এর আগে শফিক একটা মেয়েকে বিয়ে করছিল—ওটা ছিল···কি বলব, ফলস্ একটা বিয়ে।'

'ফলস্ বিয়ে মানে?'

'ও হংকং চলে যাবার বছর দেড়েক আগের ঘটনা। একটা মেয়ে ভালবাসত শফিককে। মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু আহামরি কিছু নয়।

তবে, স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল, আদর্শ নারী বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। কিন্তু শফিক ছিল ঠিক তার উল্টো। মেয়েটা ওকে ভালবাসলে কি হবে, তার ওপর শফিকের কোন রকম দুর্বলতা ছিল না। তবে প্রেমের অভিনয় আর-সব মেয়ের সাথে যেমন করছিল, এর সাথেও সেটা চালু রাখে। উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েটাকে নষ্ট করা। কিন্তু, আগেই বলেছি, মেয়েটা ছিল অসাধারণ ভাল, বিয়ের আগে শফিককে কাছে ঘেঁষতে দিতে রাজি নয়। অগত্যা বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তায় একটা কুমতলব পাকাল শফিক। বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে মেয়েটিকে বাড়ি থেকে বের করে আনল। ও-হো, বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটা ছিল শফিকের বাবারই প্রাইভেট সেক্রেটারী।'

'নাম?'

'দাঁড়ান মনে করি···হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পারভিন।'

নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। 'তারপর?'

'পারভিনকে নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সাথে গ্রাম সাইডে চলে গেল শফিক,' আবার শুরু করল জাকের চৌধুরী। কথাবার্তায় এখন আগের চেয়ে সতর্ক মনে হচ্ছে তাকে। অনেক দিন আগের ঘটনা, ঠিক মতো সব স্মরণ করতে গিয়েই বোধহয় সতর্ক হয়ে উঠতে হয়েছে তাকে। 'একটা বাড়িতে উঠল ওরা। বাড়িটা শফিকেরই এক বন্ধুর। গ্রামের অন্য কোন লোক সে বিয়েতে উপস্থিত ছিল না। এমন কি কোন মৌলভীকেও ডাকা হয়নি···

'তাহলে বিয়ে পড়াল কে?'

তিক্ত একটু হাসল জাকের চৌধুরী। 'কে আবার, ওরই এক বন্ধু, মুখে নকল দাড়ি লাগিয়ে।'

'ইন্টারেস্টিং। তারপর?'

'বিয়ে হয়ে গেল। আগেই ঢাকার একটা হোটেলে স্যুইট ভাড়া করে রেখেছিল শফিক, মাইক্রোবাসে করে সোজা শহরে ফিরে সেখানেই হানিমুনের জন্যে ওঠার কথা ছিল। পারভিনকে নিয়ে বাড়িতে ওঠার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। প্রথম থেকেই চেষ্টা ছিল শফিকের, বিয়ের কথাটা যথা-সম্ভব কম লোককে জানান। পারভিনকে বুঝিয়েছিল, বাবা এ-বিয়ে মেনে নেবেন না, অন্তত এখুনি মেনে নেবেন না, তাই আপাতত ওদেরকে হোটেলেই উঠতে হবে। সরল মনে কথাটা বিশ্বাস করেছিল পারভিন।'

'তারপর কি হল বলুন,' বিরক্তি চেপে বলল রানা।

'ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক, কিন্তু শফিকের জন্যে সেটা হল শাপে বর। মাইক্রোবাসে ওর বন্ধুরাও সবাই ছিল। শহরে ফেরার পথে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে শফিক, রাস্তার কিনারা থেকে চল্লিশ ফুট নিচের নদীতে পড়ে গেল সেটা। তিন জন ছাড়া বাকি সবাই মারা যায়।

ঘটনার তাৎপর্যটা বুঝতে চেষ্টা করল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'তিন জন কে কে?'

'শফিক, পারভিন আর সেই আলগা দাড়িওয়ালা নকল মৌলভী, অর্থাৎ শফিকের এক বন্ধু,' একটা সিগারেট ধরাল জাকের চৌধুরী। 'এক বছর পর শফিক স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করে পারভিনকে। পারভিন তখন আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সে জানতে চাইল আমাদের বিয়ে কি তাহলে মিথ্যে? শফিক বলল, হ্যাঁ, মিথ্যে। কোন সাক্ষী-প্রমাণ কিছু নেই। যারা সাক্ষী ছিল তারা সবাই মারা গেছে। নকল মৌলভীর কথাটাও পারভিনকে বলল শফিক। সেই সাথে জানিয়ে দিল, তার সেই বন্ধুর পরিচয় কোন দিনও জানতে পারবে না পারভিন। তাকে

দেখলেও চেনার সাধ্য নেই তার। দাড়ি ছাড়া শফিকের সেই বন্ধুকে সত্যিই নাকি চেনা সম্ভব নয়।'

'বাস্টার্ড।' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল রানা, পরমুহূর্তে ভাবল, মরা একটা লোককে গালিগালাজ করে লাভ নেই জানতে চাইল, 'তারপর? কি অবস্থা হল বেচারী পারভিনের?'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল জাকের চৌধুরী। 'পারভিনকে হোটেলে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল শফিক। তার খোঁজে মীর-মঞ্জিলে এল পারভিন দেখা করল শফিকের বাবা মীর মোখলেসুর রহমানের সাথে। তিনি তো পারভিনকে দেখে মহা খাপ্পা। বললেন, কিছু না বলে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন? পেট লক্ষ্য করে আরো বললেন, কাকে বিয়ে করেছো? আমাকে জানাওনি কেন? ইত্যাদি। বুড়ো একটু শান্ত হতে তাকে সব কথা খুলে বলল পারভিন। বলল, আমি আপনার ছেলের সন্তান বয়ে বেড়াচ্ছি।'

'কিন্তু এত সব কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

ক্ষীণ একটু তেতো হাসল জাকের চৌধুরী। 'হঙকঙ চলে যাবার কয়েকদিন আগে শফিকের সাথে দেখা হয়েছিল আমার। হঠাৎ দেখা, অনেকদিন পর, রাস্তার ওপর, জোরজার করে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় বসাল। কাজু বাদাম আর কফি খাইয়ে চিটিং-বাজীর পুরো গল্পটা শোনাল আমাকে। বরাবরই এ-ধরনের গল্প শুনিয়ে অদ্ভুত এক আনন্দ পেত শফিক—রুচি-বিকৃতি আর কি।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'তারপর কি হল? উত্তরে পারভিনকে কি বললেন বুড়ো মীর সাহেব?'

'মীর সাহেব মানুষ হিসেবে খারাপ নন, কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে আগে হল বংশ এবং সামাজিক মর্যাদা। কোথাও কিছু নেই তাঁর

প্রাইভেট সেক্রেটারী এক বছর গায়েব থাকার পর হঠাৎ উদয় হয়ে বলল, আমি আপনার পুত্রবধূ, আর তিনি তা মেনে নিলেন, এমনটি আশা করা যায় না। পারভিনকে তিনি চিনতেন, জানতেন মিথ্যে কথা বলার মেয়ে নয় ও। নিজের ছেলেকেও তিনি হাড়ে হাড়ে চিনতেন, জানতেন লম্পটটা অনেক মেয়েরই সর্বনাশ করেছে। যাই হোক ছেলেকে ডেকে পাঠালেন তিনি। পারভিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ও যা বলছে সব সত্যি? তুমি ওকে বিয়ে করেছ? অসম্ভব, ওকে কেন বিয়ে করতে যাব আমি, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শফিক।'

'অদ্ভুত!'

'পারভিনকে মীর সাহেব বললেন, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলেও সমাজ বিশ্বাস করবে না। আর সমাজ যদি এই বিয়েটাকে স্বীকৃতি না দেয়, আমিও স্বীকৃতি দিতে পারি না। বললেন, তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি, তুমি আবার বিয়ে করে সুখী হবার চেষ্টা কর। কিন্তু আবার বিয়ে করতে রাজি হয়নি পারভিন। আগেই বলেছি, আদর্শ নারী বলতে যা বোঝায় পারভিন তাই - অন্যান্য অনেকের কাছে সেকেলে বলে মনে হবে। যাই হোক, টাকা নয়, মীর সাহেবের কাছে পুরনো চাকরিটা ফেরত চাইল সে। মীর সাহেব রাজি হলেন। এর তিন মাস পর চাকরিতে জয়েন করল পারভিন···

'এখনও কি সে···'

'বোধহয়। আমি যতদূর জানি, এখনও মীর সাহেবের সেক্রেটারী হিসেবে চাকরি করছে পারভিন। শুনেছিলাম একটা পুত্রসন্তান হয়েছিল, কোথায় আছে না আছে জানি না···

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে রানা। বুড়ো মীর কোটিপতি, অগাধ

সম্পত্তির মালিক, তাঁর মৃত্যুর পর কে পাবে এসব? একমাত্র ছেলে মারা গেছে, পুত্রবধূদের একজন খুন হয়েছে, অপরজন বেঁচে থাকলেও তার সামাজিক স্বীকৃতি নেই। তাহলে? কাকে এসব দিয়ে যাবেন বৃদ্ধ?

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল রানা। 'আচ্ছা, সেই নকল মৌলভী আসলে কে? শফিকের বন্ধু যখন, আপনি তাকে নিশ্চয়ই চেনেন?'

'নিজের স্বার্থের ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান ছিল শফিকের,' গম্ভীর হয়ে উঠে বলল জাকের চৌধুরী। 'জানত, ওই বন্ধুর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলেই পারভিন বিয়েটাকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা চেষ্টা চালাবে সেজন্যেই কিছুতেই সেই বন্ধুর পরিচয় জানায়নি আমাকে।'

'হুঁ,' চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'সেই বন্ধুটিই বা কেমন লোক? একটা মেয়ে পথে বসছে জেনেও সত্যি কথাটা প্রকাশ করে দেয়নি কেন?'

'শফিকের বন্ধু শফিকের মতোই হবে,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল জাকের চৌধুরী। 'মেয়েটার জন্যে তার কোন দরদ থাকার কথা নয়, শফিকের স্বার্থটাই তার কাছে বড়।'

'আপনি অনুমান করেও বলতে পারেন না, শফিকের সেই বন্ধুটি কে হতে পারে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল জাকের চৌধুরী। বিষণ্ণ দেখাল তাকে: 'ওর সব বন্ধুকে আমি চিনতামও না, মিঃ ডিউক। কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছু জেনে লাভ আছে কোন? আপনার এই কেসের কোন সুরাহা হবে তাতে?'

'তা হয়ত হবে না, কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবে খারাপ লাগছে আমার,' বলল রানা 'ইচ্ছে হচ্ছে একমাত্র জীবিত সাক্ষীকে খুঁজে

বের করে তার কপালে পিস্তল চেপে ধরে বলি, সত্যি কথাটা স্বীকার কর ব্যাটা, নইলে দিলাম তোর মাথার খুলি উড়িয়ে।'

হো হো করে হেসে উঠল জাকের চৌধুরী। 'তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায় যে···তার পরিচয় একমাত্র শফিকই জানত, শফিক মারা যাবার পর সবার নাগালের বাইরে চলে গেছে সে···'

গম্ভীর হল রানা। 'আমি কিন্তু এত সহজে নিরাশ হই না। কারো কাছে না কারো কাছে তার সেই বন্ধুটির নাম শফিক বলে থাকতেও তো পারে?' কি যেন বলতে যাচ্ছিল জাকের চৌধুরী, তাকে থামতে ইশারা করে আবার বলল রানা, 'মেয়েটাকে দেখিনি, কোনদিন দেখার সুযোগ হবে কিনা তাও জানি না, কিন্তু আপনার মুখে তার দুঃখের কাহিনী শুনে আমার বুকে একটা আঁচড় পড়েছে। চোখ কান খোলা রাখব আমি, আমার সাধ্যের মধ্যে হলে তাকে আমি তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং স্বীকৃতি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করব···'হঠাৎ থেমে গেল রানা, মনে মনে তিরস্কার করল নিজেকে, সে কি পাগল হয়ে গেল। এসব কথা কাউকে শোনাবার কোন মানে হয়।

রিস্টওয়াচ দেখল জাকের চৌধুরী। মুখ তুলে বলল, 'আমরা কিন্তু মার্ডার কেস থেকে অনেক দূরের প্রসঙ্গে চলে এসেছি। ভাবছিলাম, ওই চীনা মেয়েটা, শফিকের দ্বিতীয় স্ত্রী, সে খুন হল কেন?'

'এই প্রশ্নের উত্তরই তো খুঁজছে পুলিশ।'

'আপনার জন্যে একটা উটকো সমস্যা, তাই না?' কণ্ঠে সহানুভূতি টেনে বলল জাকের চৌধুরী। 'মানে, মেয়েটা আপনার কাছে কেন এসেছিল সেটা একটা রহস্য, তাই না?'

বিরক্তি বোধ করল রানা। লোকটা একটু বেশি কৌতূহল দেখাচ্ছে। 'রহস্য? হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু কোন রহস্যই শেষ পর্যন্ত

রহস্য থাকে না। এরও একটা মীমাংসা হবে।'

পাশের কামরা থেকে টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে এল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল জাকের চৌধুরী। 'আপনাকে বিরক্ত করলাম। কিন্তু একটা কথা, যদি মনে করেন আমি কোন সাহায্যে লাগব, সাথে সাথে জানাবেন। সাধ্যমতো করব আমি।'

ধন্যবাদ,' বলল রানা।

দরজার কাছে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল জাকের চৌধুরী। 'শফিক সম্পর্কে আর কিছু যদি মনে করতে পারি, আপনাকে জানাব, কেমন?'

'অবশ্যই।'

চলে গেল জাকের চৌধুরী। তার বলা কথাগুলোই ভাবছিল রানা, এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই মিষ্টি সুরেলা একটা নারী-কণ্ঠ কানে এল। 'আমি মিঃ মীর মোখলেসুর রহমানের সেক্রেটারী বলছি। আপনি মিঃ ডিউক?'

সাথে সাথে জবাব দিতে পারল না রানা। এতক্ষণ এই পারভিনের কথাই ভাবছিল ও। গলাটা তো আশ্চর্য! দেখতেও নিশ্চয়ই সুন্দরী হবে? মনে মনে পারভিনের একটা ছবি কল্পনা করে নিল ও। 'হ্যাঁ।'

'মিঃ ডিউক, আজ বিকেলের দিকে আপনি একটু সময় দেবেন, প্লীজ? মিঃ রহমান আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

চট্‌ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-রেজিস্টারটা দেখে নিল রানা। বলল, 'সময় দেয়া সম্ভব, কিন্তু ঠিক কি ব্যাপারে দেখা করতে চান তিনি তা যদি··

বাধা দিয়ে সেক্রেটারী বলল, 'কেন দেখা করতে চান তা বোধহয় আপনারও জানা আছে, তাই না, মিঃ ডিউক?' শান্ত সুরে বলল

কথাটা, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে ক্ষীণ একটু কাঠিন্যও অনুভব করল রানা। ওকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে আবার বলল সে, 'মীর-মঞ্জিল, গুলশান, নিশ্চয়ই চেনেন আপনি? তিনটের সময়, কেমন?' বলে আর অপেক্ষা করল না, যোগাযোগ কেটে দিল।

সারাটা সকাল এবং দুপুর আর কিছু ঘটল না। পাশের কামরার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট জাকের চৌধুরীর ওপর একটু চটেই উঠল রানা, দু' এক মিনিট পরপরই তার অফিস কামরা থেকে ঝনঝন টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে আসছে, তার ওপর টাইপরাইটারের খটাখট তো আছেই, একাগ্র মনে কিছু চিন্তা করতে পারছে না রানা। বেলা একটার দিকে একটা চান্স নিয়েছিল হুকুম আলি, কিন্তু উঁকি দিয়ে রানার গম্ভীর চেহারা দেখে ভেতরে ঢুকতে বা কোন প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি।

ঠিক তিনটের সময় মীর-মঞ্জিলে পৌঁছুল রানা। মস্ত গেট, দু' ধারের দুটো থামের মাথায় সিংহের আবক্ষমূর্তি। গেট থেকে কংক্রিটের চল্লিশ ফিট লম্বা রাস্তা চলে গেছে বিশাল একটা কৃত্রিম ঝর্ণার কাছে, ঝর্ণাটাকে ঘুরে সোজা গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত চলে গেছে রাস্তা। গেট খোলাই পেল রানা। রাস্তার দু'দিকে সুন্দর করে ছাঁটা লতাগাছ। গাড়ি-বারান্দায় কাউকে দেখল না ও। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করে দরজার দিকে এগোল। কলিংবেলের বোতামে চাপ দিয়ে শুনতে পেল, অনেক দূরে টুং-টাং-টুং মৃদু ঘণ্টা বাজল। উর্দি পরা একজন বাটলার এসে খুলে দিল দরজা। নিজের পরিচয় দিল রানা। 'ভিটক।'

সবিনয় ভদ্রতার সাথে রানাকে একটা হলঘরে নিয়ে এসে বসাল বাটলার। চলে গেল সে, কিন্তু একটু পরই ফিরে এল আবার।

রানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ভেতরের একটা কামরায়। ছোট, কিন্তু সুন্দর সুন্দর দামী আসবাবে সাজান ঘর। টেবিলের ওপর পত্র-পত্রিকা প'ড়ে আছে। একটা জানালার বাইরে মস্ত দীঘি চোখে পড়ে, আরেকটার সামনে দাঁড়ালে বাগানের অংশ বিশেষ দেখা যায়। গোটা বাড়ি নিঝুম, কোথাও একটু আওয়াজ নেই। নিঃশব্দ পায়ে কখন যে ঘরের ভেতর ঢুকেছে মেয়েটা, টেরই পায়নি রানা। নিজের অজান্তে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছিল বোধহয়, হঠাৎ কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। দেখল, দরজার কাছ থেকে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে মেয়েটা। দেখতে আহামরি কিছু নয়, বলেছিল জাকের চৌধুরী। কিন্তু রানার চোখে পারভিনকে অপরূপ সুন্দরী বলে মনে হল। পঁচিশ থেকে আটাশের মধ্যে বয়স, কোমরের নিচ পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে একরাশ কাল কোঁকড়ান চুল। চোখ দুটো, যাকে বলে দীঘল আঁখি, ঠিক তাই। চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ। গাঢ় নীল রঙের একটা শিফন পরে আছে। গ্রীবাটা খুব সুন্দর পারভিনের, একেই বোধহয় মরাল গ্রীবা বলে। কিন্তু দীঘল আঁখিতে রাজ্যের বিষণ্ণতা, দৃষ্টি এড়াল না রানার তবে, এই মেয়েটার প্রতি যতই সহানুভূতি থাক, একটা কথা মন থেকে তাড়াতে পারছে না রানা, সেটা হল —নিজের বিয়েটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বুড়ো মীর সাহেবের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে পারভিন এবং তার নাবালক ছেলে। এমন কি বিয়েটা যদি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নাও হয়, তবু হয়ত মীর সাহেব তার অগাধ সয়-সম্পত্তির বেশ কিছুটা দিয়ে যাবেন ওকে। ওর প্রতি যে মীর সাহেবের সহানুভূতি আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর, ছেলে এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী সুজি কোথাও মারা যাবার পর অন্য কোন উত্তরাধিকারী যদি না থাকে, তাহলে হয়ত সমস্ত

সম্পত্তিই তিনি দিয়ে যাবেন পারভিন আর তার সন্তানকে। কাজেই, শান্ত প্রকৃতির মেয়ে পারভিন শফিকের দ্বিতীয় স্ত্রীকে পথ থেকে সরাবার জন্যে যদি কোন গোপন ষড়যন্ত্র করে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেখতে ভালমানুষ, মনে হয় ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না, অথচ মনের ভেতর বাস করে নিষ্ঠুর এক খুনী, দুনিয়ায় এ ধরনের মানুষেরও কোন অভাব নেই। গড়ই সতী-সাবিত্রী মনে হোক, গোপন একজন প্রেমিক থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। উচ্চাভিলাষী প্রেমিকের প্ররোচনায় অনেক নিরীহ টাইপের মেয়েও নির্মম স্বার্থপর হয়ে উঠতে পারে।

রানাকে ভাল করে, খুঁটিয়ে দেখল পারভিন। তার দৃষ্টির প্রখরতা, কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্য করে এবং তারপর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনে রানা বুঝল, এ মেয়ের মাথাটা খুব ঠাণ্ডা।

'আপনি মিঃ ডিউক?' মৃদু, সুরেলা কণ্ঠস্বর একবার শুনলে বারবার শুনতে ইচ্ছে করে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনি মীর সাহেবের সেক্রেটারী মিস···

'আমার নাম পারভিন। আসুন। মিঃ রহমান আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' ঘুরে দাঁড়াল পারভিন, দরজার দিকে পা বাড়াল। তাকে অনুসরণ করল রানা। লক্ষ্য করল, সহজ অনায়াস হাঁটার ভঙ্গি পারভিনের, কোন রকম জড়তা নেই। বিশাল নিতম্ব, সুগঠিত, কিন্তু তাতে ঢেউ তোলার কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা নেই। হাঁটার সময় অদ্ভুত একটা ছন্দ ফুটে উঠছে বটে, কিন্তু সেটা এমনই সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ যে দেখে মুগ্ধ হতে হয়, পাবার লোভ জাগে না।

অপেক্ষাকৃত বড় একটা কামরায় এল ওরা। এটাও খুব দামী কাঠের আসবাবে সাজান। দেয়াল-জোড়া জানালা, বাইরে গোলাপ

বাগান। ঢাকা লাগান একটা বেড-চেয়ারে আধ শোয়া ভঙ্গিতে বসে আছেন মীর মোখলেসুর রহমান। বৃদ্ধ বেশ লম্বা, একটু বেশি রোগা, তবে চেহারায় আভিজাত্যের ছাপটুকু দৃষ্টি এড়াবার নয়। নাকটা খাড়া, পুরানো হাতির দাঁতের মতো হলুদ গায়ের রঙ, মাথায় ধবধবে সাদা চুল, শিরা ওঠা হাত। সাদা একটা লিনেন-স্যুট পরে আছেন তিনি, পায়ে হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো। পায়ের আওয়াজ পেয়ে জানালার দিক থেকে মুখ ফেরালেন, রানার সাথে চোখাচোখি হতে মৃদু একটু হাসলেন তিনি।

রানার পরিচয় জানিয়ে দিয়ে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সেক্রেটারী। নিজের কাছের একটা চেয়ার ইঙ্গিতে দেখিয়ে রানাকে বললেন বৃদ্ধ, 'এখানে এসে বস, বাবা আমি ভাল শুনতে পাই না, কাজেই একটু জোরে কথা বলতে হবে তোমাকে। আর, অভ্যেস থাকলে তুমি ধূমপান করতে পার।'

এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল রানা। কিন্তু সিগারেট ধরাল না।

'তোমার সম্পর্কে কিছু কিছু খবর পেয়েছি আমি,' বেড-চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন বৃদ্ধ। 'লোকে যে যাই বলুক, আমার কিন্তু মনে হয়েছে তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ।'

খবরটা কে দিয়েছে জানা নেই, তাই চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করল রানা।

'ঘটনাটা তোমার অফিসে ঘটেছে, সেটা খুবই দুঃখজনক,' আবার বললেন বৃদ্ধ। 'আমি আগাগোড়া পুরো ঘটনাটা, তুমি যে-টুকু জান, বিস্তারিত শুনতে চাই। চীনা মেয়েটা কেন এসেছিল তোমার কাছে, তারপর সেই লোকটা, আতিকুল্লাহ খান, ফোনে ঠিক কি বলেছিল তোমাকে—সব, স-ব আমি শুনতে চাই।' একটু থেমে জানতে

চাইলেন, 'হাতে সময় নিয়ে এসেছ তো?'

রানা লক্ষ্য করল, পুত্রবধূ না বলে চীনা মেয়ে বললেন মীর সাহেব, এবং শব্দ দুটো উচ্চারণ করার সময় তাঁর মুখে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল। প্রথম থেকে পুরো ঘটনাটা বলে গেল রানা। গভীর মনোযোগের সাথে সব শুনলেন বৃদ্ধ। রানার বলা শেষ হয়েছে, এই সময় কফি আর বিস্কিট নিয়ে ঘরে ঢুকল সেক্রেটারী। ঘরের ভিতর যতক্ষণ থাকল মেয়েটা, তার মুখ থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাল না রানা, কিন্তু ভুলেও একবার রানার দিকে তাকাল না সে। রানার উপস্থিতিতে তার মধ্যে কোন জড়তা বা দ্বিধা সংকোচও লক্ষ্য করা গেল না। সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করল সে। দু'একটা প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক কথা বলল মীর সাহেবের সাথে। বৃদ্ধের পা দুটো ঢেকে দিল চাদর দিয়ে। তারপর নিঃশব্দে আবার বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'তুমি তাহলে অনুমান করেও বলতে পার না কেন মেয়েটা তোমার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল?' পারভিন চলে যেতে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। 'কিংবা কেন সে খুন হল, কে তাকে খুন করল, এসব প্রশ্নের উত্তরও তুমি পাওনি?'

মাথা নাড়ল রানা। তারপর বলল, 'আতিকুল্লাহ খান হয় নিজেই খুনী, নয়ত এই হত্যাকাণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

'ইন্সপেক্টর ফয়েজটা কোন কম্মেরই নয়, ওর ওপর আমার একদম বিশ্বাস নেই। আমি তো ভেবেই পাই না ওর মতো গর্দভকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে কেন রাখা হয়েছে।' মুখ নামিয়ে নিয়ে আগের চেয়ে দৃঢ় সুরে বললেন বৃদ্ধ, 'ঘটনাচক্রে, চীনা মেয়েটা আমার পুত্র-

বধূ। আমি চাই তার খুনী ধরা পড়ুক। এর সাথে মীর বংশের মর্যাদা জড়িয়ে পড়েছে। মীরদের একটা বউকে খুন করে রেহাই পেয়ে যাবে খুনী, এ হতে পারে না।' হঠাৎ খাদে নেমে গেল তাঁর গলা, জানালা পথে উদাস চোখে তাকালেন। বললেন তাছাড়া, শফিক ছিল আমার একমাত্র সন্তান, ও মারা যাবার পর এখন বুঝতে পারছি, ওর সাথে হয়ত আরো ভাল ব্যবহার করা উচিত ছিল আমার তাহলে হয়ত এতটা নষ্ট হয়ে যেত না ও। ও বেঁচে থাকতে আমি ওর প্রতি সুবিচার করতে পারিনি, সেটা বড় দুঃখ। ছেলের প্রতি এটা আমার একটা কর্তব্য বলে মনে করছি আমি—খুনীকে ধরে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা এতে যদি আমি সফল হই, কিছুটা শান্তি পাব। কিন্তু আমি বুড়ো হয়েছি, মনের সেই জোরও আর নেই। কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব মেয়েটা তোমার অফিসেই খুন হয়েছে তার মানে খুনী তোমাকে ফাঁসাতে চেয়েছে, তাই না? তোমার সময়ের পুরো দাম যা হয় সবটুকু দেব আমি—আমি চাই, আমার তরফ থেকে খুনীকে ধরার জন্যে যা যা করার দরকার সব তুমি কর।' একটু থামলেন বৃদ্ধ, তারপর জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। 'এটা একটা অনুরোধ, ডিউক। যদি রাখ, আমি খুশি হব।'

'কিন্তু,' বলল রানা, 'কেসটা এখন পুলিশের হাতে। বাইরের কেউ এ ব্যাপারে নাক গলাক তা ওরা চাইবে না। আপনি বরং…'

বাধা দিলেন বৃদ্ধ, রাগের সাথে বললেন, ওরা কি চাইল না চাইল তাতে কি আসে যায়? আমার পুত্রবধূ খুন হয়েছে, আমি নাক গলাব না তো কে গলাবে? তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে কাজে হাত দেবে, কার সাধ্য বাধা দেয়। ফয়েজকে বলেছিলাম হংকঙের ব্রিটিশ

কর্তৃপক্ষকে টেলিগ্রাম করে মেয়েটা সম্পর্কে যেন বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠায়—কি করল কে জানে। শফিকের চিঠি পড়ে আমি শুধু জানতে পেরেছিলাম যে সুজি কোয়াও রেড চায়নার রিফিউজিদের একজন···

'কিন্তু একজন রিফিউজি সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কি প্রয়োজনীয় কোন তথ্য দিতে পারবে?' সংশয় প্রকাশ করল রানা।

বৃদ্ধ একটু নড়েচড়ে বসলেন। কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে নামিয়ে রাখলেন সেটা। বললেন, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। শোন। ফি বছর অনেক রিফিউজি হঙকঙে আসে। এদের সাথে কোন কাগজপত্র থাকে না। খালি হাতে শুধু প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে আসে আর কি। কিন্তু চীন থেকে সরাসরি হঙকঙে আসে না তারা। পাল তোলা নৌকায় করে প্রথম আসে পর্তুগীজ এলাকা ম্যাকাও, কিন্তু সেখানে অত রিফিউজির জায়গা মেলে না, তাই হঙকঙগামী নৌকায় তুলে তাদেরকে চালান দেয়া হয়। কিন্তু সাগরে পাহারা আছে, রিফিউজি ভর্তি নৌকা দেখলেই ধাওয়া করে হঙকঙ নৌ-পুলিশ। কিন্তু মুশকিল হল, ওই এলাকায় হাজার হাজার মাছ ধরার নৌকা আছে, সেগুলোর সাথে মিশে যায় রিফিউজিদের নৌকাগুলো। তার মানে, পুলিশরা রিফিউজিদের নৌকা খুঁজে বের করতে পারে না। হঙকঙ সমুদ্র-সীমানার ভেতর কোন রিফিউজি নৌকা ঢুকে পড়লে তাকে আর ফেরত পাঠান হয় না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত নৌ পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে রিফিউজিরা হঙকঙে পৌঁছায়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এদের নতুন কাগজ পত্র দেয়, তারপর থেকে শুরু হয় এদের নতুন জীবন। বলতে পার, এরা নবজন্ম লাভ করে। আমার পুত্রবধূও এই রকম একজন রিফিউজি। সেজন্যেই

আমার ধারণা, ওর প্রকৃত পরিচয় ইত্যাদি না জানা থাকলে এই খুনের কিনারা হওয়া কঠিন।'

'কিন্তু প্রকৃত পরিচয় ইত্যাদি জানতে হলে হঙকঙ যেতে হয়...

'ঠিক,' দু'চোখভরা প্রত্যাশা নিয়ে রানার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। 'আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। যাবে তুমি, ডিউক? সমস্ত খরচ আমার। হঙকঙে যাবার প্রয়োজন আছে, আমার মতো তুমিও যে এটা উপলব্ধি করেছ, সেজন্যে আমি উৎসাহিত বোধ করছি। তোমার আমার চিন্তাধারা একই খাতে বইছে. সেটা কম কথা নয়। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। বোধহয় একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব এই খুনের মীমাংসা করা। যাবে তুমি, ডিউক?'

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর মুখ তুলে বলল, 'যাব। কিন্তু ওখানে গেলেই যে সমস্ত রহস্য ভেদ করতে পারব, ব্যাপারটা তা নাও হতে পারে।'

'জানি। আমারও ধারণা, এই রহস্যের জড় শুধু হঙকঙে নয়, ঢাকাতেও আছে। তুমি আমার অনুরোধ ফেলনি, সেজন্যে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, ডিউক। যাও, আমার সেক্রেটারীর সাথে দেখা কর। ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমার ছেলের লেখা চিঠিগুলো একবার দেখে নাও। কাজে লাগতে পারে।'

উঠে দাঁড়াল রানা।

'ডানদিকের বারান্দায় বেরোও, তিন নম্বর কামরায় পাবে ওকে,' বেড-চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘন ঘন হাঁপাতে শুরু করলেন বৃদ্ধ। 'ফয়েজ তোমাকে বাধা দিতে পারে। হয়ত বলবে, ঢাকার বাইরে যাওয়া চলবে না তোমার। যাই বলুক, কান দিয়ো না। যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু কর। ফয়েজ যাতে কোন গোলমাল না করে তার ব্যবস্থা

আমি করব।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। বেরুবার আগের মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সামনের সাদা দেয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, যার অতীত অত্যন্ত বেদনাময়, সেই অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে পাথর হয়ে গেছেন যেন।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল সেক্রেটারী, রানাকে ঘরে ঢুকতে দেখে নির্মল একটু হাসল, বলল, 'বসুন।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আবার খস খস করে কি যেন লিখতে শুরু করল। টেবিলের সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। দেখল, পারভিনের সামনে অনেকগুলো চেক বই রয়েছে, এক এক করে চেকের ওপর সই করছে সে। মুখ তুলল না আর, হাতও চালু থাকল, জানতে চাইল, 'আপনি তাহলে হংকঙে যাচ্ছেন, মিঃ ডিউক?'

'বোধহয়।'

'তাহলে স্মল পক্সের টিকা নিতে হবে আপনাকে। কলেরা ইঞ্জেক্শনও ইচ্ছে করলে নিতে পারেন. তবে বাধ্যতামূলক কিছু নয়।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা, 'সিগারেট খেলে আপনার অসুবিধে হবে?'

হাতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল পারভিনের, মুখ তুলে তাকাল। আবার সেই সরল হাসি দেখা গেল মুখে। বলল, 'কোন অসুবিধে হবে না।' দেরাজ খুলে একটা এনভেলাপ বের করল সে, রানার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এর ভেতর শফিকের চিঠিগুলো আছে। বছরে একটার বেশি চিঠি লেখেনি, ঠিকানা ছাড়া বিশেষ কোন তথ্য পাবেন বলে মনে হয় না।'

সবগুলো চিঠির ওপর চোখ বুলাল রানা। ছোট ছোট চিঠি, প্রতি-

চিতে শুধু টাকা পাঠাবার অনুরোধ। প্রথম চিঠিটা ছয় বছর আগের এবং প্রতিটি এক বছর ব্যবধানে লেখা। শেষ চিঠিটা আগ্রহী করে তুলল রানাকে।

হোটেল কসমোপলিটান
ওয়ানচাই

আব্বা,

আমি একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। রেড চায়নার রিফিউজি, নাম সুজি কোয়াও। খুব স্মার্ট, কিন্তু সরল। আমার বিশ্বাস, ওকে বিয়ে করে আমি সুখী হব। আশা করি এ বিয়েতে তোমার আপত্তি হবে না। তুমি তো বলেই দিয়েছ, নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলো আমার নিজেরই নেয়া উচিত।

এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই বিয়ের পর কিছুদিন হোটেলেই থাকব আমরা। এখানে একটা বাড়ি কেনার খুব ইচ্ছে আমার। কিন্তু তোমার কাছ থেকে চাইলে টাকা পাব কিনা জানি না। যদি ইচ্ছে কর, একটা চেক পাঠিয়ে দিয়ো।

তোমার শফিক।

চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলল রানা। পারভিন বলল, 'শেষ চিঠি ওটা। পড়ে মিঃ রহমান সাংঘাতিক ক্ষেপে উঠেছিলেন। সাথে সাথে টেলিগ্রাম করে ছেলেকে বিয়ে করতে নিষেধ করেন। কিন্তু সেই টেলিগ্রামের কোন উত্তর আসেনি, বা শফিকও আর কোন চিঠি লেখেনি।' আরেকটা চিঠি রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে, বলল, 'এটা দিন দশেক আগে এসেছে, সুজির লেখা।'

চিঠিটা পড়ল রানা। ভুল ইংরেজীতে জড়ান অক্ষরে লেখা, পড়তে অসুবিধে হয়। বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায়:

জনাব মীর মোখলেসুর রহমান,

আপনার ছেলে শফিক গতকাল এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আমি যতদূর জানি, ওর ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর পর যেন ওকে আপনাদের পারিবারিক গোরস্তানে মাটি দেয়া হয়। কিন্তু আমার কাছে এমন পয়সা নেই যে ওকে প্লেনে করে ঢাকায় নিয়ে যাব। আপনি যদি টাকা পাঠান তাহলে সে-ব্যবস্থা হতে পারে। ওকে এখানে কবর দেব, সে-সঙ্গতিও আমার নেই।

ইতি, মীর সুজি কোয়াও।

দুঃখবোধ করল রানা। চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা—সামনে স্বামীর লাশ নিয়ে বসে আছে একটা মেয়ে, হাতে কোন পয়সা নেই। কি ভয়ংকর পরিস্থিতি। নিজেরও কোন ভবিষ্যৎ নেই, শ্বশুর যদি দয়া করে বাড়িতে জায়গা না দেন তাহলে নামতে হবে পথে।

সেক্রেটারী পারভিনের দিকে তাকাল রানা। মাথা নিচু করে সোনালী ফাউন্টেন পেন দিয়ে আঁকিবুকি কাটছে কাগজে। চোখের পাতা নামান, মুখ দেখে বোঝা গেল না কি ভাবছে।

খুক করে কাশল রানা। প্রায় চমকে উঠল পারভিন। মুখ তুলে তাকাল। চোখের দৃষ্টি দেখে রানার মনে হল, গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল মেয়েটা এতক্ষণ, ভুলেই গিয়েছিল রানার উপস্থিতি। 'তারপর কি হল?' জানতে চাইল ও।

'ছেলে মারা গেছে এ-কথা প্রথমে বিশ্বাস করেননি মিঃ রহমান,' ধীর, ক্লান্ত সুরে বলল পারভিন। 'উনি ভেবেছিলেন টাকা আদায়ের জন্যে মেয়েটার একটা চাল এটা। কিন্তু হংকঙের একটা দৈনিক পত্রিকায় টেলিফোন করে খবর নিই আমি, জানতে পারি শফিক

সত্যি মারা গেছে। মিঃ রহমান এরপর বললেন, মেয়েটার আসার দরকার নেই, সে যেন শুধু লাশটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে।'

'কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েটা তো অসহায় হয়ে পড়ল, তাই না···?'

রানাকে বাধা দিয়ে বলল পারভিন, 'মিঃ রহমান বললেন, আমি যেন চিঠি লিখে মেয়েটাকে জানাই, হঙকঙেই তার রুটি-রোজগারের একটা ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। কিন্তু, জানেনই তো, লাশের সাথে সে-ও চলে এসেছিল···কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে এখানে না এসে সোজা আপনার অফিসে···'

'জানি,' বলল রানা। পারভিনের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল, 'শফিকের লাশ? সেটা কোথায়?'

নিমেষের মধ্যে মুখের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল পারভিনের। মনের ভেতর যে একটা সাংঘাতিক ভাবাবেগের আলোড়ন উঠেছে, বাইরে থেকে দেখেও সেটা পরিষ্কার টের পেল রানা।

'আছে,' দ্রুত নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বলল পারভিন। 'পরশু মাটি দেয়া হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড পারভিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'হঙকঙে কি করত শফিক?'

'সেটা ঠিক জানা যায়নি। প্রথম দিকে মিঃ রহমান এখান থেকে চেষ্টা করে ওখানে ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—একটা ইণ্ডেন্টিং ফার্মের অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। কিন্তু মাস ছয়েক পর চাকরিটা ছেড়ে দেয় সে। এরপর কি করত, কিভাবে চলত, ওর বাবাকে তা জানায়নি।'

'চিঠি লিখে টাকা চাইলেই কি তা পাঠান হত এখান থেকে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে বছরে একবারের বেশি টাকা চাইত না ও।

পাঁচ শো ডলারের বেশি চায়ওনি কখনও। মনে হয়, রোজগারের একটা রাস্তা তার ছিল।'

পারভিনকে সতর্ক হবার কোন সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ করে প্রশ্নটা করল রানা, শফিকের সাথে আপনার কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল? মানে, তাকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন?'

চমকে উঠল পারভিন। প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর বিমূঢ়, সবশেষে রাগের ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। চেক বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'আপনার কি কত জানা নেই আমাদের, এটা অগ্রিম হিসেবে রাখুন। এক লক্ষ টাকা। আপাতত চলবে তো? হংকং থেকে ফিরে এসে বিল করবেন, সব মিটিয়ে দেয়া হবে। আর, কবে রওনা হতে পারবেন, সেটা জানালেই আমরা আপনার প্লেনের টিকেট কেটে রাখতে পারব। এখন আপনি আসুন মিঃ ডিউক।'

চেকটা নিল রানা। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল। ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'বসুন,' নরম সহানুভূতির সুরে বলল ও 'আমি শুনেছি···

'না।' চাপা গলায় বাধা দিল পারভিন। 'আপনি কি শুনেছেন তা আমি জানতে চাই না। প্লীজ, আপনি এখন আসুন।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। এ প্রসঙ্গে আমি আর কোন প্রশ্ন করব না আপনাকে। কিন্তু আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। এই খুনের কিনারা করতে হলে এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা দরকার।'

'বলুন।' থমথমে গলায় বলল পারভিন। রানা লক্ষ্য করল, একটু

পাশের কামরা

একটু কাঁপছে মেয়েটা।

'কেমন লোক ছিল শফিক?'

'লম্পট, মিথ্যেবাদী, নীচ ছিল। পেয়েছেন আপনার প্রশ্নের উত্তর?' থরথর করে কাঁপছে এখন পারভিন। 'দয়া করে এবার আপনি যাবেন কি?'

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আর যদি কিছু বলার না থাকে আপনার...' কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'নেই।' কঠিন সুরে বলল পারভিন।

'তবু যদি কিছু বলার আছে বলে মনে করেন, আমার ফোন নাম্বার তো আপনার কাছে আছেই!' বলে আর দাঁড়াল না রানা।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

'কি?' খুব যেন অবাক হয়েছে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। 'মীর সাহেব তোমাকে হংকং পাঠাচ্ছেন? কেন?'

'তাঁর ধারণা, সুজি কোয়াও-র ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা থাকলে এই কেসের সুরাহা করা সহজ হবে,' বলল রানা। 'আইডিয়াটা আমার ভাল লেগেছে।'

'যত্তোসব।' বিরক্তি প্রকাশ করল ইন্সপেক্টর। পরমুহূর্তে সগর্বে হাসল সে 'হংকং না গিয়েও মেয়েটা সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি আমি, ওখানে গিয়ে তার সিকি ভাগও জানতে পারবে না তুমি। আমার কানেকশন আছে, একটা টেলিফোন করে সব জেনে ফেলেছি।'

'তাই?' বলল রানা। 'তা কি জানতে পেরেছেন?'

'মেয়েটার নাম সুজি কোয়াও। চীন থেকে ম্যাকাও এসেছিল, সেখান থেকে হঙকঙ। হঙকঙ পুলিশ ওকে গ্রেফতার করে। ছ'হপ্তা জেল হয় ওর। তারপর ছাড়া পেলে কাগজ-পত্র মানে নতুন পরিচয়-পত্র দেয়া হয় ওকে। সেই থেকে গোল্ডেন ড্রাগনে চাকরি করত ও —নাচত। তার মানে, বুঝতেই পারছ, আসলে কলগার্ল ছিল।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'আর কি?'

'শফিকের সাথে ওর বিয়ে হয় গত বছর একুশে সেপ্টেম্বর···

'কোথায় হয় বিয়েটা?'

'হঙকঙে প্রচুর মুসলমান আছে, জান বোধহয়? বিয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সাধারণত কাজীর অফিসে সারা হয়। ওদের বিয়েটাও তাই হয়। বিয়ের পর হোটেল কসমোপলিটানে ওঠে ওরা। শফিকের বোধহয় কোন রোজগার ছিল না, বউয়ের রোজগারেই বাবুগিরি করত।' এক গাল হাসল ফয়েজ আহমেদ। 'এর বেশি জানার আর কি আছে? হঙকঙে গিয়ে এর চেয়ে বেশি আর কি জানতে চাও তুমি?'

প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'এদিকে আপনি কতদুর এগোতে পারলেন?'

'কই আর এগোতে পারছি!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফয়েজ আহমেদ। 'সেই প্রথম প্রশ্নটারই তো উত্তর মিলছে না। অত রাতে, তিনটের দিকে, তোমার অফিসে কেন গিয়েছিল সুজি কোয়াও?'

'আমারও ওই এক প্রশ্ন,' বলল রানা। 'তাছাড়া, হঙকঙের একটা মেয়ে, আমার কথা জানলই বা কিভাবে? ভাল কথা, মেয়ে-টার সাথে লাগেজ কি ছিল না ছিল খোঁজ নিয়েছেন?'

'নিয়েছি। সামান্য কিছু কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু নেই

তার স্যুটকেসে।'

'আমার কাছে কেন গিয়েছিল, এর উত্তর বোধহয় হঙকঙে গেলে পাব,' সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'আরেকটা কথা ভেবেছেন কি?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ইন্সপেক্টর।

'বুড়ো মীর সাহেবের অগাধ সয়-সম্পত্তি, বেঁচে থাকলে শফিকই এসব পেত। উনি যদি উইল পাল্টে না থাকেন, তাহলে এসব পাবে তার পুত্রবধূ সুজি কোয়াও।' শফিকের প্রথম বিয়ের কথাটা ইচ্ছে করেই তুলল না রানা। 'এখন জানতে হবে, এমন কেউ আছে কিনা যে সুজি কোয়াও-র অবর্তমানে সব সম্পত্তির মালিক হবে? খুনের এটা একটা মোটিভ হতে পারে।'

'নাহ্, তোমার এই গুণটার কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে —নতুন নতুন আইডিয়া আসছে ত আসছেই। দেখব, ব্যাপারটা আমি গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখব।'

'বুড়ো মীর সাহেবের সেক্রেটারীর সাথে কথা বলেছেন?' জানতে চাইল রানা। 'বুড়ো মারা গেলে সম্পত্তির কিছু ভাগ ও যদি পায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বুড়োর সব কিছুতেই তো ওই সেক্রেটারী। শুনেছি, শফিকের সাথে ওর নাকি হৃদয়ঘটিত একটা ব্যাপারও ছিল। সুজি কোয়াও যখন খুন হয়, রাত তিনটের দিকে, সেক্রেটারী মেয়েটা তখন কোথায় ছিল, একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন না?'

'তোমার এই আইডিয়াটা আমার তেমন পছন্দ হল না,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'কে কার সাথে প্রেম করত তা আমার জানার কোন দরকার নেই। আমি শুধু জানতে চাই, হঙকঙ থেকে ঢাকায় নেমে অত রাতে সুজি কোয়াও তোমার অফিসে গেল কেন? এই

প্রশ্নের উত্তর পেলে সব রহস্যের মীমাংসা করে ফেলব।' খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হল ইন্সপেক্টরকে।

মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল রানা।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে সোজা রঙ্গি বিল্ডিঙে ফিরে এল ও। নিজের অফিসের দরজা খুলতে যাবে, এই সময় একটা বুদ্ধি ঢুকল মাথায়। করিডোর ধরে কয়েক গজ এগিয়ে ইনডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট জাকের চৌধুরীর অফিসের সামনে দাঁড়াল, তারপর নক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সাজান গোছান বড় আকারের অফিস। দরজার সামনে দাঁড়ালে সোজা সামনে একটা ডেস্ক দেখা যায়, তাতে ছোট একটা ক্যাসেট টেপরেকর্ডার, টেলিফোন এবং পোর্টেবল টাইপরাইটার রয়েছে। ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে পাইপ টানছে জাকের আলি চৌধুরী। রানাকে দেখেই ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে। 'কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন, মিঃ ডিউক!' পাশের গদিমোড়া একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন, এখানটায় বসুন।'

রঙবাজ হিসেবে যার কুখ্যাতি আছে, এবং অতি সম্প্রতি যার ঘরে খুন হয়েছে একটা মেয়ে, তাকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানটা হয়ত একটু অস্বাভাবিক, কিন্তু ভয়ে বা অমঙ্গল এড়াবার জন্যে মানুষ অনেক সময় তার আচরণে কৃত্রিম আন্তরিকতা একটু বেশিই দেখিয়ে ফেলে—ব্যাপারটাকে তাই তেমন গুরুত্ব দিল না রানা। হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসল ও। পাশের ঘর থেকে খটাখট আওয়াজ আসছে, ওখানে বসে টাইপ করছে জাকের চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মেয়েটা।

'চা? কফি? না, কোক?' রানার দিকে ঝুঁকে হঠাৎ গলা-

পাশের কামরা

টাকে একেবারে খাদে নামিয়ে আনল রসায়নবিদ। 'নাকি বিকেলের দিকে এসব আপনার চলে না? যদি বলেন তো একটু স্কচের ব্যবস্থাও করতে পারি আপনার জন্যে।' হে হে করে একটু হাসল জাকের চৌধুরী। 'ব্যবসা যখন মন্দা যায়, মনটাকে চাঙা করার জন্যে দু'-এক চোক আমিও খাই আর কি? চলবে?' রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে ডেস্কের ওপর রাখা টেপরেকর্ডারের দিকে তাকাল সে। 'মাঝে মধ্যে দু'একটা গানও শুনি আর কি! মান্না ডে, কিশোর, আশা ভোঁশলে...তা চলবে? স্কচ?'

'আজ ওসবের কোন দরকার নেই, আরেকদিন এসে আপনার স্কচ এবং সঙ্গীতের সদ্ব্যবহার করা যাবে। আমি একটা কাজে এসেছি।'

'বলুন! বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি!'

'না, তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'একটা তথ্য দরকার আমার, আপনি জানেন কিনা...মানে, মীর সাহেবের এই যে অগাধ সয়-সম্পত্তি, ছেলের মৃত্যুর পর এসব পাবে কে? নিশ্চয়ই তার কোন আত্মীয় আছে...?'

দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল জাকের চৌধুরী 'পরিবারটিকে অনেক দিন থেকে চিনি আমি। শফিক নিজেই একবার বলেছিল আমাকে. ওর বাপের সম্পত্তি ও একাই পাবে, কারণ আর কোন দাবীদার নেই।'

'তাহলে? এখন মীর সাহেব কাকে...

'কাকে আবার, পারভিনকে দিয়ে যাবেন সব।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'তার মানে, চীনা মেয়েটা খুন হয়ে পারভিনের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।'

কেমন যেন একটু বিমূঢ় দেখাল জাকের চৌধুরীকে। 'ঠিক তা নয়, কারণ, চীনা মেয়েটা বেঁচে থাকলেও শফিকের বাবা তাকে কিছু দিয়ে যেতেন বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু শফিকের স্ত্রী হিসেবে দাবী করার অধিকার থাকত তার। কোর্ট বোধহয় তার পক্ষেই রায় দিত।'

ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবল জাকের চৌধুরী। তারপর বলল, 'বোধহয়।' ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল হঠাৎ করে। 'তার মানে, যেই খুন করে থাকুক চীনা মেয়েটাকে, নিজের অজান্তেই বোধহয় পারভিনের উপকার করেছে সে?'

'নিজের অজান্তে বলছেন কেন? এমনও তো হতে পারে যে পারভিনের উপকার হবে মনে করেই খুনটা করা হয়েছে? এমনও তো হতে পারে যে নিজের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি পারভিন, কিন্তু সোজা পথে অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে বাঁকা অর্থাৎ ক্রাইমের পথ ধরেছে সে?'

কয়েক সেকেণ্ড বোকার মতো তাকিয়ে থাকল জাকের চৌধুরী। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'মাই গড! চমৎকার একটা মোটিভ আবিষ্কার করে ফেলেছেন আপনি, ইয়েস!'

'পারভিন সম্পর্কে আর কি জানেন, বলুন তো?' একটা সিগারেট ধরাল রানা। ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড ইত্যাদি...'

'মা ছোটবেলায় মারা গেছে, কোন ভাই-বোন নেই, বাবা সাখাওয়াৎ হোসেন সরকারী কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু তিনিও পারভিনের বিয়ের আগে মারা যান—এর বেশি আর কিছু জানি না আমি।'

জাকের চৌধুরীর সেক্রেটারী মেয়েটা কিছু কাগজ-পত্র নিয়ে

পাশের কামরা

এসে রাখল ডেস্কের ওপর। উঠে দাঁড়াল রানা। 'আজ চলি। ওদের সম্পর্কে যদি কিছু মনে করতে পারেন, আমাকে জানাতে ভুলবেন না, কেমন, মিঃ চৌধুরী? এই কেসের সুরাহা করতে হলে খুঁটিনাটি সব কিছু আমার জানা দরকার।'

'অবশ্যই!' উঠে দাঁড়িয়ে রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করল জাকের চৌধুরী। 'কেসটার কতদূর কি হল, আমাকেও জানাবেন আপনি, কেমন, মিঃ ডিউক?'

জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

পাঁচ

পরদিন সকালে মীর-মঞ্জিলে ফোন করল রানা। পারভিনকে বলল, 'এদিকে আমার আর কোন কাজ নেই, কালই হংকঙে যেতে পারি। প্লেনের রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে কি?'

'আজ সন্ধ্যার মধ্যে সব সেরে রাখব আমি,' বলল পারভিন। 'আর কিছু?'

'আর কিছু মানে?'

'আপনার আর কিছু দরকার হবে?'

'মীর-মঞ্জিলে আমার একবার যেতে হতে পারে,' বলল রানা। 'এই সন্ধ্যের দিকে।'

'কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় তো মিঃ মীর বাড়িতে থাকবেন না...

'আপনি থাকবেন তো ?'

'তা থাকব, কিন্তু আমাকে আপনার কি দরকার, মিঃ ভিউক ?' শান্ত কণ্ঠস্বর, কোন রকম উত্তেজনা নেই।

'দেখা হলে বলব,' পারভিনকে আর কিছু বলতে না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল রানা।

বেলা এগারোটার দিকে হুকুম আলিকে মাত্র বিদায় করে একটা সিগারেট ধরিয়েছে রানা, এই সময় পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল জাকের চৌধুরী। 'না, আপনাকে ডিসটার্ব করতে আসিনি। একটা কথা জিজ্ঞেস করেই কেটে পড়ব। আপনি জানেন, কখন মাটি দেয়া হবে শফিককে ? আমারও যাওয়া উচিত, তাই না ? হাজার হোক ছোটবেলার বন্ধু ছিল...

'কাল মাটি দেয়া হবে, কিন্তু কখন তা তো জানি না।'

নিরাশ হল জাকের চৌধুরী। 'কি করে জানা যায় বলুন তো ?'

'আজ সন্ধ্যেয় পারভিনের সাথে দেখা করছি, তখন জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।'

'প্লীজ! খুব ভাল হয় তাহলে!' দ্রুত প্রসঙ্গ বদল করল জাকের চৌধুরী। 'হুকুম আলি বলছিল, আপনি নাকি কাল হংকং যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, আপনার বন্ধুর বাবার প্রতিনিধি হিসেবে। মীর সাহেবের ধারণা, ওখানে অনেক সূত্র পাওয়া যাবে।'

'ওনার সাথে তাহলে দেখা করেছেন ? কেমন মনে হল ভদ্রলোককে ?'

'নিঃসঙ্গ। পুত্রশোকে কাতর। ভদ্রলোককে দেখে দুঃখ হল। অল্প ক'টা দিন বাঁচবেন আর, অথচ আপনজন বলতে কেউ নেই যাকে দেখে অতীতের মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ভুলে থাকতে পারেন।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল চৌধুরী। 'সত্যি। বড় প্যাথেটিক।' আবার দ্রুত প্রসঙ্গ বদল করল সে। 'আপনার অনুপস্থিতিতে যদি কোন কাজ করার থাকে, বলতে পারেন আমাকে।'

'ধন্যবাদ। অফিস বন্ধ করেই যাব আমি।'

'ফিরে এসে কিন্তু ওখানে কি দেখলেন, কি ঘটল সব বলতে হবে আমাকে।' আবদারের সুরে বলল চৌধুরী।

'বলব।'

চলে গেল চৌধুরী।

সেদিন বিকেলে গাড়ি নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলে এল রানা। আগেই বলে রেখেছিল ও, মর্গ থেকে সুজি কোয়াও-র একটা ফটো তুলিয়ে রেখেছিল ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে ফটোগ্রাফার, ফটোতে একেবারে জ্যান্ত লাগছে মেয়েটাকে। ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে আগেই জেনেছে রানা, আজিমপুর কবরস্থানে মাটি দেয়া হবে সুজিকে, তার মানে মীরদের পারিবারিক কবরস্থানে তার ঠাঁই হচ্ছে না।

সেদিনের মতো সন্ধ্যে ছটার দিকে অফিসে তালা দিল রানা। কাল ক'টার সময় ফ্লাইট জানা নেই, শেষ মুহূর্তে যাতে তাড়াহুড়ো করতে না হয় তাই পুরনো ডেরায় ফিরে এসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা পৌঁছুল মীরমঞ্জিলে।

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে বাটলার নয়, সেক্রেটারী পারভিন নিজেই খুলে দিল দরজা। শান্ত চেহারা, চোখের দৃষ্টিতে না আছে

আনন্দ, না বিরাগ। আসুন' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, পথ দেখিয়ে নিয়ে এল হলরুমে, সেখান থেকে একটা প্যাসেজ ধরে নিজের ড্রইংরুমে। পথে কোন কথা হল না, পিছন ফিরে একবার তাকালও না পারভিন। ড্রইংরুমটা রুচিসম্মত ভাবে সাজান, দেয়ালে কয়েকটা তৈলচিত্র, জানালায় মখমলের পর্দা, মেঝেতে দামী কার্পেট। একটা সোফা দেখিয়ে বসতে বলল পারভিন। বসল রানা। সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে লক্ষ্য করল, আজ একটু সাজগোজ করেছে পারভিন। রানার সামনের সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বলল, 'মীর-মঞ্জিলে এসে কেউ খালি মুখে ফিরে যায় না, চা বলি?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আমি এসেছি শফিকের একটা ফটো চাইতে। আছে আপনার কাছে?'

'শফিকের ফটোগ্রাফ?' অবাক দেখাল পারভিনকে। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল সে। 'কেন? কি দরকার?'

'আমি যে শুধু সুজি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হঙকঙ যাচ্ছি তা নয়, শফিক সম্পর্কেও খবর যোগাড় করতে হবে আমার। সেজন্যেই ওর ছবি দরকার। আছে?'

কি যেন একটু চিন্তা করল পারভিন, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় কাত করে বলল, 'আছে।' ঘুরে একটা শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কবাট খুলে ভেতর থেকে অনেকগুলো খামের ভিতর থেকে একটা খাম বেছে নিল সে। আবার ঘুরল, ধীর পায়ে চলে এল আগের জায়গায়। খামটা খুলছে, এই সময় সেটার ভেতর থেকে একটা পাসপোর্ট সাইজের ফটোগ্রাফ পড়ে গেল সোফার ওপর। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ফটোটা দেখল রানা। বিস্ময় ফুটে উঠল ওর চেহারায়। চোখের সামনে ভেসে উঠল পপির সেই সঙ্গীটির চেহারা।

সেই সাথে মনে পড়ে গেল ছেলেটির সেই যান্ত্রিক ভঙ্গিতে উচ্চারিত কথাটা—'আমার নাম মীর সাদেকুর রহমান'।

দ্রুত ফটোটা তুলে খামের ভেতর ভরে রাখল পারভিন। অন্য একটা ফটো রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এই নিন, ওর এই একটা ছবিই ছিল আমার কাছে।'

সাধারণ কোন স্টুডিওতে তোলা হয়েছে ছবিটা। হাফ পোস্টকার্ড সাইজ। ছবির লোকটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। মুখটা হাসি হাসি, চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, সাংঘাতিক ধূর্ত একজন লোক। ভুরু জোড়া বড় বেশি মোটা। কর্কশ মুখের দু'পাশে হাড় ওঠা চেহারা। একজন ক্রিমিন্যালের চেহারা, মনে হল রানার। রীতিমত বিস্মিত হয়েছে ও। শফিক যে এই রকম দেখতে হবে, ভাবতেও পারেনি। মিথ্যেবাদী, লম্পট, নীচ—শফিক সম্পর্কে কি বলেছিল পারভিন, মনে পড়ে গেল ওর। ছবি দেখে কথাগুলো বিশ্বাস হল। চোখ তুলে দেখল, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে পারভিন। চেহারায় কোন ভাব নেই।

খুক করে একটু কেশে বলল রানা, 'ছবির এই লোকটা যে মীর সাহেবের ছেলে, বিশ্বাসই হয় না।'

একচুল নড়ল না পারভিন, একটা কথাও বলল না। যেমন তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়ে থাকল।

'ভাল কথা, চীনা মেয়েটা কেমন দেখতে ছিল, জানতে ইচ্ছে করে আপনার?' পকেট থেকে সুজি কোয়াও-র ফটোটা বের করে পারভিনের দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

এক দুই করে দশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, ছবিটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল না পারভিন। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখল রানা,

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা। আরো দু'সেকেণ্ড পর রানার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওর হাতে ধরা ফটোর দিকে তাকাল। রানার মনে হল, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল পারভিন। নিজেকে শান্ত রাখতে অনেক যেন কষ্ট হচ্ছে তার। হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল এবার। অনেকক্ষণ ধরে দেখল। অভিব্যক্তিহীন চেহারা। মনের ভেতর কি হচ্ছে না হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। তারপর ছবিটা ফেরত দেবার জন্যে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

মৃদু গলায় বলল, 'খুব সুন্দরী ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'আপনি জানেন, কাল কখন মাটি দেয়া হবে শফিককে?'

হঠাৎ কেমন যেন সচকিত হয়ে উঠল পারভিন। 'কেন? তা জেনে আপনার কি দরকার?'

'শফিকের একজন স্কুল-ফ্রেণ্ড সময়টা জানতে চাইছিল। ভদ্র-লোকের নাম জাকের আলি চৌধুরী।'

সারা শরীর পাথর হয়ে গেল পারভিনের। 'শফিকের বাবা মিঃ রহমান ছাড়া ওখানে আর কেউ থাকবে না। বন্ধুটি যেই হোক তাকে বলে দেবেন মীর পরিবার বাইরের কাউকে ওখানে চায় না।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'বলে দেব। কবর দেবার সময় থাকতে না পারলে ভদ্রলোক বোধহয় কিছু ফুল পাঠিয়ে দেবেন…'

হঠাৎ রানার দিকে পিছন ফিরল পারভিন। 'না!' কঠিন সুরে বলল সে। 'ওখানে কারো ফুল পাঠাবারও দরকার নেই!' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল, 'আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, মিঃ ডিউক?'

'আছে,' বলল রানা। 'এইমাত্র বাচ্চা ছেলের যে ফটোটা সোফায় পড়ে গিয়েছিল, জানতে পারি কে ও?'

চরকির মত আধপাক ঘুরল পারভিন। চোখ দুটো জ্বলছে তার। 'আপনার এসব প্রশ্নের অর্থ কি বলুন তো? গতকালও আপনি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে আমাকে বিব্রত করেছেন। কেন?'

'কেন?' তিক্ত একটু হাসল রানা। 'এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না? খুনটা আমার অফিসে করা হয়েছে। খুনী ফাঁসাবার চেষ্টা করেছে আমাকে। আমি যে নির্দোষ, সেটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে না? এবং তা করতে হলে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে আমার। কিভাবে তা সম্ভব, বলতে পারেন? সম্ভব মীর পরিবারের সাথে কোন না কোন সম্পর্ক আছে এমন সবাইকে সন্দেহের তালিকায় ফেলে এক এক করে তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করা। শেষ পর্যন্ত এক কি দু'জনকে কোনো ভাবেই তা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। কারণ সে অথবা তারাই প্রকৃত অপরাধী। এই মুহূর্তে আপনিও আমার সন্দেহের তালিকায় আছেন।'

'আ-আমি?' হতভম্ব দেখাল পারভিনকে।

'হ্যাঁ, আপনি। আমার সন্দেহের তালিকায় প্রথম নামটাই আপনার।'

'এসব কি বলছেন আপনি!' অবিশ্বাসে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল পারভিনের।

'সুজি কোয়াও মারা গেলে একমাত্র আপনারই লাভ, কথাটা অস্বীকার করতে পারেন?'

'আমার লাভ?'

'নয়?' নির্মম শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'ফটোর ওই বাচ্চা ছেলে-

টা কে? ওর নাম মীর সাদেকুর রহমান নয়? ওর মায়ের নাম পারভিন আর বাবার নাম মীর শফিকুর রহমান নয়? আপনি এ-বাড়ির বউ নন?' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর বলল, 'চুপ করে থাকবেন না, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন!'

পারভিন যেন পাথর হয়ে গেছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'এসব সত্যি জেনেও আপনি চুপ করে থাকছেন। কারণ, আপনার হয়ত ভয়, কথাগুলো স্বীকার করলেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। সেই সাথে খুনের সম্ভাব্য একটা মোটিভ প্রকাশ হয়ে পড়বে। সেজন্যেই চুপ করে আছেন আপনি কে জানে, আপনার এই চুপ করে থাকার পেছনে হয়ত আরো অনেক বড় কারণ আছে।'

'আ-আমি এ-বাড়ির ব-বউ?' ফিসফিস করে বলল পারভিন। 'অ আপনি জানলেন কিভাবে? কারো তো জানার কথা নয়।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর হল না ওটা।'

'না!' হঠাৎ তীক্ষ্ণ, চাপা গলায় বলল পারভিন। 'মিথ্যে কথা! আমি-এ বাড়ির কেউ নই! আমি মিঃ রহমানের সেক্রেটারী, তার বেশি কিছু না। কোত্থেকে শুনেছেন আপনি? কে বলেছে আপনাকে?'

'শফিকের বন্ধু নকল মৌলভী সেজে আপনাদের বিয়ে পড়িয়েছিল, কথাটা মিথ্যে?' হঠাৎ গলার স্বর নরম করে আনল রানা। 'এই খুনের কিনারা হোক আপনি কি তা চান না? আপনার বিয়েটা স্বীকৃতি পাক, তাও কি আপনি চান না? আমার কথার জবাব দিন, আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাই। সেই নকল মৌলভীর খোঁজ করেছেন কখনও? সে বেঁচে আছে কিনা জানেন?'

বিমূঢ়, বিহ্বল দেখাল পারভিনকে। বোকার মতো তাকিয়ে

পাশের কামরা

থাকল সে। তারপর হঠাৎ অস্থিরতা প্রকাশ পেল তার চোখের দৃষ্টিতে। 'এসব আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন? প্লীজ, বলুন আমাকে!'

'শফিকের একজন বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছি সব.' বলল রানা। 'শফিকই গল্প করেছিল তার কাছে। আমার কথার জবাব দিন, সেই নকল মৌলভীকে চেনেন আপনি?'

'অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু, শান্ত গলায় বলল পারভিন, 'না।'

'তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না?'

'না।'

'আবার যদি দেখেন তাকে, দাড়ি না থাকা অবস্থায়, চিনতে পারবেন?'

'না।'

'দাড়ি থাকলে চিনতে পারবেন?'

'পারব!' দাঁড়িয়ে আছে রক্ত-মাংসের পারভিন নয়, যেন একটা কাঠের পুতুল।

'বিয়ে পড়াবার সময়, তার আগে বা পরে, লোকটাকে আপনি লক্ষ্য করেননি? তার কোন বৈশিষ্ট্য আপনার চোখে ধরা পড়েনি?'

'না।'

'কখনও তার খোঁজ করেছিলেন?'

'মিঃ রহমান করেছিলেন, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আমি জানতাম তার কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না, তাই...'

'হুঁ,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। একটু চিন্তা করল ও। তারপর বলল, 'শফিকের সেই সময়কার বন্ধুদের একটা নামের তালিকা দিতে

পারেন আমাকে? যারা মাইক্রোবাস অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল তাদেরকে বাদ দিয়ে তৈরি করতে হবে তালিকাটা। নাম, সেই সাথে ঠিকানা, এবং সম্ভব হলে একটা করে ফটো। সম্ভব?'

'কয়েক জনের নাম এবং তখনকার ঠিকানা আমার জানা আছে, আর ফটোর জন্যে শফিকের অ্যালবামগুলো দেখতে হবে আমাকে। কিন্তু অ্যালবামগুলো কোথায় আছে জানি না, দু'একদিন সময় লাগবে খুঁজতে।' কি যেন ভাবল সে, তারপর হঠাৎ জানতে চাইল, 'কিন্তু এসব কিসের জন্যে, মিঃ ডিউক?'

'আপনি মীর বাড়ির বউ হিসেবে স্বীকৃতি চান না? চান না, আপনার সন্তান তার ন্যায্য সম্মান আর অধিকার ফিরে পাক?'

রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পারভিন। রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল ও, বলল 'যার স্বীকৃতি দরকার ছিল সে-ই যখন নেই, ও দিয়ে আর কি হবে? এমনি তো ভালই আছি। চাকরি করে ছেলেটাকে ঠিকই মানুষ করতে পারব আমি। মীর বাড়ির বউ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া মানেই তো অগাধ সয়-সম্পত্তির নিচে চাপা পড়া। ওসব আমার দরকার নেই।

দরকার নেই, নাকি সোজা পথে পাবার কোন আশা নেই জেনে বাঁকা পথে নিজের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে? কিন্তু সন্দেহটা মনেই পুষে রাখল রানা। বলল, 'কিন্তু আপনার ওপর অন্যায় করা হয়েছে, তার প্রতিকার আপনার চাওয়া উচিত এবং অন্যায় শুধু আপনার ওপর করা হয়নি, মীর সাহেবের ওপরও করা হয়েছে। তাঁর একমাত্র বংশধর বেঁচে আছে, অথচ তাকে তিনি স্বীকৃতি দিতে পারছেন না—তাঁর এই নিঃসঙ্গতার জন্যে আপনার দুঃখ হয় না?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু গলায় পারভিন বলল, 'হয়।

আমি বুঝতে পারি, এই বুড়ো বয়সে আমাদের কথা ভেবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন তিনি। কিন্তু আমাদেরকে স্বীকৃতি দেবেন, সে উপায়ও তাঁর নেই। আমি যার স্ত্রী সে-ই আমাকে স্বীকার করেনি। উনি কি করতে পারেন?'

'আমি কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নই,' বলল রানা। 'চেষ্টা করলে আপনাদের বিয়েটা হয়ত এখনও প্রমাণ করা সম্ভব।'

'আমি তা মনে করি না। প্রমাণ করতে গেলে শুধু শুধু মীর পরিবারের দুর্নাম ছড়াবার পথই প্রশস্ত করা হবে—সেটা আমার কাম্য নয়।'

'হুঁ,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'ঠিক আছে, দেখা যাক

ঘুরে দাঁড়াল পারভিন, দেরাজ খুলে একটা এনভেলাপ বের করল এগিয়ে এসে সেটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'এতে আপনার প্লেনের টিকেট আর কিছু হংকং ডলার আছে। টেলিফোন করে ওখানে কোন হোটেলের রুম রিজার্ভেশন করে রাখব? মিরমো আর দি পেনিনসুলা ওখানের সবচেয়ে ভাল হোটেল···

'না, আমি হোটেল কসমোপলিটানে উঠব বলে ঠিক করেছি।'

হঠাৎ সতর্ক, সচকিত হয়ে উঠল পারভিন। 'ও, আচ্ছা!'

'ক'টার সময় ফ্লাইট?' উঠে দাঁড়াল রানা।

'এগারোটায়,' বলল পারভিন। 'যাবার আগে আর কিছু প্রয়োজন হলে টেলিফোন করবেন, কেমন?'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। গাড়িতে বসে সিগারেট ধরাল। মাত্র আটটা বাজে। কোথায় যাওয়া যায় এখন? মনে ক্ষীণ একটু আশা ছিল পারভিনের সাথে সাপার খাবে। কিন্তু প্রস্তাব দেবার মতো ঘনিষ্ঠ হবার অবকাশই দেয়নি মেয়েটা। ওকে সঙ্গ দেবার

মতো মেয়ে ঢাকা শহরে কম নেই, কিন্তু পারভিনের জায়গায় তাদের কাউকে মনে ধরল না ওর। অগত্যা ঠিক করল, বাড়ি ফিরবে। কাল হঙকঙে নেমেই হয়ত তদন্তের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে ওকে, আজকের রাতটা সেঁটে ঘুমান যাক।

গাড়ি হাঁকিয়ে মগবাজারে চলে এল রানা। এখানেই ওর পুরনো আস্তানা। মেইন রোডের ওপর একসার গ্যারেজ। গ্যারেজের ওপর দুই কামরার ছোট ফ্ল্যাট। কামরা দুটো অন্ধকার, দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে। জানালাগুলো লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা, কিন্তু সেগুলো সচরাচর খোলে না ডিউক। কৌতূহলী মানুষের চোখের আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে ও। আধ-বয়েসী ঠিকে ঝি রোজ একবার করে এসে ঘর-মোছা আর বাসন পেয়ালা ধোয়াধুয়ির কাজগুলো সেরে দিয়ে যায়। ফ্ল্যাটের সামনে লম্বা একটা বারান্দা, পাতলা তারের জাল দিয়ে ঘেরা সেটা। সিঁড়ির দু'পাশে উঁচু পাঁচিল, ওঠা নামার সময় কারো চোখে পড়তে হয় না। সিঁড়ির নিচে অত্যন্ত মজবুত সদর দরজা, বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় সেটায় তালা দিয়ে গেলেও কারো কিছু বলার নেই। আর সব গ্যারেজের ওপরও এই রকম কিছু ফ্ল্যাট আছে, সেগুলো সব অফিস ঘর হিসেবে ভাড়া দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যার পর এলাকাটা একেবারে ফাঁকা মুক্তাঙ্গন হয়ে যায়।

দোতালায় উঠে কামরার সামনে দাঁড়াল রানা। পকেট থেকে চাবি বের করে ইয়েল লকটা খুলল। বসার ঘরে ঢুকল ও। বন্ধ করল দরজা, কিন্তু তালা দিল না। হঠাৎ কি যেন দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ফ্ল্যাটের পিছন দিকে একটা প্রথম সারির প্রসাধনী কোম্পানীর নিওন সাইন আছে, সেটার লাল নীল আলো ঘরের ভেতরে ঢুকেছে বলে লোকটাকে দেখতে পেল রানা। জানালার ধারে একটা

আর্মচেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বেশ আরাম করে বসেছে সে, পায়ের ওপর তুলে দিয়েছে পা, কোলের ওপর ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজের ওপর নিঃসাড় পড়ে আছে হাত দুটো। বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় এ লোকের আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই।

প্রতি মুহূর্তে বিপদের সাথে সহবাস যার, বিপদ চিনতে তার ভুল হবার কথা নয়। অন্ধকার ঘরে লোকটাকে বসে থাকতে দেখে হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল ওর। নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক সেকেণ্ড, অনুভব করল এরই মধ্যে জুলফির নিচে সড় সড় করছে ঘামের ধারা। পাশেই আলোর সুইচ; হাত তুলে সেটা টিপে দিল ও।

অল্প বয়স, বাইশ কি তেইশ। বয়সের তুলনায় কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক চওড়া। কোমরটা সরু, কিন্তু বুকটা প্রশস্ত। এ ছোকরা অসুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, মনে মনে স্বীকার করে নিল রানা। কালো একটা লেদার জ্যাকেট পরে আছে, ট্রাউজারটাও কালো। গলায় একটা লাল রুমাল পেঁচান কণ্ঠনালীর কাছে উঁচু হয়ে আছে রুমালের গিটটা।

দেখেই চিনতে পারল রানা—জাত খুনী। অনেক শিশু যেমন পিঁপড়ে টিপে মেরে আনন্দ পায়, এরা তেমনি অকারণে বা সামান্য কারণে মানুষ খুন করে মজা পায়। ছেলেটার চোখ দুটো আঁকা ছবির মতো, সমতল। মণি দুটো জ্বলজ্বল করছে। জুলফির নিচে থেকে চিবুক পর্যন্ত সাদা একটা পুরনো ক্ষতচিহ্ন, বোধহয় ছুরি খেয়েছিল। এদেরকে চেনা আছে রানার। ড্রাগ অ্যাডিক্ট। এই বয়েসী যত খুনী এর আগে দেখেছে রানা তাদের সবার চেয়ে ভয়ংকর মনে হল একে। আশ্চর্য এক অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তা অনুভব করল সে।

ক্ষীণ, ঠাণ্ডা, নিঃশব্দ হাসি ফুটল ছেলেটার ঠোঁটে। গলার আও য়াজটা খসখসে, কর্কশ শোনাল, 'বেশ ভাল লোক তো হে তুমি। সবার সাথেই এই রকম ভদ্দরতা কর? কাউকেই অপেক্ষা করিয়ে রাখতে জান না? আমি তো ভেবেছিলাম, রাত কাবার ন' করে ফিরবে না তুমি।'

পিস্তলটার কথা মনে পড়ল রানার। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে কোথাও রয়ে গেছে ওটা ধীরে ধীরে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠছে ও, কিন্তু পকেটে পিস্তল থাকলে এতটা ঘামতে হত না তাকে। 'কে তুমি?' কঠিন সুরে জানতে চাইল ও। 'এখানে কি করছ?'

'ভয় পেয়ো না। ভীতু লোক মেরে আমি মজা পাই না,' তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল মূর্তিমান বিপদ। একটা হাত নেড়ে সামনের চেয়ারটা দেখাল, 'বস। তোমার সাথে কাজ আছে আমার।'

এতক্ষণে লক্ষ্য করল রানা, হাতে কালো দস্তানা পরে রয়েছে ছেলেটা। শিরশিরে একটা অনুভূতি হল শিরদাঁড়ার কাছে। নিঃশব্দে একটা ঢোক গিলল ও। গলাটাকে ভারি করে বলল, 'দু'-সেকেণ্ড সময় দেব তোমাকে, তার আগেই যদি ঘর থেকে বেরিয়ে না যাও, জানালা গলিয়ে ফেলে দেব নিচে।'

ঠোঁটের নিঃশব্দ ঠাণ্ডা হাসিটা একটুও কাঁপল না. এক পায়ের ওপর থেকে অপর পা নামাল শুধু ছেলেটা, মেঝেতে পড়ে গেল খবরের কাগজ, দেখা গেল উরুর ওপর শুয়ে রয়েছে চকচকে কালো একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ। পিস্তলটার সাথে ফিট করা রয়েছে বার ইঞ্চি লম্বা একটা সাইলেন্সার। 'আবার সাবধান করে দিচ্ছি, ভয় পেয়ো না।' হাসিটা একটু চওড়া হল। 'আমি জানি, তোমার কাছে পাইপ নেই। পাইপ মানে পিস্তল, বোঝো তো?'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর অত্যন্ত সতর্ক-তার সাথে কয়েক পা এগিয়ে চেয়ারটায় বসল রানা। ওদের মাঝখানে ছয় ফিট কার্পেট। এই সামান্য দূরত্ব থেকে ছেলেটার গায়ের ঘাম, কাপড়ের ময়লা এবং নিঃশ্বাসে সস্তা তামাকের গন্ধ পেল রানা। 'কি চাও তুমি?'

'কি চাই?' সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। 'তোমার কলজেটা ফুটো করতে চাই। নিশ্চয়ই বাঁচার খুব একটা শখ নেই তোমার?'

'বরং বলতে পার, মরার কোনই ইচ্ছে নেই আমার,' কিছু একটা বলা দরকার, তাই বলল রানা।

হঠাৎ সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা রানার দিকে তাক করল ছেলেটা। 'প্রিয় কোন বান্ধবী আছে তোমার?'

'অনেক—কেন?'

'এমনি জানতে চাইছিলাম। তুমি মারা গেলে তারা কি দুঃখ পাবে?'

'দু'একজন পেতে পারে।' দূরত্বটা একলাফে পেরোন কোন সমস্যাই নয়, ভাবল রানা, কিন্তু, পিস্তলটা নাগালের মধ্যে পাবার আগেই গুলি করবে ও—ফুটো হয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড। 'এসব আবোল তাবোল কথা থাক। আসল ব্যাপারটা কি বল তো? আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে তোমার? কি করেছি আমি?'

'কিছু করনি, কিন্তু আমার হাতে খুন হবার জন্যে কাউকে কিছু করতেই হবে এমনও কোন কথা নেই।' রক্তহীন মোটা ঠোঁট জোড়ার একটা কোণ অদ্ভুত ভাবে বেঁকে গেল ছেলেটার। হাসিটা দেখে গা শির শির করে উঠল রানার।

'কিন্তু ব্যাপারটা কি আমাকে বলবে তো?' চেয়ারে একটু নড়ে-

চড়ে বসল রানা, ডান পা তুলে বাঁ পায়ের চেয়ে একটু সামনে বাড়িয়ে রাখল, যাতে সুযোগ পেলেই লাফ দিতে পারে।

'ব্যাপার? ব্যাপার কি জানি না। তাতে আমার কিছু এসেও যায় না,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সে। 'জানার মধ্যে শুধু এইটুকু জানি, এবং সেইটাই আসল কথা, কিছু টাকা রোজগার করতে যাচ্ছি আমি।'

'তার মানে, আমাকে গুলি করার জন্যে কেউ তোমাকে টাকা দিচ্ছে? তাই কি?'

মাথাটা একদিকে কাত করল সে: 'নিশ্চয়। তা না হলে শুধু শুধু তোমাকে আমি গুলি করতে যাব কেন? গুলির দাম নেই?'

'সব খুলে বল আমাকে,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আমাকে খুন করার জন্যে কে তোমাকে টাকা দিতে চেয়েছে?'

'জানি না,' হাসিটা তার ঠোঁটে লেগেই আছে। 'টাকার ধান্ধায় ঘুর ঘুর করছিলাম, এই সময় এক ব্যাটা ভদ্দরলোক এসে বলে কিনা, ওহে, হাজার পাঁচেক টাকা নেবে? পকেট থেকে বেরিয়ে এল আমার হাত, পেতে দিলাম, বললাম, দাও। ব্যাটা ভদ্দরলোক পকেট থেকে হাত বের করে পাঁচখানা পাঁচশো টাকার পাত্তি বের করে গুঁজে দিল আমার হাতে, বলল, বাকিটা কাজ শেষ হলে পাবে। কাজ?—জানতে চাইলাম। তোমার ঠিকানা দিল, বলল, খতম করে ফিরে এসে সাথে সাথে পেয়ে যাবে টাকা। এখন বুঝতে পারছ, বাওয়া, কেন আমাকে দেখতে পাচ্ছ এখানে?'

'লোকটা কে?'

'জানি না।' আবার একটু প্রসারিত হল হাসিটা। 'কোন্ জায়গাটায়, বাওয়া? কোন্খানটায় খেতে চাও গুলি? বুক? নাকি খুলিতে? কেউ কেউ আবার কপালের পাশে গুলি করে আত্মহত্যা করে।

তোমার নিজের কোন পছন্দ আছে ?'

রানা যেন তার কথা শুনতেই পায়নি, জানতে চাইল, 'কেমন দেখতে লোকটা ?'

'রেডি···'রানার মাথার দিকে পিস্তল তাক করল সে। 'ওয়ান ···টু···'

হঠাৎ হেসে উঠল রানা। 'তোমার হাত কাঁপছে কেন ?'

'কি !' যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ছেলেটা। 'কি বললে ?' মুহূর্তের জন্যে নিজের হাতের দিকে তাকাল সে। 'অসম্ভব ! কক্ষণো না।'

'লোকটা দেখতে কেমন ?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা। স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটার চোখে তাকিয়ে আছে ও।

হো হো করে হেসে উঠল ছেলেটা। 'বুঝেছি।' হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে বলল, 'একটু সময় পেতে চাইছ—হাত কাঁপছে না সে তুমি ভালই জান। কিন্তু লোকটা কে, দেখতে কেমন এসব জেনে লাভ কি তোমার ? কতক্ষণই বা বেঁচে আছ তুমি ?'

'কিন্তু কার হুকুমে আমি খুন হলাম তা না জেনেই মরে যাব ? বুঝতে পারছি, আমাকে তুমি ছেড়ে দেবে না, কিন্তু মারার আগে একটা অনুরোধ অন্তত রাখ। কে সে ?'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। 'আর কোন কথা নয়। আল্লার নাম নাও···রেডি···ওয়ান···'

'পাঁচ হাজার আবার একটা টাকা হল ?' দ্রুত বলল রানা। 'আমি তোমাকে বিশ হাজার নগদ দিচ্ছি, পিস্তলটা সরাও।' পিস্তলে এঁটে বসা ছেলেটার আঙুলের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'কথা দিয়ে সেটা রাখি আমি, বরখেলাপ করি না।' এই প্রথম

ছেলেটাকে রাগতে দেখল রানা। 'এক বার জবান দিলে প্রাণ দিয়ে হলেও সেটা রক্ষা করি।'

এই সময় ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাতে শুরু করেছে ছেলেটা, লাফ দিল রানা, হাত দুটো বাড়িয়ে দিল পিস্তল লক্ষ্য করে।

ঠিক একটা রকেটের মতো আঘাত করল রানা। ছেলেটার মুখ আর নাক ওর মাথার প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে সাংঘাতিক থেঁতলে গেল। একই সাথে হাত দুটো পৌঁছে গেল পিস্তলের গায়ে, ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল একপাশে, এই সময় গুলিও হল, ফট করে বাতাস ভরা একটা ঠোঙা ফাটল যেন। চেয়ার নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ওরা দু'-জনেই। কিন্তু ছেলেটা যে কঠিন পাত্র, বুঝে নিল রানা। তার হাত থেকে পিস্তলটা খসাতে পারেনি ও। আকস্মিক আক্রমণে একটু বোকা হয়ে গেছে সে, তা না হলে মেঝেতে পড়ে থাকা অবস্থাতেও রানাকে কাবু করতে পারত। ছেলেটা মানসিক আঘাত কাটিয়ে ওঠার আগেই এক গড়ান দিয়ে একটু সরে এল রানা, তার মোটা ঘাড়ের একপাশে গোটা দুয়েক ভারি ঘুসি ঝাড়ল। এবার একটু ঠাণ্ডা হল ছোকরা, পিস্তল ধরা হাতের আঙুলগুলোয় ঢিল পড়ল। তিন সেকেণ্ড ধস্তাধস্তি করে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ওটা রানা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পাল্টা আঘাত খেল ও। ঘুসিটা এত দ্রুত গতিতে এল, ভাল করে দেখতেই পেল না ও। চোখের পাশে হাতুড়ির প্রচণ্ড একটা বাড়ি অনুভব করল। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

এক সেকেণ্ড পর চোখের সামনে আগুনের ফুলকি ছুটোছুটি করতে দেখল রানা। উপলব্ধি করল, পিস্তলটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। নিজেকে মেঝেতে আবিষ্কার করল ও, ক্রল করছে। ঝাপসা ভাবটা

কেটে গিয়ে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দেখল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে ছেলেটা, সারা মুখ যেন দগদগে ক্ষত আর তাজা লাল রক্তে তৈরি একটা বীভৎস মুখোশ। রানার মুখ লক্ষ্য করে লাথি ঝাড়ল সে, কিন্তু তাতে তেমন জোর নেই। ঘাড়ের পাশে ঘুসিগুলো কাজে লেগেছে, বুঝতে পারল রানা। হাত তুলে লাথি-টাকে ঠেকাল ও। গড়িয়ে সরে এল নিরাপদ দূরত্বে, তারপর ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পরস্পরের দিকে মুখ করে আছে ওরা। ওদের মাঝখানে পড়ে রয়েছে পিস্তলটা।

আহত হিংস্র পশুর মতো লাগল ছেলেটাকে রানা মুখ ভেঙাচ্ছে ওর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পশুটা যে বুদ্ধিমান, তারও প্রমাণ পাওয়া গেল ঝুঁকে পড়ে পিস্তলটা দখল করার কোন চেষ্টা করল না সে। জানে, তা করতে গেলেই রানা ওর মুখের চেহারা নষ্ট করে দেবে চিরতরে।

হঠাৎ রানাকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল ছোকরা। ধাক্কাটা খাওয়ার আগে সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুসি মারল রানা বুকে, পরমুহূর্তে দু'জনই ছিটকে গিয়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে। দুই হাতে সমানে ঘুসি চালিয়ে ছোকরার থেঁতলান মুখটা আরো ক্ষতবিক্ষত করে তুলল রানা। গোটা দুয়েক মারল তলপেট বরাবর। পিছিয়ে গেল ছোকরা। তলপেটে খাওয়া ঘুসিগুলো নরম করে এনেছে তাকে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে এখন। বুঝতে পেরেছে, অত সহজ হবে না রানাকে কাবু করা। লাফ দিয়ে আবার ওর ওপর পড়তে গিয়েও ছিটকে সরে গেল রানা, ছোকরার হাতে চকচকে ছুরিটা দেখতে পেয়েছে সে।

হাপরের মত হাঁপাচ্ছে দুজন। এটাই শেষ সুযোগ বুঝতে পেরে

তার সমস্ত শক্তি একত্রিত করার চেষ্টা করছে ছোকরা।

মুখ দেখে তাকে আর চেনার যো নেই, ক্ষতগুলো জোড়া লাগাতে গোটা দশেক সেলাই তো লাগবেই। কিন্তু তবু সে দমেনি। এখনও সে ভয়ংকর। তার চোখে খুনের নেশা আর হাতে ধারাল ছুরি দেখে আবার একটা ঢোক গিলল রানা। এত ভয়ংকর লোক সে জীবনে দেখেনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত, দুর্বার, দুর্দম।

পিছিয়ে আসতে শুরু করল ও।

বীভৎস মুখটা ভেংচানর ভঙ্গিতে বিকৃত করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে. ধীরে ধীরে সামনে বাড়তে শুরু করল ছোকরা।

রানার একটা কাঁধ পিছনের দেয়াল স্পর্শ করল। দ্রুত, একটা ঝটকায়, গায়ের কোট খুলে ফেলে বাঁ হাতের চারদিকে সেটা জড়িয়ে নিল ও। ফণা তোলা সাপের ছোবল মারার গতিতে ওর দিকে ছুটে এল ছুরি। আঘাতটা বাঁ হাতের প্যাডে নিল রানা, সেই সাথে ডান হাতে কায়দামত একটা ঘুসি ঝাড়ল তার চোয়ালে। কড়াৎ শব্দে ঘাড়ের সব কটা হাড় ফুটল ঘুসিটার প্রচণ্ড আঘাতে। টলমল করে উঠল ছোকরা, পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করেও পারল না, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর। ছুরিটা আগেই খসে গেছে হাত থেকে। জুতোর ডগা দিয়ে টোকা দিল রানা, ঘরের শেষ প্রান্তে চলে গেল সেটা

পিছিয়ে এসে দেয়ালের গায়ে হেলান দিল রানা, হাঁপাচ্ছে, দ্রুত উঁচু-নিচু হচ্ছে চওড়া বুক। অসহায় শিশুর মত দুর্বল লাগছে নিজেকে ওর। মনে হল, শরীরে আর কোন শক্তি নেই।

আচমকা দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা, ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢুকল দুজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর। দু'জনের হাতেই পিস্তল।

ঠিক এই সময় মেঝেতে একটা গড়ান দিল ছোকরা। হাঁটু ভেঙে নিজের পিস্তলের ওপর পড়ে গিয়েছিল সে। পিস্তলটা চলে এসেছে এখন তার হাতে। সব শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার শেষ চেষ্টা করল সে। পিস্তল ধরা হাতটা তুলেই অন্ধের মত রানার দিকে গুলি করল সে। ঠিক কানের পাশে দেয়ালে এসে লাগল গুলি।

পুলিশদের একজন গুলি করল। চিৎকার করে বারণ করল রানা, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ছেলেটা আবার ওকে লক্ষ্য করে গুলি করতে যাচ্ছে, এমনি সময় মারা গেল সে।

'ওকে ফলো করে এসেছিলাম আমরা। তিনটে মার্ডার কেসের পলাতক আসামী,' এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল একজন সাব-ইন্সপেক্টর। 'আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখে ভেবেছিলাম আপনারা বোধহয় বন্ধু। কিন্তু ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুনে...'

ছয়

সামনের বোর্ডে 'নো স্মোকিং' সাইনটা জ্বলে উঠল। একটু ঝুঁকে জানালা পথে বাইরে তাকাল রানার পাশের সীটের আরোহী। বিশালদেহী না হলেও, লোকটা বেশ মোটাসোটা, মাথায় তেল চকচকে টাক, বড় সাইজের ঘামের ফোঁটা বিজ বিজ করছে সেখানে। গা দুলিয়ে অদ্ভুত এক স্থূল ভঙ্গিতে হাসল সে, বলল, 'কি মজা! এই তো আমরা পৌঁছে গেলাম হঙকঙ!' কিন্তু রানা উঁকি ঝুঁকি দিয়েও

জানালা পথে বাইরে তাকাবার কোন সুযোগ পেল না, লোকটার মোটা ঘাড় ওর দৃষ্টি পথকে আড়াল করে রেখেছে।

নিজের বেল্ট বেঁধে নিল রানা। দেখাদেখি লোকটাও দ্রুত হাতে সারল কাজটা। এই সুযোগে তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। জানালার বাইরে নীল সাগর আর সবুজ সবুজ পাহাড়ের মাথা, চিক চিক করছে সূর্যের আলো লেগে। সাগরে কিছু পাল তোলা সাম্পানও ভাসছে।

পাশের আরোহী ব্যাংকক থেকে প্লেনে উঠেছে। প্লেন রানওয়েতে থামতেই নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'নিশ্চয়ই পেনিনসুলা হোটেলে উঠছেন আপনি?'

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

'কেন? কাউলুন অত্যন্ত চমৎকার জায়গা—সেরা হোটেল, সেরা মার্কেটিং সেন্টার, আড়ম্বর-জৌলুস সবই তো আছে। ও, আপনি বুঝি ব্যবসায়িক কাজে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

লোকটা একটু বেজার হল বোধহয়, আর কোন প্রশ্ন না করে দরজার দিকে এগোল। একটু সময় নিল রানা, প্লেন যখন একেবারে খালি হয়ে এসেছে, এই সময় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ও।

কাস্টমসের ঝামেলা মিটতে তেমন দেরি হল না। এয়ারপোর্টের ভিড়, ব্যস্ততা আর কোলাহলমুখর এলাকায় চলে এল ও। পাশের সীটের আরোহী লোকটাকে দেখা গেল এখানে, একটা হোটেলের মাইক্রোবাসে উঠছে। রানাকে দেখে একগাল হেসে হাত নাড়ল। দশ বার জন রিক্সাওয়ালা ছেঁকে ধরল রানাকে, সবাই একযোগে ডাকছে ওকে, চেহারায় এবং কণ্ঠে রাজ্যের অনুনয় বিনয়। কিভাবে

উদ্ধার পাওয়া যায় ভাবছে, এই সময় ওর সামনে এসে দাঁড়াল সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান সুবেশী একজন চীনা। লোকটা একটু বেঁটে, চেহারায় মার্জিত ভদ্রতার ছাপ। একটু ঝুঁকে চীনা রীতিতে অভিবাদন করল সে। 'কিছু যদি মনে না করেন, আমি বোধহয় আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনার ট্যাক্সি লাগবে?'

'ওয়ানচাই যাব,' বলল রানা। 'হোটেল কসমোপলিটানে।'

লোকটাকে বেশ একটু অবাক হতে দেখল রানা। 'ওয়ানচাই? ওটা তো দ্বীপের ওপর,' বলল সে। 'তার মানে ট্যাক্সি নিয়ে ফেরীঘাটে যেতে হবে আপনাকে। ওখান থেকে যে-কোন মাঝিকে বললেই সে আপনাকে নৌকো করে ওয়ানচাই পৌঁছে দেবে। দ্বীপের ফেরীঘাটের উল্টোদিকেই হোটেল কসমোপলিটান।'

'ধন্যবাদ। ড্রাইভাররা ইংরেজী বোঝে তো?'

'কাজ চালাবার মতো বোঝে,' ইঙ্গিতে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আসতে বলল লোকটা। প্রায় সাথে সাথে ওদের সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ড্রাইভারকে দেখিয়ে আবার বলল সে, 'উঠে পড়ুন, এ আপনাকে ফেরীঘাটে পৌঁছে দেবে। এক হঙকঙ ডলার ভাড়া।' হাসল লোকটা। প্রায় সবগুলো দাঁত সোনার। 'জানেন তো, ছয় হঙকঙ ডলারে এক মার্কিন ডলার?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ট্যাক্সির দিকে এগোল রানা। পিছন থেকে দ্রুত রানার পাশে চলে এল লোকটা। শান্ত বিনয়ের সাথে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি?' চোখে মুখে অপ্রতিভ একটা ভাব দেখা গেল। 'হোটেল কসমোপলিটানে বিদেশী কোন লোক সাধারণত ওঠেন না। হোটেল হিলটন, ইন্টারকন...'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি ঠিক করেছি কসমোপলি-

টানেই উঠব।'

'ও, আচ্ছা! আশা করি নাক গলালাম বলে কিছু মনে করেননি,' পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি একজন গাইড। বিদেশী ট্যুরিস্টদের সাহায্য করি। কার্ডে আমার ফোন নাম্বার আছে, যদি প্রয়োজন মনে করেন, ডায়াল করলেই চলে আসব আমি…'

কার্ডটা নিল রানা। রিস্টওয়াচের চেইনের তলায় গুঁজে রাখল সেটা। 'ঠিক আছে।'

আবার ঝুঁকে অভিবাদন জানাল লোকটা, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, দ্রুত হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। একটা সিগারেট ধরিয়ে কি যেন চিন্তা করল রানা, তারপর উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে।

উপদ্বীপের নাম কাউলুন, এয়ারপোর্টের নাম কাই তাক, যেখানে নেমেছে ও। প্রণালীর ওপারে হঙকঙ দ্বীপ। ফেরী পার হতে সময় লাগে মিনিট পাঁচেক। ওয়ানচাইয়ে থাকত শফিক, সেটা সাগর তীরে হঙকঙের একটা ছোট শহর।

কাউলুনের সাগর তীরে পৌঁছে মানুষের ভিড় দেখে রানার মনে হল, পিঁপড়ের ঢিবিতে ঢিল মেরেছে কেউ। শয়ে শয়ে কুলি আড়াই তিন মনের বস্তা বয়ে নিয়ে চলেছে। সেই আগের মতই, যার যেখান দিয়ে খুশি রাস্তা পেরোচ্ছে, ট্রাফিক সিগন্যাল মানার বালাই নেই। কোন কারণ নেই, তবু গলা চড়িয়ে হৈ-চৈ করছে সবাই। মেলাতেও এক সাথে এত লোক দেখেনি রানা। রাস্তায় মার্কিন মুলুকের তৈরি গাড়ির সংখ্যাই বেশি, পেটমোটা চীনারা বসে আছে ব্যাক সীটে— এরা বোধহয় ব্যবসায়ী। রাস্তার ধারে পাঁচ-সাত টনী ট্রাকগুলো সার সার দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাথের দু'ধারে পাশাপাশি অগুণতি

দোকান-পাট, সেগুলোর সামনে ভিড়ও প্রচণ্ড। প্রতিটি দোকানের সামনে এবং মাথায় রঙচঙে চীনা হরফের সাইনবোর্ড। এই অতি ব্যস্ত ফুটপাথের ওপর পিঠে দুগ্ধপোষ্য শিশু বেঁধে নিয়ে খেলা করছে কিছু চীনা কিশোরী। তাদের পোশাক এবং হাত-পা অত্যন্ত নোংরা। রেস্তোরাঁর ভেতর এত ভিড় যে ভেতরে ঢুকতে না পেরে বাইরে দাঁড়িয়েই চীনা নারী-পুরুষ দ্রুত হাত চালিয়ে কাঠি দিয়ে খাবার খাচ্ছে। ফুটপাথে ইউরোপীয় লোকজনও দেখা গেল, তবে সংখ্যায় তারা খুব কম। ওদের চেয়ে বরং ভারতীয় শিখরা সংখ্যায় বেশি। দু'জন বাঙালীকেও দেখল রানা, হাত ধরাধরি করে গানের সুর ভাঁজছে, মেয়েদের নিতম্বের দিকে চোখ।

ফেরীতে উঠে কয়েকটা সুন্দরী চীনা যুবতীকে দেখল রানা। এদের পোশাক-আশাকও বেশ দামী। প্রায় সবারই হাঁটুর ওপর উঠে আছে স্কার্ট। হলুদ মাখনের মতো উরুর বেশ অনেকটা করে দেখা যাচ্ছে। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রানা, প্রতিটি চীনা যুবতীর সাথে একজন করে ট্যুরিস্ট আছে। সেই একই নিয়মে চলছে দুনিয়াটা।

সিগারেট ধরিয়ে ফেরীর এক কোণের একটা সীটে বসল রানা। নিকট অতীতে ফিরে গেল ও।

নির্দিষ্ট তারিখের ক'দিন পর ঢাকা ছাড়তে হয়েছে ওকে। সেই ছোকরা অতিথিই এর জন্যে দায়ী। কিন্তু ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদকে সব কথা জানায়নি ও ওর ঘরে কেন এসেছিল ছেলেটা এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছে, আমি জানি না। কথাটা বিশ্বাস করেনি ইন্সপেক্টর, কিন্তু ডিউক মিথ্যে কথা বলছে এই অজুহাতে শেষ পর্যন্ত ওর হাতকড়া আসা ঠেকাতে পারেনি সে।

সেই রহস্যময় আতিকুল্লাহ খানই যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিল, সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। বুড়ো মীর সাহেব বড় উপকার করেছেন বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে ওর জন্যে স্মল আর্মসের একটা বিশেষ লাইসেন্স যোগাড় করে দিয়ে। নিজের টাকায় একটা পুলিশ স্পেশালও কিনে দিয়েছেন তিনি ওকে। আগেই অনুমতি নেয়া ছিল, কাস্টমস কোন ঝামেলা করেনি।

ফেরী থেকে নেমে আরো কয়েকজন ভারতীয় এবং বাংলাদেশী বাঙালী চোখে পড়ল। কিন্তু চারদিকে হাজার হাজার চীনা গিজ গিজ করছে। এত ভিড়, ধাক্কা না দিয়ে পথ চলা অসম্ভব। ওয়ানচাইয়েও সেই এক দৃশ্য। কুলিরা বিরাট বিরাট মোট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক খারে বিভিন্ন তরকারীর উঁচু পাহাড়, বিক্রেতারা সবাই মিলে চেঁচা-মেচি করছে। তবে সবচেয়ে বিরক্তিকর রিক্সাওয়ালারা। বিদেশী লোক দেখলেই হয়, ছুটে এসে ছেঁকে ধরে।

ফেরীঘাটের উল্টোদিকে কয়েকটা দোকান, দুটো দোকানের মাঝখানে হোটেল কসমোপলিটানে ঢোকার দরজা। রিক্সাওয়ালাদের ভিড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাস্তা পেরোল রানা। সরু একটা প্যাসেজ পেরিয়ে, সিঁড়ির কটা ধাপ টপকে ঢুকে পড়ল হোটেলের লবিতে। রিসেপশন কাউন্টারে বুড়ো এক চীনা বসে বসে ঝিমুচ্ছে। মাথায় পরিচ্ছন্ন সুতী কাপড়ের তৈরি টুপি, গায়ের শার্টটা বোধহয় গত বছরের পর আর সাবান পানির স্পর্শ পায়নি। তার ওপর কাল কোট চাপিয়েছে, অনেক জায়গায় সুতো উঠে গেছে সেটার। শুধু থুতনিতে কিছু দাড়ি আছে, কিন্তু সেগুলো অস্বাভাবিক লম্বা। বাদামী রঙের চোখ দুটো ঢুকে আছে কোটরে, দৃষ্টিতে কোন প্রাণ নেই।

হাতের ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। ইংরেজীতে

বলল, 'একটা রুম চাই।'

প্লেন থেকে নেমে পোশাক বদল করার সুযোগ হয়নি রানার, চেহারাটাও তেমন পরিচ্ছন্ন নয়, আর যাই হোক ওকে অন্তত ধনী একজন ট্যুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে না। রানা অবশ্য সেটা চাইছেও না। বুড়ো চীনা খুঁটিয়ে দেখল ওকে, কিন্তু তার মুখের চেহারায় কোন বিস্ময় ফুটে উঠল না। রানার সামনে নিঃশব্দে ময়লা একটা খাতা খুলে ধরল সে। নাম, কোত্থেকে এসেছে ইত্যাদি লিখে দিল রানা। বোর্ড থেকে একটা চাবি নামিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল বুড়ো। যান্ত্রিক পুতুলের মতো হাত পাতল একটা। 'দশ ডলার। কামরা নম্বর সাতাশ।'

দশ ডলার দিয়ে চাবি তুলে নিল রানা। বুড়োর দেখান পথ ধরে একটা সরু প্যাসেজে চলে এল ও। একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন শ্বেতাঙ্গ, পিছনে একটা চীনা কিশোরী। রানাকে দেখে মুখ ভেঙচাল লোকটা, কিন্তু উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মেয়েটার মুখ। প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছুবার আগে তিন বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সে রানাকে। প্রতিবার মুচকি একটু হাসল। হোটেলটা কি জাতের বুঝতে অসুবিধে হল না রানার।

সাতাশ নম্বর ঘরের দরজা খুলে ভেতর ঢুকল ও। চারকোণা একটা ঘর, দশ ফুট বাই দশ ফুট। বিছানা দুটো। কিন্তু একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। দেয়াল আলমিরাও আছে এক কোণে ছোট একটা বেসিন। পাশেই জানালা। জানালার বাইরে পাশের বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে, বোধহয় কোন ধোপার বাড়ি ওটা। ছাদে লম্বা করে দড়ি টাঙান, তাতে ব্রেসিয়ার থেকে শুরু করে আণ্ডারপ্যান্ট পর্যন্ত সব শুকাতে দেয়া হয়েছে। টেবিলের ওপর ব্যাগ রেখে বিছানার ওপর বসল রানা। মনটা খিঁচড়ে উঠতে

চাইছে। এই রকম নোংরা সস্তা হোটেলে নোয়েভ না ঠেকলে উঠতে চায় না ও, অথচ কর্তব্যের খাতিরে এ ছাড়া কোন উপায়ও নেই। এই হোটেলেই শফিক তার চীনা স্ত্রী সুজি কোয়াওকে নিয়ে ছিল।

খানিক বিশ্রাম করে হাত-মুখ ধুয়ে নিল রানা। ব্যাগ খুলে নতুন পোশাক বের করে পরল। খুব বোধহয় ভিড় হয় না হোটেলটায়, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা মৃদু ট্রাফিকের আওয়াজ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই। রিস্টওয়াচ দেখল ও। পৌনে ছটা। রিস্টওয়াচের চেইনের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে সেই বেঁটে সুদর্শন চীনা গাইডের ভিজিটিং কার্ডের কোণ। কার্ডটা বের করল ও, পড়ল। লোকটার নাম ওয়াম পিং হা। নামের নিচে ফোন নম্বর মানিব্যাগের ভেতর কার্ডটা রেখে দিল ও। তারপর বেরিয়ে এল প্যাসেজে।

ঠিক পাশের কামরার দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। চোখ পড়তেই বুঝল রানা, ভারি সুন্দর শরীরের গড়ন। মাথায় একরাশ কাল চুল, বিনুনি করে ফেলে রেখেছে কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর, ডগাটা নাভির নিচে দোল খাচ্ছে। আপন মনে গুন গুন করছিল মেয়েটা, সেই সাথে মেঝেতে পা ঠুকছিল, রানাকে দেখেই ফিক করে হাসল। সারা শরীরে যৌবনের প্রাচুর্য, পরনের খাটো ব্লাউজ আর ছোট নীল স্কার্ট তা ধরে রাখতে পারেনি। কেন যেন মনে হল রানার, মেয়েটা তার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে এভাবে।

হাসির উত্তরে রানাও হাসল একটু।

'হেই, মিস্টার!' হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। কিন্তু হাসিটায় স্থূল বা কদর্য কিছু নেই, বরং অদ্ভুত এক সারল্যই ফুটে উঠল

তার চেহারায়। 'আমি ওমপণ্ড পিয়া। তুমি ?'

'ডিউক বলে ডাকে সবাই,' দরজায় চাবি লাগিয়ে বলল রানা। 'এখানেই থাক বুঝি ?'

চোরা চোখে দ্রুত আরেকবার রানার বলিষ্ঠ শরীরের গঠনটা দেখে নিল ওমপণ্ড পিয়া। 'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি এখানে কেন ? বিদেশী কেউ তো বড় একটা ওঠে না এখানে।'

'কতদিন ধরে আছ তুমি ?'

আঙ্গুলের গিট গুণতে শুরু করল মেয়েটা। তারপর বলল, 'আঠারো মাস। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?'

'এমনি।' সিগারেট ধরাল রানা। 'তুমি একাই···

রানার কথা শেষ হবার আগেই বড় করে মাথা কাত করল ওমপণ্ড পিয়া। 'হ্যাঁ যখন ইচ্ছে ডাকতে পার আমাকে, বিদেশীদের সঙ্গ আমার খুব ভাল লাগে।'

একটু হকচকিয়ে গেল রানা। মেয়েটার চেহারা, পোশাক, শুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ ইত্যাদি দেখে ক্ষুণাক্ষরেও সন্দেহ হয়নি ওর যে একটা কলগার্লের সাথে কথা বলছে ও। ওর মনের কথা মেয়েটাও যেন বুঝতে পারল। ম্লান একটু হাসল সে। কিন্তু কিছুই আর বলল না।

'ঠিক আছে, মনে থাকবে···'প্যাসেজ ধরে এগোল রানা।

'বাইরে যাচ্ছ বুঝি ?' পিছু নিল মেয়েটা। 'দু'জনে একসাথে বেরুলে হত না ? আমার ঘরে একটু বসে, তারপর ?'

'না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'এখন নয়।'

'তবে রাতে ?'

মেয়েটাকে ভদ্র ভেবেছিল বলে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করল রানার। থামল না ও। বলল, 'দেখা যাবে।'

পিছন থেকে রানার হাত টেনে ধরল ওমপঙ পিয়া। 'দাঁড়াও। দেখা যাবে কথার মানেটা কি? হয় বল আসব, না হয় বল আসব না। ঝুলিয়ে রাখতে চাও কেন?'

'আসব না' বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হন হন করে প্যাসেজ ধরে লবিতে চলে এল রানা। বুড়ো রিসেপশনিস্ট চোখ বুঁজে ঝিমাচ্ছে। সিঁড়ির ধাপ ক'টা বেয়ে নিচে নেমে এল ও, সেখান থেকে প্যাসেজ ধরে রাস্তায়। রিক্সাওয়ালারা ছেঁকে ধরার আগেই লাফ দিয়ে সামনেরটায় উঠে বসল ও, বলল, 'পুলিশ হেডকোয়ার্টার।'

তিন মিনিট পর বিরাট একটা ফটকের ভেতর ঢুকল রিক্সা। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে একজন সেন্ট্রির সাহায্য নিল রানা। সে ওকে একজন সার্জেন্টের কাছে নিয়ে গেল। সার্জেন্ট লোকটা ব্রিটিশ, কাজেই কি কাজে এসেছে বুঝিয়ে বলতে কোন অসুবিধে হল না রানার। সার্জেন্ট ওকে একটা ছোট কিন্তু সুন্দর ভাবে সাজান কামরায় নিয়ে এল। চীফ ইন্সপেক্টর স্কটল্যাণ্ডের লোক, বয়সে বুড়ো হলেও শরীরটা এখনও মজবুত আছে। চুল, দাড়ি, চওড়া মিলিটারী গোঁফ সব ধবধবে সাদা। চেহারায় কোন ভাবের প্রকাশ ঘটল না, কিন্তু একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল রানাকে। নিজের পরিচয় দিল রানা। হঙকঙে আসার উদ্দেশ্য কি তাও বলল। সব শুনে বেশ একটু আশ্চর্য হল চীফ অফিসার। নিজের পরিচয় দিল রানাকে। নাম, স্টুয়ার্ট জ্যাসন।

'মীর শফিকুর রহমান?' চেয়ারে হেলান দিয়ে টোবাকো পাইপটা তুলে নিল জ্যাসন। তাতে তামাক ভরতে ভরতে বলল, 'লোকটা আপনার কে হয় বলুন তো? দিন কয়েক আগে ঢাকা থেকে ওর সম্পর্কে খোঁজ-খবর চাওয়া হয়েছিল। সেটার উত্তর তো আমি নিজেই দিয়েছি।

তারপরও আপনি হঙকঙে ছুটে এলেন, ব্যাপারটা কি বলুন তো ?'

'আমি ওর বাবার প্রতিনিধিত্ব করছি,' বলল রানা। 'তিনি ছেলের মৃত্যু এবং আনুষঙ্গিক কিছু ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা পেতে চান। ছেলের বউটা খুন হওয়ায় তিনি খুব আঘাত পেয়েছেন, এবং তাঁর ধারণা, এই খুনের কিনারা করতে হলে হঙকঙে তদন্ত চালাতে হবে। দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে পারেন ?'

'ভিজে রাস্তা. আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল,' কাঁধ ঝাঁকাল চীফ ইন্সপেক্টর। 'আমরা যখন দেখতে পেলাম, আর কিছু করার ছিল না লাশটা গেঁথে গিয়েছিল গাড়ির ভেতর। আগুনও ধরে গিয়েছিল গাড়িতে।'

'আর কেউ ছিল না গাড়িতে ?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল জ্যাসন। 'বোধহয় ছিল না, তবে জোর করে কিছু বলা মুশকিল। কাউলুন থেকে পাঁচ মাইল দূরে, নিউ টেরিটোরিতে দুর্ঘটনাটা ঘটে—তার মানে, ঠিক কোথায় যাচ্ছিল বলা কঠিন, ওই রাস্তা দিয়ে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়।'

'লাশ সনাক্ত করেছিল কে ?'

চোখ নামিয়ে খোলা একটা ফাইলের দিকে তাকাল জ্যাসন। কাজের লোক সে, সেটাই বোধহয় চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে চাইল রানাকে। 'ওর ওয়াইফ।'

'শফিক এখানে কি করত বলতে পারেন ?'

'স্থানীয় লোকদের নিয়েই হিমশিম খেয়ে যাই আমরা, বিদেশী-দের ওপর নজর রাখার সময় কোথায় ? চাকরি-বাকরি করতে যারা আসে তাদের মধ্যে কেউ যদি খুব বেশি বাড়াবাড়ি না করে, আমরা তার ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবর রাখি না।'

'ওর স্ত্রী সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেন?'

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে রানার দিকে তাকাল জ্যাসন। 'কল-গার্ল ছিল। রিফিউজি সব মেয়েই তো এই পথে নেমে পড়ে। ওদের সম্পর্কেও আমরা বড় একটা খোঁজ-খবর রাখি না।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'বেশ আরামে আছেন আপনারা। কোন ব্যাপারেই দেখছি কোন খবর রাখতে হয় না।'

'আহা, আপনি রাগ করছেন কেন!' রানা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল চীফ ইন্সপেক্টর। 'শুনুন, মিঃ ডিউক, প্লীজ!' কিন্তু রানা পিছন ফিরে তাকাল না একবারও।

বাইরে বেরিয়ে এসে কুইনস রোডে প্রচণ্ড ভিড় দেখল রানা। নিরিবিলি কোথাও বসা দরকার, কিভাবে কাজ শুরু করবে ভেবে-চিন্তে পথ বের করতে হবে একটা। একবার মনে হল, কাজীর অফিসে গেলে হয়ত কিছু জানা যাবে। কিন্তু এই সন্ধ্যায় কি আর সেটা খোলা আছে। ওয়ানচাইয়ের সাগর-সৈকতটা বিশাল, গোটা এলাকা জুড়ে রঙচঙে নিওন সাইন আর হাজার হাজার দোকান-পাট। এক ধারে কয়েকটা বার অ্যাণ্ড রেস্তোরাঁ দেখে গলাটা শুকনো শুকনো লাগল রানার। বাইরে থেকে প্রায় ফাঁকা দেখে ঢুকে পড়ল একটার ভিতর। ক্যাসেটে মৃদু মিউজিক বাজছে। এক কোণের একটা টেবিল দখল করে বসল ও। কামরার আরেক প্রান্তে চার জন মার্কিন খালাসী, দু'জন শিখ আর ছয় সাত জন চীনা হাসাহাসি করছে। রানার টেবিলের কাছা-কাছি বসেছে দু'জন মাঝবয়েসী চীনা। নিচু গলায় সম্ভবত ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ করছে তারা। কামরার একেবারে পিছন দিকে ছোট একটা জটলা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা চীনা মেয়ে, নাকি সুরে কথা বলছে সবাই, কেউ কেউ বিনা নোটিসে

তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠছে। ওয়েটারকে ডেকে স্কচ আর কোক দিতে বলল রানা। প্রায় সাথে সাথে টেবিল সাজিয়ে দিয়ে গেল লোকটা। সে চলে যেতেই আরেকজন টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে তাকাল রানা, দেখল, মাঝ-বয়েসী এক চীনা মহিলা। এক কালে খুব সুন্দরী ছিল, হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পরনে সবুজ রঙের স্কার্ট। চেহারায় বুদ্ধিমত্তা এবং আভিজাত্যের ছাপ।

'গুড ইভনিং,' মুক্তোর মত সাদা দাঁত দেখা গেল মহিলার।

কিছু একটা বলা দরকার, তাই বলল রানা, 'গুড ইভনিং। আপনি···?'

'বসতে পারি?' রানার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে অনুমতি চাইল মহিলা, কিন্তু রানার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

একটু কৌতুক বোধ করল রানা। 'বলুন আপনার জন্যে কি আনাব?' ইঙ্গিতে ওয়েটারকে ডাকল ও। কিন্তু ওয়েটার একটা হাত তুলে ক্ষান্ত হবার পাল্টা ইঙ্গিত করল ওকে। মহিলার জন্যে কি আনতে হবে তা সম্ভবত জানা আছে তার। রানার অনুমানটাই ঠিক। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এক গ্লাস দুধ দিয়ে গেল ওয়েটার।

'শুধু দুধ? আর কিছু?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল মহিলা। 'আমি দুধ ছাড়া আর কিছু খাই না। আপনি কি হিলটনে উঠেছেন?'

'না,' এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর আর কি দেবে ভেবে পেল না রানা।

'আমাকে ম্যাডাম বলে ডাকলেই চলবে,' দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল মহিলা। 'আমি ট্যুরিস্টদের, বিশেষ করে এশীয় ট্যুরিস্টদের উপকারী বন্ধু। ওদের বান্ধবী দরকার হলে, বা স্রেফ সঙ্গ

পাবার জন্যে কোন মেয়েকে দরকার হলে আমাকে ধরে, আমিও ওদেরকে সানন্দে সাহায্য করি। আপনার যদি তেমন কিছু দরকার হয়, আমাকে বলবেন, সব ব্যবস্থা করে দেব আমি। এদিকে সব মেয়ে আমার কথা শোনে

স্কচের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে।' পরমুহূর্তে অন্য খাতে বইতে শুরু করল রানার চিন্তা। হোটেল কসমোপলিটান এখান থেকে মাত্র কয়েক শো গজ দূরে। এই মেয়েলোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে এই এলাকার কলগার্লদের নিয়ন্ত্রণ করে সে। সুজি কোয়াওকে যদি চেনে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই তাতে। 'আচ্ছা,' জানতে চাইল রানা, 'একটা মেয়ের খোঁজ দিতে পার? আমার বন্ধু দেশে ফিরে খুব নাম করেছিল মেয়েটার। বলেছিল, যদি কখন হংকঙ যাও, তো এই মেয়েটার সন্ধান করো—তার সান্নিধ্য নাকি ভুলবার নয়। মেয়েটার নাম সুজি কোয়াও। চেন নাকি?'

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল বলেই ম্যাডামের মুখে বিস্ময়ের ক্ষীণ ছাপটা দেখতে পেল রানা। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ম্যাডাম। মুখ টিপে সুন্দর করে হাসল। 'চিনব না মানে? আমার হাতে যত মেয়ে আছে তাদের মধ্যে সুজি কোয়াওই তো সবচেয়ে সুন্দরী। হ্যাঁ, তার সঙ্গ নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে। টেলিফোন করে ডাকব নাকি?'

চেহারা থেকে বিস্ময়ের ভাবটা এবার গোপন করার পালা রানার। খুব যেন খুশি হয়েছে এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে বলল ও, 'ডাক।'

হুধের গ্লাসে শেষচুমুক দিয়ে ম্যাডাম বলল, 'যাকে বলে বাজারের মেয়ে, সুজি কোয়াও কিন্তু ঠিক তা নয়। মা-বাবার সাথে থাকে ও,

কসমেটিকস আর সিনেমা থিয়েটারের জন্যে কিছু পয়সা দরকার, তাই এ-পথে নেমেছে। তার মানে, আপনি ওর বাড়িতে যেতে পারবেন না। কোন হোটেলে নিয়ে যেতে হবে ওকে। হোটেলের ভাড়া যা হয় দেবেন, আর ওকে দিতে হবে তিরিশ ডলার। আর আমাকে মাত্র তিন ডলার দিলেই চলবে।'

'দেব,' বলল রানা। 'কিন্তু এই মেয়েটিই যে সুজি কোয়াও, বুঝব কিভাবে?'

'সে কি!' একাধারে আহত এবং বিস্মিত দেখাল ম্যাডামকে। 'আমি আপনার সাথে চিটিংবাজি করতে যাব কেন? মেয়েটা সুজি কোয়াও ছাড়া অন্য কেউ হতে যাবে কেন?'

'কিছু মনে কর না, আমি রসিকতা করছিলাম

টেবিল ছেড়ে উঠে গেল ম্যাডাম। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ফোন করল কোথাও। রানা দেখল, মার্কিন খালাসীরা ঘিরে ধরেছে ম্যাডামকে। একজন তার কাঁধে হাত রেখে মাথা দুলিয়ে গানও জুড়ে দিয়েছে। রানার দিকে ফিরে এক ফাঁকে একটা চোখ টিপল লোকটা যেন বলতে চায়, আমরা সবাই একই পথের পথিক উত্তরে মুচকি একটু হাসল রানাও। ফোন করা শেষ হল খালাসীদের সাথে কথা বলল ম্যাডাম। বোঝা গেল, ওদের সাথেও একটা ব্যবসা হল তার। আরেকটা ফোন করল সে। তারপর ফিরে এল রানার টেবিলে।

বলল, 'সুজিকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। এখুনি আসছে ও।' একটা সিগারেট ধরাল ম্যাডাম, আবার উঠে দাঁড়াল, বলল, 'সোজা আপনার টেবিলেই আসবে ও। আমাকে আর আপনার দরকার হবে না।' চলে গেল সে, মার্কিন খালাসীদের টেবিলে গিয়ে বসল।

ঠিক দশ মিনিট পর রেস্তোরাঁর ভেতর একটা চীনা মেয়ে ঢুকল। চীনা মেয়েরা সাধারণত বেঁটে হয়, কিন্তু এ মেয়েটা বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য-টাও চমৎকার। পরনে স্কার্ট আর ব্লাউজ, দুটোই কাল ডোরা কাটা। কোনে আগেই টেবিলের নাম্বার জেনে নিয়েছে, সোজা রানার দিকে এগিয়ে এল সে। মুখে মিষ্টি হাসি টেনে রানার সামনের চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়াল। 'হেই মিস্টার, আমি সুজি কোয়াও।' ইংরেজী উচ্চারণটা বেশ ভালই। 'তুমি?'

'ডিউক' বলল রানা। 'সুজি কোয়াও...তারপর?'

অপ্রতিভ দেখাল মেয়েটাকে। দ্রুত টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে খুলল সেটা, সিগারেট ধরাল, তারপর একমুখ ধোঁয়ার আড়ালে মুখ লুকিয়ে বলল, 'তারপর মানে?'

'সুজি কোয়াও ওয়াং চিনয়?'

'বাহ্.' চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল মেয়েটার। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

'আমার এক বন্ধু গত বছর এখানে এসেছিল.' মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে. কিন্তু এখুনি সেটা প্রমাণ করতে চাইছে না রানা। 'সে তোমার খুব প্রশংসা করেছে আমার কাছে।'

হাত ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা আয়না বের করে ঠোঁটের লিপ-স্টিক ঠিক আছে কিনা দেখে নিল মেয়েটা, তারপর বলল, 'বেশি রাত করে ফিরলে বাবা বকাঝকা করবেন। চল, আমরা কোন ভাল হোটেলে গিয়ে উঠি।' আয়নাটা ব্যাগে ভরে রেখে রানার চোখে সরাসরি তাকাল, বলল, 'তার আগে বল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

'হয়েছে·

রানাকে কথাটা শেষ করতে দিল না মেয়েটা, তার আগেই ওর সামনে একটা হাত পাতল। 'ম্যাডামের পাওনাটা—তিন ডলার।'

মানিব্যাগ বের করার জন্যে পকেটে শুধু হাত ভরেছে রানা, দমকা বাতাসের মতো কাছে চলে এল ম্যাডাম। রানার হাত থেকে ডলার তিনটে নিয়েই হাতব্যাগে ভরে ফেলল, বলল, 'সুজি আপনাকে খুশি করবে। আবার যখন দরকার হবে, এখানেই খোঁজ করবেন আমার।' হন হন করে চলে গেল সে আবার।

রানার হাত ধরে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা। রিক্সায় ওঠার আগে সামান্য একটু মন কষাকষি হল ওদের মধ্যে। ভাল কোন হোটেলে উঠতে চায় মেয়েটা, কিন্তু রানা নিজের কথায় অটল থাকল—রিক্সাওয়ালা সোজা হোটেল কসমোপলিটানে নিয়ে এল ওদেরকে।

হোটেলে ঢুকল ওরা হাত ধরাধরি করে। কাউন্টারে সেই আগের মতোই চোখ বুঁজে ঝিমোচ্ছে বুড়ো লোকটা। পায়ের আওয়াজ শুনে একটা চোখ খুলল সে। রানার সাথে মেয়েটাকে দেখে একটা ভুরু উঠে গেল কপালের মাঝখানে, তারপর চোখটা বন্ধ করল। লবি থেকে প্যাসেজে চলে এল ওরা। রানা দেখল পাশের ঘরের দরজার গায়ে হেলান দিয়ে নখে নেইল-পালিশ লাগাচ্ছে এমপঙ পিয়া। চোখাচোখি হতে অবজ্ঞার হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। কিন্তু মিষ্টি চেহারায় হাসিটা ঠিক মানাল না। তালা খুলে নিজের কামরায় ঢুকল রানা, মেয়েটা ভেতরে ঢুকতে কবাট বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল।

ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে বিছানার ওপর পড়ল মেয়েটা। পা দুটো আকাশের দিকে তুলল। স্কার্টটা সরে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল হলুদ রঙের উরু। পা নামিয়ে মেঝেতে দাঁড়াল সে। ব্লাউজের চেইন ধরে

টান দিল, ভেতরে দেখা গেল সাদা ব্রেসিয়ার। 'আমাকে যদি ত্রিশ ডলারের বদলে পঞ্চাশ ডলার দাও, দশজন মেয়ে যে আনন্দ দিতে পারে না আমি একাই তোমাকে তার চেয়ে বেশি আনন্দ দেব। রাজি?'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা।

এক এক করে পোশাক খুলতে শুরু করল মেয়েটা। রানা পঞ্চাশ ডলার দিতে রাজি হয়েছে ধরে নিয়ে দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার, আরো বেশি চাইলে তাও পাওয়া যেত ভেবে। মানিব্যাগ খুলে ভেতর থেকে সুজি কোয়াও-র ফটোটা বের করে মেয়েটার সামনে ধরল রানা। 'সুজি কোয়াও-র ফটো এটা।'

ঝট্ করে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখের চেহারা। কথা বলল না। ধীরে সুস্থে এক এক করে পরে নিল আবার পোশাকগুলো। তারপর বলল, 'তোমার কাছে ওর ছবি আছে, তা আমি জানব কিভাবে? ম্যাডাম তো বলল, ওকে তুমি কখনও দেখনি, চেন না...'

'ফটোর এই মেয়েটাকে চেন তুমি?'

'না। কিন্তু আমি কি ওর চেয়ে সুন্দরী নই?' অভিমানের সুরে বলল মেয়েটা। 'আমি কি তোমাকে আনন্দ দিতে পারি না?' রানা বোঝাবার ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে দ্রুত বাধা দিল সে, বলল, 'আমাকে নিশ্চয়ই খালি হাতে ফিরে যেতে হবে না?'

মানিব্যাগ থেকে তিরিশটা ডলার বের করে মেয়েটার বাড়ান হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'একটা বাঙালী ছেলেকে বিয়ে করেছিল সুজি কোয়াও। ছেলেটার নাম ছিল মীর শফিকুর রহমান। কখনও দেখেছ তাকে, কিংবা নামটা শুনেছ?' শফিকের ছবিটাও বের করল এবার রানা।

দুটো ফটোই এবার ভাল করে দেখল মেয়েটা। 'মেয়েটার ছবি এমন কেন ? কেমন যেন মরা মরা লাগছে।'

'হ্যাঁ, ওটা তার লাশের ছবি।'

আঁতকে উঠে হাত থেকে ফটোটা ফেলে দিল মেয়েটা। 'ইস। সর্বনাশ হয়ে গেল। মরা মানুষের ফটো দেখলে দিনটা খারাপ যায়।' রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে। 'না, ওদের কাউকে কখনও দেখিনি আমি।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে।

সময় এবং টাকা, দুটোই নষ্ট হল, ভাবল রানা। সুজি কোয়াও-র খবর সংগ্রহ করার জন্যে অন্য কোথাও চেষ্টা করতে হবে ওকে।

আধ ঘণ্টা পর সাপার খাবে বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল রানা। পাশের কামরার দরজা খোলা, কিন্তু প্যাসেজে কোথাও ওমপঙ পিয়াকে দেখল না ও। কিন্তু তার কামরার ভেতর চোখ পড়তেই দেখল, দরজার দিকে পিছন ফিরে অত্যন্ত অস্থিরভাবে কাকে যেন কি বোঝাচ্ছে সে। ঘন ঘন মাথা নাড়ছে, হাত ছুঁড়ছে, কখনও পিছিয়ে আসছে, কখনও সরে যাচ্ছে এক পাশে। ব্যাপারটা কি বোঝার জন্যে দরজার ভেতর মাথা গলিয়ে ভাল করে তাকাল রানা। চীনা ভাষায় অনর্গল বক বক করছে পিয়া, এত দ্রুত কথা বলছে যে একটা শব্দও ধরতে পারল না ও। এই সময় হঠাৎ অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে এল পিয়া, ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। এতক্ষণে পিয়ার সামনের দিকটা চোখে পড়ল রানার, এবং ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। টেবিলের ওপর বড় সড় একটা চীনা পুতুল বসে আছে। কোন বিরতি নেই, এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে

সে। এতক্ষণ এর সাথেই ঝগড়া করছিল পিয়া। খুব বেশি বয়স নয় মেয়েটার, তাছাড়া চেহারার অদ্ভুত সারল্যের সাথে এই পুতুল নিয়ে খেলাটা বেশ মানিয়ে যায়, অন্তত রানার তাই মনে হল। খুক্ করে কাশল ও।

চমকে ঘাড় ফেরাল ওমপণ্ড পিয়া। রানাকে দেখে গম্ভীর করে তুলল চেহারা। 'কি চাই?'

'আমার কিছু তথ্য দরকার,' বলল রানা। 'চল না, কোথাও থেকে ডিনার খেয়ে আসি?'

কি যেন ভাবল মেয়েটা, তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এসে থামল রানার সামনে 'মেয়েটা এসেই চলে গেল কেন? দরে বনেনি, নাকি অন্য কিছু? তাছাড়া, পাশের কামরায় আমি থাকতে ওকে তুমি আনলে কেন? আমি কি ওর চেয়ে কম সুন্দরী?'

'ওর সাথে একটা কাজ ছিল,' বলল রানা। 'আমার সাথে বেরুবে নাকি?'

ঘাড় ফিরিয়ে পুতুলটার দিকে তাকাল পিয়া। এখন আর পুতুলটা নেতিবাচক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে না, ওপর-নিচে মাথা দোলাচ্ছে। রানার দিকে ফিরে ফিক ফিক করে হেসে ফেলল পিয়া। 'আমার সখী যখন অনুমতি দিচ্ছে, তখন যাওয়া যেতে পারে। দাঁড়াও, আমার তৈরি হতে এক মিনিটও লাগবে না।'

উজ্জ্বল লাল আর সোনালী রঙের শার্ট, নিচে গাঢ় হলুদ রঙের স্কার্ট পরে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওমপণ্ড পিয়া। খোঁপা করে বেঁধেছে চুলগুলো, তাতে আবার একটা ফুলের রিঙ গুঁজে নিয়েছে। আশ্চর্য সুন্দর লাগছে দেখতে। রানার হাত ধরে বলল, 'তোমাকে খুব ভাল একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব আমি। ওখানের খাবারটা সাংঘাতিক

ভাল, অথচ তোমার খুব বেশি পয়সা খরচ হবে না।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল ওরা। পিয়া বলল, 'ফেরী পার হয়ে কাউলুনে যাব আমরা, রেস্তোরাঁটা ওপারে।'

অনর্গল কথা বলতে পারে পিয়া, মুখ ব্যথা করে না। কিন্তু রানার সম্পর্কে তার তেমন কোন কৌতূহল দেখা গেল না। সারাক্ষণ শুধু নিজের গল্পই করে গেল। ওর প্রতিটি সমস্যাই খুব হাস্যকর, কিন্তু হাসলে রেগে ওঠে। বেশির ভাগ সমস্যাই সখীকে নিয়ে, মানে সেই যান্ত্রিক পুতুলটাকে নিয়ে। খুব জরুরী কোন কাজে হয়ত বেরুতে যাচ্ছে পিয়া, চাবি ঘুরিয়ে দম দিতে দেখা গেল, যা আশা করা গিয়েছিল ঠিক তার উল্টোটা করছে সে, মানে, এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বাইরে বেরুতে নিষেধ করছে পিয়াকে। তাছাড়া, ছোট ভাইটির সাথে চিঠির মাধ্যমে কিভাবে পুরো দস্তুর ঝগড়া-ঝাঁটি চালিয়ে যাচ্ছে তারও বিস্তারিত বর্ণনা দিল পিয়া। ফেরী থেকে নেমে রানাকে বলল, 'নাথান রোড ধরে রেস্তোরাঁ পর্যন্ত চল আমরা হেঁটেই যাই।'

নাথান রোডে হাঁটার সুযোগ পেয়ে নতুন একটা অভিজ্ঞতা হল রানার। সংখ্যায় এত বেশি আর এত বিচিত্র ধরনের নিওন সাইন দুনিয়ার আর কোথাও দেখেনি ও। সেই সাথে যানবাহন আর মানুষের ভিড়। আধ মাইল হাঁটতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগল ওদের। অবশেষে পিয়ার প্রিয় রেস্তোরাঁয় পৌঁছুল ওরা।

ভেতরে ঢুকতেই ভারি একটা গমগমে আওয়াজ ঢুকল কানে। সেই সাথে প্লেটের সাথে চামচের, গ্লাসের সাথে গ্লাসের টুং টাং শব্দ। অথচ কাউন্টারে বসে থাকা একজন কেরাণী আর একজন রিসেপশনিস্টকে ছাড়া কাউকে দেখতে পেল না রানা। মাঝখানে সরু প্যাসেজ, দু'ধারে ছোট ছোট কেবিন। প্রাইভেসির এই ব্যবস্থা দেখে খুশি হল

ও। ওদের সামনে একজন ওয়েটার এসে দাঁড়াল। পথ দেখিয়ে খালি একটা কেবিনের সামনে নিয়ে এল ওদেরকে। ভেতরে ঢুকল ওরা।

'কি খাবে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, আমিই অর্ডার দেব, দাঁড়াও একটু ভেবে নিই…' কয়েক সেকেণ্ড পর ওয়েটারের দিকে তাকাল ও, বলল, 'প্রথমে ভাজা চিংড়ি দাও। তারপর একটা স্যুপ। বেগার চিকেনটা খুব ভাল হয় তোমাদের এখানে, ওটা দেবে। আপাতত এই দাও, খেতে খেতে ভাবব আর কি খাওয়া যায়।'

ওয়েটার বেরিয়ে যেতে নড়েচড়ে আরাম করে বসল ওমপণ্ড পিয়া। শার্টের গলার ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঠিকঠাক করে নিল ব্রেসিয়ারটা, রানার চোখে চোখ রেখে হাসল মিষ্টি করে। 'সেই থেকে অনেক বক বক করেছি। এবার তোমার কথা বল আমাকে। তুমি ইণ্ডিয়ান?'

'বাংলাদেশী,' বলল রানা। 'কতদিন ধরে আছ তুমি এখানে—মানে কাউলুনে?'

'বছর তিনেক তো হবেই। ক্যান্টন থেকে রিফিউজি হয়ে এসেছিলাম আমরা। প্রথমে ম্যাকাও, তারপর হংকং।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করল পিয়া। 'তুমি বিয়ে করেছ?'

'না।'

এই সময় চীনা মদ নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার। নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রানা বুঝল, শুধু উগ্র নয়, মদটা সাংঘাতিক কড়া। আড়চোখে পিয়ার দিকে তাকাল ও। ঢক ঢক করে শেষ করে ফেলল নিজের গ্লাসটা, মুখের কোথাও একটা রেখাও পড়ল না। মৃদু গলায় বলল

রানা, 'সুজি কোয়াও। সে-ও তোমার মতো একজন রিফিউজি। চেন?'

'সুজি কোয়াও? তার কথা তুমি জানলে কিভাবে? এর আগে হঙকঙে এসেছ নাকি?' অবাক হয়েছে পিয়া। 'চিনি বৈকি। কেন বল তো?'

বড় একটা প্লেটে সোনালী রঙের একগাদা বড় সাইজের চিংড়ি নিয়ে কেবিনে ঢুকল ওয়েটার। প্লেটের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল পিয়া। কাঠি দিয়ে গাঁথল একটা চিংড়ি, সেটাকে ভিজিয়ে নিল সসে। তারপর গোটাটা পুরে দিল মুখের ভেতর।

'আমার দেশী এক ছেলের সাথে সুজির বিয়ে হয়েছিল,' বলল রানা। পিয়ার দেখাদেখি কাঠি দিয়ে চিংড়ি গাঁথতে গিয়ে টেবিল ক্লথের ওপর ফেলে দিল একটা মাছ। খিল খিল করে হেসে উঠল পিয়া। অপ্রতিভভাবে একটু হাসল ও। আবার কাঠি দিয়ে মাছটা তুলতে যাবে, ওর কব্জি চেপে ধরল পিয়া। তারপর ডান হাতের দু'আঙুল দিয়ে মাছটা তুলে নিয়ে রানার মুখের সামনে ধরল। মুখ খুলল রানা. ভেতরে ঢুকিয়ে দিল সেটা পিয়া। মাছ চিবাতে চিবাতে জানতে চাইল রানা, 'ছেলেটার নাম মীর শফিকুর রহমান তাকেও কি চিনতে? দেখেছ কখনও?'

কাঠি দিয়ে টপাটপ মুখে মাছ ভরছে পিয়া। ফোলা গাল নেড়ে বলল, 'ক্যান্টন থেকে আমি আর সুজি কোয়াও তো এক সাথেই পালিয়ে আসি। হ্যাঁ,' বড় করে ঘাড় কাত করল সে। 'ওর স্বামীকেও আমি দেখেছি। কিন্তু সুজির কপালে সুখ নেই। বেচারী এই বয়সে বিধবা হয়ে গেল।'

ফ্রায়েড রাইস এল—ভাজা ডিম, গরুর মাংসের টুকরো, ভাজা

চিংড়ি ইত্যাদি মেশান, এমন সুগন্ধ ছুটল যে জিভে পানি এসে গেল রানার। কিন্তু ফ্রায়েড রাইস কাঠি দিয়ে মুখে পুরতে গিয়ে টেবিলের ওপর সেগুলো শুধু ছড়ালই ও, মুখে তুলতে পারল না। আবার হেসে উঠল পিয়া।

বলল, 'তুমি তো শুধু শুধু কসরৎ করছ। দরকার নেই কাঠি, হাত দিয়ে, না হয় চামচ দিয়ে খাও।'

'সুজিকে নিয়ে শফিক কি এই হোটেলেই থাকত?' অগত্যা চামচ ব্যবহার করছে রানা।

মাথা ঝাঁকাল পিয়া। 'হ্যাঁ। আমার ডান পাশের কামরায়। মাস তিনেক ছিল শফিক, তারপর তো সে চলে যায়।'

'চলে যায়? কোথায়?'

স্যুপ নিয়ে কেবিনে ঢুকল ওয়েটার। সে বেরিয়ে যেতে পিয়া বলল, 'শফিক তো সুজিকে বিয়ে করেছিল অভাবে পড়ে, ওর রোজগারে ভাগ বসাবার জন্যে। নিজে যখন আয়ের ভাল রাস্তা করতে পারল, সুজিকে তখন আর দরকার ছিল না ওর।'

'ও। সুজি বুঝি ভাল রোজগার করত? কি করত সে?'

'কি আবার! আমার মতোই পুরুষদের মনোরঞ্জনের স্বাধীন ব্যবসা করত।' চাপা ক্ষোভ প্রকাশ পেল গলার সুরে।

কেবিনের বাইরে, পর্দার ফাঁক দিয়ে, ওয়েটারকে দেখতে পেল রানা, হাতে একটা মাদুর। ভেতরে ঢুকে খুব ঘটা করে টেবিলের পাশে, মেঝের ওপর বিছাল সেটা। এবার কেবিনে ঢুকল কিশোর একটা চীনা ছেলে. হাতে বিরাট একটা পাত্র, তাতে প্রকাণ্ড উটপাখির ডিমের মতো কি যেন রয়েছে।

আনন্দে উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওমপঙ পিয়া,

রানাকে জ্ঞানদান শুরু করে দিল, 'প্রথমে নানা রকম মশলা মাখিয়ে পদ্মপাতা দিয়ে জড়ান হয় মুরগীটাকে। তারপর সেটার চারদিকে মাটি লেপা হয়। মাটির মোড়কটাকে একটানা পাঁচ ঘণ্টা ধরে আগুনে পোড়ান হয়। হাত দিয়ে দেখ না, আগুনে পুড়ে কেমন শক্ত পাথর হয়ে গেছে মাটির আবরণ।'

এতক্ষণে বুঝল রানা, ওটা ডিম নয়, মুরগী। হাতুড়ি দিয়ে কয়েকটা বাড়ি দিয়ে শক্ত মাটির আবরণ ভাঙল কিশোর ছেলেটা। ভেতর থেকে এবার যা বেরুল তার যেমন সুগন্ধ তেমনি চোখ জুড়ান রঙ। এ জিনিস যে সুস্বাদু হবে তাতে আর সন্দেহ কি। পদ্ম পাতার আবরণ সরিয়ে ওয়েটারের হাতে ধরা পাত্রে মাংসটা রাখল কিশোর। মুরগীটা চমৎকার তৈরি হয়েছে, পাত্রে রাখা মাত্র হাড় থেকে খসে পড়ল মাংস। অত্যন্ত যত্নের সাথে চামচ দিয়ে ওদের দু'জনের প্লেটে মাংস তুলে দিল ওয়েটার।

আবার আলোর ঝলকানির মতো হয়ে উঠল পিয়ার হাতে কাঠি-গুলো, কোন বিরতি ছাড়া গোগ্রাসে খাচ্ছে সে। তারপর রানাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পেয়ে হাসল একটু। বলল, 'এর নাম বেগার চিকেন। কেমন লাগছে বলছ না যে?'

সত্যি কথাটাই বলল রানা, 'চমৎকার। এত ভাল মাংস আর কোথাও খাইনি।'

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'এবার?'

কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখে পিয়া বলল, 'আই বাপ। দশটা। চল, হোটেলে ফিরে যাই।' রানার চোখে চোখ রেখে ফিক করে হাসল সে। 'এই রকম ভাল খাওয়াদাওয়ার পর তোমার সাথে শুতে আমার

ভালই লাগবে।'

'দশটা আবার রাত নাকি?' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল রানা। 'সারাটা রাতই তো পড়ে রয়েছে আমাদের সামনে। তুমি বরং সুজি আর শফিকের গল্প শোনাও। তুমি তখন বললে, বিয়ের তিন মাস পর রোজগার শুরু করে শফিক। কি করত সে?'

চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলেও শান্ত ভাবে বলল পিয়া, 'তা আমাকে কোনদিন বলেনি সুজি।'

'চলে গেল মানে কি? একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল ওদের···?'

'না। মাঝে মাঝে ফিরে আসতেও দেখেছি। রাত কাটিয়ে আবার চলে যেত।' মুখের চেহারায় ঘৃণা ফুটে উঠল পিয়ার। 'তোমার দেশী লোক ছিল শফিক, কিছু মনে কর না, আসলে লোকটা ছিল একটা নিষ্ঠুর পশু।'

'কেন?'

'সুজিকে কোন টাকা-পয়সা দিত না। বিয়ের পরও সুজিকে পর-পুরুষের কাছে গিয়ে টাকা রোজগার করতে হত।'

'সুজিকে ছেড়ে কোথায় উঠেছিল শফিক?'

'সত্যি মিথ্যে জানি না, সুজিই একদিন আমাকে বলেছিল, রিপালস উপদ্বীপের তীরে কোন এক চীনা জুয়াড়ীর একটা বাড়ি ভাড়া করেছিল শফিক। বাড়িটা আমি চিনি—খুব সুন্দর, দুধের মতো সাদা। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ সাগরে নেমে গেছে। সুন্দর একটা শান বাঁধান ঘাট, ঘাটে ঝকঝকে একটা বোটও দেখেছিলাম···'

'ওখানে কখনও গিয়েছিল সুজি?'

'না। শফিক তাকে নিয়ে যায়নি, বা যেতেও বলেনি।'

বিল নিয়ে এল ওয়েটার। খাবারের মান এবং পরিমাণের তুলনায় অন্য রেস্তোরাঁর চেয়ে দাম এখানে খুব কম। বিল মিটিয়ে দিল রানা।

'টাকা খরচ হল বলে মন খারাপ করনি তো?' হঠাৎ উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল পিয়া।

'আরে না!'

খুশি হয়ে উঠল পিয়া। 'চল তাহলে, হোটেলে ফিরে তুমি এবার আদর করবে আমাকে, কেমন?'

মনে মনে ভাবল রানা, হঙকঙের নিয়মই দেখছি এই। কিছু চাওয়ার আগেই মেয়েগুলো সব দিয়ে বসে থাকতে চায়। কি ভেবে সায় দিল ও. পিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে।

নাথান রোডে আগের মতোই ভিড়। ওরা পরস্পরের হাত ধরে আছে, তা না হলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার ভয়। ফুটপাথের ফাঁকা মতো এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পিয়া, তাকিয়ে আছে একটা জুয়েলারীর দোকানের দিকে। শো-কেসে ঝলমল করছে হরেক রকমের অলংকার। চাপা গলায় বলল সে, 'আমাকে একটা উপহার কিনে দেবে, ডিউক?'

ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল রানা দোকানের ভেতর। 'বল, কি উপহার চাও তুমি।'

বেঁটে সেলসম্যান বিদেশী খদ্দের দেখে একগাল হেসে এগিয়ে এল। 'তোমাকে মনে রাখার জন্যে আমি একটা আঙটি চাইব,' বলল পিয়া। নকল জেড পাথর বসান একটি আঙটি পছন্দ করল সে। এমন কিছু দাম নয়, কিন্তু জিনিসটা দেখতে খুব সুন্দর। সেলসম্যান দাম হাঁকল, চল্লিশ ডলার। কিন্তু দর কষাকষি করে সেটাকে

নামিয়ে পঁচিশ ডলারে রফা করল পিয়া।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলল সে, 'সব সময় পরে থাকব তো, কাজেই প্রায়ই তোমাকে মনে পড়বে।'

ফেরী পার হল ওরা। ট্যাক্সির জন্যে একটা হাত তুলেছে রানা, ঘটনাটা ঠিক সেই সময় ঘটল। কোত্থেকে কি হয়ে গেল, বুঝতেই পারল না ও। হাত তুলতেই সামনে চলে এল ট্যাক্সিটা। সেই সাথে বলিষ্ঠ গড়নের তিনজন চীনা ঘিরে ধরল ওকে। তাদের একজন ঝুঁকে পড়ে কথা বলল ড্রাইভারের সাথে, যেন ট্যাক্সি ভাড়া করাই তাদের উদ্দেশ্য। ড্রাইভার ওদেরকে নিরাশ করায়, ভুল ইংরেজীতে রানার কাছে ক্ষমা চাইল তিনজনই। ট্যাক্সিটা রানা ডেকেছে তা নাকি বুঝতে পারেনি ওরা। ক্ষমা চেয়ে চলে গেল ওরা আরেকটা দাঁড়ান ট্যাক্সির দিকে ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশে তাকাল রানা, কি যেন বলতেও গেল পিয়াকে, কিন্তু কোথায় পিয়া। ঝট ঝট করে দ্রুত নিজের চারদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। নেই তো নেই-ই। যেন ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে-গ্রাস করেছে মেয়েটাকে।

চারদিকে কোথাও খুঁজতে বাকি রাখল না রানা। কিন্তু পিয়ার ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও। শুধু যে অস্বস্তি বোধ করছে ও তা নয়, সেই সাথে মেয়েটার অমঙ্গল আশংকা করে ভয় হতে লাগল ওর। ফেরীঘাটে ফিরে এল ও। এখানেও কোথাও খুঁজতে বাকি রাখল না। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল হোটেলে।

বরাবরের মতো কাউন্টারে বসে ঝিমুচ্ছে বুড়ো লোকটা।

'ওমপও পিয়া ফিরে এসেছে?' রানার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল, চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল বুড়ো। কিন্তু সামনে

রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নীরস গলায় বলল, 'নো স্পীক ইং-লিশ।' ধীরে ধীরে বসে পড়ল আবার, বন্ধ করল চোখের পাতা।

লবি থেকে প্যাসেজে চলে এল রানা। পিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ। হাতল ধরে ঠেলা দিতেই খুলে গেল কবাট। ভেতরে অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে সুইচ অন করল। পরিপাটি করে সাজান ছোট ঘর। টেবিলের ওপর স্থির হয়ে আছে বড় সড় চীনা পুতুলটা। তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চাবি ঘুরিয়ে দম দিতেই এদিক ওদিক মাথা নাড়তে শুরু করল। ঘরে কোথাও নেই পিয়া। বিছানায় বসল ও। সিগারেট ধরাল। কয়েকটা সিগারেট শেষ করার পর রিস্টওয়াচ দেখল। সাড়ে এগারোটা। বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল ও। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ঘটনাটার কথা স্মরণ করল বারবার। কিন্তু চোখের নিমেষে পিয়ার গায়েব হয়ে যাওয়ার রহস্যটা বোধগম্য হল না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে রানা নিজেও বলতে পারবে না।

মুখে রোদ লাগতে ঘুম ভেঙে গেল রানার। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। রিস্টওয়াচ দেখল, আটটা। ঘরের চারদিকে ভাল করে চোখ বুলাল। ঘরের দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল ও পিয়া ফেরেনি। ঠাণ্ডা একটা ভয়ের স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল। মন বলছে, পিয়ার সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। ওর পাশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেয়েটাকে। কেন, তাও অনুমান করা কঠিন নয়। কেউ জানতে পেরেছে, পিয়া অনেক গোপন তথ্য জানে, এবং শুধু যে জানে তাই নয়, অনেক তথ্য ওকে জানিয়েও দিচ্ছিল সে।

নিজের ঘরে ফিরে এল রানা। দাড়ি কামিয়ে শাওয়ার সারল। পোশাক পরে বেরিয়ে এল লবিতে। বুড়োর জায়গায় বসে আছে একটা চীনা ছেলে। বুড়োর সাথে চেহারার মিল দেখে ভাবল, বোধ-

হয় নাতি। হাল্কা সুরে তাকে বলল ও, 'গত রাতে ঘরে ফেরেনি পিয়া।'

অপ্রতিভ দেখাল ছেলেটাকে। বোধহয় ইংরেজী বোঝে না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে রিক্সায় চড়ল রানা। 'পুলিশ হেড-কোয়ার্টার।'

রানাকে দেখেই চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসন নিজের চেয়ার ছেড়ে খানিকটা উঠে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। 'আসুন! আসুন, মিঃ ডিউক! সেদিন আমার ওপর রাগ করেছিলেন আপনি, তাই না? কি জানেন, সাত ঝামেলার মানুষ, সব সময় সবার প্রতি সুবিচার করতে পারি না আমরা...'

করমর্দন সেরে বসল রানা। গত রাতের পুরো ঘটনাটা সবিস্তারে শোনাল চীফ ইন্সপেক্টরকে।

ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিল জ্যাসন। বলল, 'আপনি হংকঙে নতুন কিনা, তাই এই রকম সাধারণ একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। এখানে এসব ডাল ভাত। একটা মেয়ে আজ এখানে, কাল ওখানে —গত পনের বছর ধরে এই দেখে আসছি। আপনাকে ফেলে পালিয়েছে পিয়া, তার কারণ আপনার চেয়ে মাল-পানি ওয়ালা খদ্দের জুটে গিয়েছিল। আপনার পকেট খালি করে আরেকজনের পকেট খালি করতে গেছে, এর মধ্যে আর কিছু নেই।'

প্রচণ্ড রাগ হল রানার। ইচ্ছে হল পেপারওয়েট ঠুকে লোকটার মাথা ফাটিয়ে দেখে ভেতরে কতটা কি আছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলল, 'আপনি ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। আমি একটা খুনের তদন্ত করছি। আমাকে কিছু তথ্য দিচ্ছিল পিয়া। এই সময় অদৃশ্য হয়ে যায় সে।'

'আপনি আমাকে হাসালেন দেখছি।' সহাস্যেই বলল জ্যাসন। 'খুনটা হয়েছে ঢাকায়, এখানকার পিয়া আপনাকে সে ব্যাপারে কি খবর দিতে পারে?

'বলছি। বিয়ের তিনমাস পর হঠাৎ করে ভাল রোজগারের একটা পথ পেয়ে যায় শফিক। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। রোজগার শুরু করেই মুন্নিকে ফেলে রেখে চলে যায় সে। রিপালস উপদ্বীপের ধারে বড় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল...'

'আপনি তো সাহেব আজব মানুষ।' বিরক্ত দেখাল চীফ ইন্সপেক্টরকে। 'একটা কলগার্ল কি বলল না বলল আপনি সব বিশ্বাস করে বসে আছেন?'

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল রানা। 'রিপালস উপদ্বীপে বসবাস করে এমন কোন বাঙালীকে জানেন আপনি?'

'বেশ কিছু বাঙালী আছে ওদিকে। তাতে কি?'

'শফিক ওখানে ছিল কিনা খবর নেবেন?'

'শফিক ওখানে ছিল বলে মনে হয় না,' বলল জ্যাসন। 'থাকলে আমি খবর পেতাম। তাছাড়া, ওদিকে বাড়ি ভাড়া নেয়া সহজ কথা নয়। যেমন ভাড়া। অত টাকা পাবে কোথায় সে?'

'তাহলে আপনি বলতে চান, মেয়েটা আমাকে মিথ্যে তথ্য দিয়েছে?'

'তা আর বলতে। ওদের কাজই তো এই—একগাদা মিথ্যে কথা বলে আপনাদের মতো খদ্দেরদের পকেট খালি করা।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল রানা। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ফিরে এল হোটেলে। লবিতে ঢুকে দেখল, কাউন্টারে বসে আছে ছেলেটা নয়, বুড়োটা। কয়েকটা কথা বলা

দরকার ওর সাথে , কিন্তু ইংরেজী বোঝে না সে , তাই একজন দোভাষীর কথা মনে হলো রানার। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই যে গাইড লোকটার সাথে পরিচয় হয়েছিল ওয়াম পিং হো , তার কথা মনে পড়ে গেল । সবে সকাল, আরেকটু পর তার সাথে যোগাযোগ করবে ভেবে নিজের ঘরে ফিরে এল রানা। পোশাক পরেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘন্টাখানেক পর টোকা পড়ল দরজায়।

হোটেলের একজন বয়, ইঙ্গিতে জানাল , ফোনে কেউ ডাকছে রানাকে । তাড়াতাড়ি লবিতে চলে এল রানা । কাউন্টারে বসে লম্বা একটা অঙ্ক কষছে বুড়ো লোকটা । চোখাচোখি হতে একটু হাসল রানা , রিসিভার তুলে বলল , 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্ত থেকে চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসনের গলা পাওয়া গেল । 'একটু আগে যে মেয়েটার কথা বলে গেলেন কি যেন নাম তার?'
অমঙ্গল আশঙ্কা করে বুকটা কেঁপে গেল রানার । 'ওমপঙ পিয়া । কেন?'
'জেড পাথরের একটা আংটি কিনে দিয়েছিলেন তাকে, তখন সে কথাই তো বলে গেলেন , তাই না?'

সারা শরীরের পেশী টান টান হয়ে উঠল রানার । 'হ্যাঁ । নকল জেড বসানো আংটি । ওর কোন খবর পেয়েছেন?'
' ট্যাক্সি নিয়ে এখুনি চ্যাথাম রোডের পুলিস ষ্টেশনে চলে যান, মি. ডিউক।'
'ও...? ও কি...?'
'হ্যা , মি. ডিউক । একটা মেয়ের লাশ পেয়েছি আমরা । তাড়াতাড়ি চলে যান, দেখুন, যদি সনাক্ত করতে পারেন । ওখানে সার্জেন্ট কট আছে , তার সাথে দেখা করবেন ।'

চল্লিশ মিনিট পর চ্যাথাম রোডের পুলিস স্টেশনে দেখা গেল রানাকে। সার্জেন্ট কট বেশ খাতির করে বসাল ওকে। বলল, 'লাশ দেখে সনাক্ত করার কিছু নেই, আপনাকে শুধু একটা হাত দেখাতে পারব আমরা। রাত দুটোয় প্রণালী থেকে পাওয়া গেছে লাশটা। ওখান থেকে রোজই দু'একটা লাশ উদ্ধার করতে হয় আমাদের। এই চীনাদের নিয়ে ভারি মুশকিল, বুঝলেন! আত্মহত্যা আর খুন করতে এদের জুড়ি নেই।

মর্গে নিয়ে আসা হলো রানাকে। সারি সারি টেবিলের উপর চাদর ঢাকা লাশ পড়ে আছে। একটা চাদরের কোণ একটু সরিয়ে সার্জেন্ট কট ভেতর থেকে লাশের বাঁ হাতটা বের করল। আনামিকায় রয়েছে জেড পাথরের আঙটিটা, দেখেই চিনল রানা। সাথে সাথে রাগ, ক্ষোভ আর দুঃখ মিশ্রিত অনুভূতিতে স্তব্ধ পাথর হয়ে গেল ও। ঝাড়া এক মিনিট কথা বলতে পারল না। ইতোমধ্যে দু'বার জিজ্ঞেস করা হয়ে গেছে সার্জেন্টের, 'আঙটিটা চিনতে পেরেছেন কি?'

সামনের দিকে ঝুঁকে চাদরটা ধরল রানা, সামান্য একটু তুলে ভেতরের লাশটা ভাল করে দেখল। অনুশোচনা হলো পর মুহূর্তেই। না দেখলেই ছিল ভাল। ওমপঙ পিয়ার শরীরের এক ইঞ্চি জায়গাও অক্ষত নেই। 'হ্যাঁ।' ফিস ফিস করে বলল ও, ' এই আঙটিই কিনে দিয়েছিলাম পিয়াকে।'

'ধন্যবাদ, ' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল সার্জেন্ট। 'আপনি আমাকে বাঁচালেন, মি. ডিউক। সকালে শুধু ডিম আর বেকন খেয়েছি। আপনি সনাক্ত করতে পেরেছেন, তার মানে ফালতু ছুটোছুটির হাত থেকে বেঁচে গেলাম। মোটা নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে বউ, চলুন যাবার পথে আপনাকে ফেরী পর্যন্ত পৌছে দিই।

'না, তার দরকার হবে না,' বলল রানা। 'আমি নিজেই ফিরব।
ওর মাথায় তখন ওমপঙ পিয়ার স্মৃতি ঝকঝকে ছবির মতো ফুটে উঠছে। মাত্র দু দিনের পরিচয়, অথচ মনে হচ্ছে প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় একজনকে হারিয়েছে সে। বিষণ্ণ মনে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল ও।

ফেরীঘাটে পৌছে দেখল, আরেকজন সার্জেন্ট জীপ নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। নাম বলল নিকলসন। জীপ হাঁকিয়ে সোজা হোটেল কসমোপলিটানে নিয়ে এল রানাকে। ক্যান্টনীজ ভাষায় কিছু বলতেই কাউন্টারে বসা বুড়ো পিয়ার কামরার চাবি তুলে দিল সার্জেন্টের হাতে। দুর্বোধ্য ভাষায় আরো কিছু কথা বলল সার্জেন্ট, উত্তরে বুড়ো শুধু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

রানাকে নিয়ে পিয়ার ঘরে চলে এল সার্জেন্ট নিকলসন। লোকটা যে কি খুঁজছে, বুঝতেই পারল না রানা। দেয়াল আলমিরা, বাক্স, স্যুটকেস সবগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজল সে। কিন্তু পেল না কিছুই। তবু দমল না। বিছানার তোষক খাট থেকে নামিয়ে ফেলল মেঝেতে। যা খুঁজছিল এবার পেয়ে গেল সেটা। তোষকের নিচেই ছিল, খাটের গায়ে অনেক দিনের পুরনো একটা খোপের ভেতর। কাগজের তিনটে ছোট মোড়ক। মোড়ক খুলে নাকের সামনে ধরল সার্জেন্ট। ঘ্রাণ নিল। তারপর সবজান্তার মতো মাথা নেড়ে বলল, 'যা ভেবেছিলাম।'

'কি ওগুলো?'

'হেরোইন। ওমপঙ পিয়া হেরোইন অ্যাডিক্ট ছিল।'

'আমার বিশ্বাস হয় না,' বলল রানা। 'জানি, হেরোইন পাওয়ায় আপনারা নিজেদের মনগড়া থিওরি আরো জোরে আঁকড়ে ধরে

বলবেন, পিয়া আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি জানি, মেয়েটা আত্মহত্যা করেনি। ওকে খুন করা হয়েছে। এই হেরোইন একটা ষড়যন্ত্রের অংশ, আপনাদের ভুল পথে সরিয়ে নেবার জন্যে কেউ রেখে গেছে এখানে···'

'চীফ ইন্সপেক্টর বলছিলেন বটে, আপনি নাকি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।' চোখমুখে রাজ্যের কৌতুক ফুটিয়ে বলল সার্জেন্ট নিকলসন। 'কি জানেন, মিঃ ডিউক, শার্লক হোমসের সাথে আমারও এক-আধটু পরিচয় আছে। কিন্তু সে তো কল্প-কাহিনী। আমরা বাস্তব ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাই, এখানে বইয়ে পড়া বিদ্যে দিয়ে সুবিধে করা যাবে না।'

রেগে উঠতে গিয়ে হঠাৎ বুঝল রানা, এ-লোকের সাথে তর্ক করতে যাওয়া বোকামি। বলল, 'তা ঠিক।'

'তবু, কৌতূহল থেকে জানতে ইচ্ছে করছে, কেন মনে করছেন, খুন হয়েছে মেয়েটা ?'

'আমি আপনার প্রাইভেট টিউটর নই,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আরো কিছু দিন হঙকঙে আছি আমি। দরকার হলে দেখা করবেন।' বলে আর দাঁড়াল না ও, প্যাসেজে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকল, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

সাত

সার্জেন্ট নিকলসন হোটেল ছেড়ে চলে গেছে বুঝতে পেরেই নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। লবিতে একা বসে আছে বুড়ো। চোখে উদাস দৃষ্টি। তাকে একটা হাসি উপহার দিয়ে ফোনের সামনে দাঁড়াল ও। গাইড ওয়াম পিং হো-র নাম্বারে ডায়াল করল। পাওয়া গেল তাকে। একজন দোভাষী আর একটা গাড়ি দরকার ওর—হো বলল, সব ব্যবস্থা করে দেবে সে। লোকটার আগ্রহ আর উৎসাহ লক্ষ্য করে রানার মনে হল, পরিচয় হবার পর থেকে ওর টেলিফোন পাবার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল সে।

রিক্সা নিয়ে সাংহাই অ্যাণ্ড হঙকঙ ব্যাংকের সামনে চলে এল রানা। পারভিনের দেয়া ট্রাভেলার্স চেকগুলো ভাঙিয়ে ট্রাউজারের দুই পকেট ভরে নিল হঙকঙ ডলারে। বাইরে বেরুতেই দেখল ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ওয়াম পিং হো। ধোপদুরস্ত পোশাকে উজ্জ্বল লাগছে তাকে। মুখে সবিনয় হাসি। দেখেই মনে হয়, মাই ডিয়ার ম্যান। পাশেই দাঁড় করান রয়েছে ঝকঝকে একটা প্যাকার্ড গাড়ি, সেটা দেখিয়ে বলল, 'এর চেয়ে ভাল গাড়ি আর পেলাম না।'

'এতেই চলবে,' বলল রানা। ওয়ামকে নিয়ে গাড়িতে চড়ল ও। স্টার্ট দিল। বলল, 'আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আমার হোটেলের রিসেপশন ক্লার্কের কাছ থেকে কিছু তথ্য আদায় করতে

চাই। সেজন্যেই দোভাষীর প্রয়োজন।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল ওয়াম। সোনালী দাঁত বের করে বলল, 'অনেক ডিটেকটিভ গল্প পড়া আছে আমার, স্যার। কিন্তু নিজের চোখে এই প্রথম একজন ডিটেকটিভকে দেখার সৌভাগ্য হল আমার। আপনার কাজ করে আমি খুব আনন্দ পাব, স্যার। নিশ্চয়ই কোন গুপ্তধনের কেস নিয়ে এসেছেন…?'

'না,' হাসি চেপে বলল রানা। 'আমি একটা মার্ডার কেসের তদন্ত করছি।' গাড়ি ছেড়ে দিল ও। 'প্রথমে হোটেলে ফিরব আমরা।' পকেট থেকে একশো হঙকঙ ডলার বের করে ওয়ামের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'আপনার আজকের ফি। চলবে তো?'

'খুব চলবে,' আনন্দে চিক চিক করে উঠল ওয়ামের চোখ। 'তবে গাড়ির জন্যে আরো বিশ ডলার দিতে হবে, স্যার '

হোটেলের সামনে গাড়ি থামতেই চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল ওয়াম, 'এটা স্যার, নিতান্তই একটা বাজে হোটেল। এখানে আপনাদের কোনমতেই থাকা উচিত নয়। আপনার আপত্তি না থাকলে ভাল একটা হোটেলের ব্যবস্থা…

'পরে।'

হোটেলের লবিতে ঢুকে বুড়োর দিকে ওয়ামের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। 'ওকে বলুন, আমার কিছু প্রশ্ন আছে, উত্তর দিলে টাকা পাবে। কিন্তু এমন ভাবে বলুন যাতে অপমান বোধ না করে।' পকেট থেকে একগাদা হঙকঙ ডলার বের করল ও, তা থেকে মাত্র কয়েকটা হাতে রেখে বাকিগুলো আবার পকেটে ভরল।

বুড়োর দৃষ্টি রানার হাতের ওই টাকাগুলোর দিকে আটকে গেল। টাকার দিকে তাকিয়ে থেকেই ওয়ামের কথাগুলো শুনল সে। উত্তর

দেবার সময়ও তার দৃষ্টি একচুল নড়ল না।

ওয়াম জানাল, 'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছে ও, স্যার।'

সুজি কোহাও-র ফটোটা বের করল রানা। বুড়ো ভুরু কুঁচকে দেখল ছবিটা। তারপর ওয়ামকে কিছু বলল। ওয়াম রানাকে জানাল, 'মেয়েটাকে চেনে ও। একজন বাঙালী লোককে বিয়ে করেছিল। দিন পনের আগে কাউকে কিছু না বলে হোটেল ছেড়ে চলে গেছে মেয়েটা। মিঃ ডিউক কি তার বকেয়া হোটেল বিল মিটিয়ে দেবেন?'

মাথা নেড়ে জানাল রানা, না।

বুড়ো আরো বলল, সুজি কোহাও-র স্বামীর নাম ছিল মীর শফিকুর রহমান। মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। শফিকের ফটোটা তাকে দেখাল রানা। বুড়ো একবার চোখ বুলিয়েই জানাল হ্যাঁ, এই লোকটাই শফিকুর রহমান, সুজির স্বামী। কতদিন ছিল শফিক হোটেলে? বুড়ো বলল, অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার আগে পর্যন্ত ছিল এখানে।

বুড়ো মিথ্যে কথা বলছে, বুঝতে পারল রানা। পিয়ার কথা অনুযায়ী মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই হোটেল কসমোপলিটান ছেড়ে চলে গিয়েছিল শফিক। ওয়ামকে বলল রানা, ওর ধারণা বুড়ো মিথ্যে কথা বলছে।

অভিযোগটা শুনে বুড়োর চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল সে, সে-ই সত্যি কথা বলছে। পিয়া যদি বলে থাকে যে শফিকুর রহমান কয়েক মাস আগে হোটেল থেকে চলে গিয়েছিল তাহলে মনে করতে হবে, ভুল বলেছে সে। শফিক প্রতিদিন খুব ভোরে বেরিয়ে যেত, তাই হয়ত তাকে দেখতে পেত না

পিয়া।

তাহলে সুজি কেন পিয়াকে বলেছিল যে শফিক তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে? এর উত্তর বুড়োর জানা নেই। পরবর্তী প্রশ্ন করা হল, শফিকের রোজগারের উৎস কি ছিল। বুড়ো জানে না। কোন বাঙালী কি শফিকের সাথে দেখা করার জন্যে হোটেলে আসত? বুড়ো জানে না। সুজির কোন বন্ধু বা বান্ধবী কি সুজির সাথে দেখা করতে আসত? সেই একই উত্তর—জানে না। সুজি হোটেল ছেড়ে চলে যাবার সময় জিনিস পত্র কিছু রেখে গেছে?

রানার ফাঁদে সহজেই ধরা দিল বুড়ো। বলল, না।

তাহলে জিনিস পত্র সব নিয়েই গেছে? জিনিস-পত্র নিয়ে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল কিভাবে, বিল না শোধ করে?

ওয়াসের চোটপাট দেখে ঘাবড়ে গেল বুড়ো। শেষ পর্যন্ত স্বীকার গেল সে, একটা স্যুটকেস রেখে গেছে সুজি। কোথায় সেটা? পিয়ার ডান পাশের ঘরে থাকত সুজি, সেখানেই আছে। তখুনি পিয়ার পাশের কামরায় চলে এল ওরা। খাটের তলায় ঢুকে সস্তা দরের একটা নেদার স্যুটকেস বের করে আনল বুড়ো।

ওদের দু'জনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। কম দামী তালা, সেটা ভেঙে স্যুটকেস খুলতে কোন অসুবিধেই হল না। ভেতরে দেখা গেল কিছু কাপড়চোপড় আর টুকিটাকি জিনিস। স্যুটকেসের একেবারে নিচে, একটা কাগজের তলা থেকে বেরুল সাদা রঙের বড় একটা এনভেলাপ। ভেতরে একটা ফটোগ্রাফ দেখা গেল। বের করল ও। মীর শফিকুর রহমানের ফটো। পারভিন শফিকের যে ছবিটা দিয়েছিল ওকে, সেটারই আরেকটা কপি এটা। ফটোর নিচে আঁকাবাঁকা হরফে লেখা,

"আমার স্ত্রী সুজি কোয়াওকে"। চোয়াল ভাঙা কদর্য চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল কপালে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানার ওপর বসল ও। পারভিন এবং সুজি কোয়াও, দু'জনেই শফিকের একই ফটো পেল কিভাবে? আশ্চর্য একটা ব্যাপার, তাই না? শফিক দু'জনকে একই ফটো দিয়েছিল? হয়ত তাই। কিন্তু পরমুহূর্তে একটা প্রশ্ন দেখা দিল মনে···

প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে পিয়া আর বুড়ো রিসেপশন ক্লার্কের কথাগুলো স্মরণ করল রানা। দু'জন দু'রকম কথা বলছে। তার মানে, এদের মধ্যে একজন মিথ্যেবাদী। কিন্তু মিথ্যে কথা বলে পিয়ার লাভ কি?

আরো খানিক চিন্তা-ভাবনা করে উপলব্ধি করল রানা, হোটেল কসমোপালিটানে থাকার আর কোন মানে হয় না ওর, সূত্রের সন্ধানে অন্য কোথাও যাবার সময় হয়েছে। ফটোটা এনভেলাপে ভরে আগের জায়গায় রেখে দিল ও। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্যাসেজে। দেখল, বুড়ো কাউন্টারে ফিরে গেছে, প্যাসেজে একা দাঁড়িয়ে আছে ওয়াম পিং হো।

'রিপালস উপসাগরের কাছে কোন হোটেলে উঠতে চাই আমি,' ওয়ামকে বলল রানা। 'ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

'নিশ্চয় পারব,' উৎসাহের সাথে জানাল ওয়াম।

'তাহলে এই মুহূর্তে সেখানে উঠতে চাই আমি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওয়াম। 'লোকটাকে আর কোন প্রশ্ন··· ?'

'না।'

'বেশ। রিপালস বে চমৎকার হোটেল, যদিও চালু রাস্তাগুলোর

ওপর নয়···

'ওখানেই আমার জন্যে একটা কামরার ব্যবস্থা করুন।' হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে প্যাকার্ড গাড়িতে চড়ল রানা। ড্রাইভিং সীটে বসল ওয়াম। গাড়ি ছুটে চলল রিপালস বে-র দিকে।

রিপালস বে মুগ্ধ করল রানাকে। বে হোটেলে যে ঘরটা পেল ও সেটার জানালা থেকে সামনে সাগর দেখা যায়। ঝুল-বারান্দায় দাঁড়ালে দু'পাশে দেখা যায় পাহাড়শ্রেণী, কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেছে শৃঙ্গগুলো। নীল সাগরের বিশাল সব ঢেউ অনবরত আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের পাথুরে পাদদেশে, ঢেউ ভাঙার একটানা গর্জন শুনে রক্তে জাগে রোমাঞ্চকর আলোড়ন।

প্যাকার্ড গাড়িটা রেখে গেছে ওয়াম। বলে গেছে, দরকার হলে ফোন করে যেন রানা, সাথে সাথে চলে আসবে সে।

ওয়াম চলে যেতেই টেলিফোন বুকটা টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসল রানা। শফিক হঙকঙের এই এলাকায় বেশ কিছুদিন ছিল বলে মনে হয়, কাজেই ফোন বুকে তার টেলিফোন নাম্বার থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে খুঁজেও নামটা পাওয়া গেল না। হোটেলের রিসেপশনিস্টকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, মীর শফিকুর রহমান নামটা তার পরিচিত কিনা। রিসেপশনিস্ট দুঃখ প্রকাশ করে জানাল, এ-ধরনের নাম এই প্রথম শুনছে সে হঠাৎ একটা প্রচলিত প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেল রানার—হোটেল বয়ের কাছ থেকে সব খবরই পাওয়া যায়। ফোনের রিসিভার তুলে রুম বয়কে চা দিতে বলল ও। তিন মিনিট পরই চা নিয়ে কামরায় ঢুকল তরুণ রুম

বয়।

'প্রশ্নটা আগে মন দিয়ে শোন,' বলল রানা। 'উপসাগরের কিনারায় বড় একটা বাড়ি। সিঁড়ির ধাপগুলো নেমে গেছে সাগরে। বাড়িটার সাথে ছোট একটা শান বাঁধানো ঘাট, ঘাটে সুন্দর একটা বোটও আছে। মনে করে দেখ, এই রকম কোন বাড়ি দেখেছ আশপাশে কোথাও?'

খানিক চিন্তা করল রুম বয়। তারপরই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। 'ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি লনফিনের বাড়িটার কথা বলছেন কিনা। ওখানে এখন থাকেন মিঃ সুধীর নন্দী আর তাঁর বোন। এঁরাও অবশ্য বাঙালী, কিন্তু ভারতীয়।'

'ওখানে মীর শফিকুর রহমান নামে কেউ থাকত কিনা জান?'

ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার চেষ্টা করল রুম বয়। তারপর এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল, না, স্যার। নামটা শুনেছি বলে মনে হয় না।'

বিকেলে সাঁতারের পোশাক পরে সৈকতে চলে এল রানা। সাঁতার কাটার জন্যে যারা এসেছে তাদের মধ্যে চীনার সংখ্যা খুব কম, বেশিরভাগই ইউরোপীয়ান। একটা পেডালো ভাড়া করল ও। বৈঠা চালিয়ে বেরিয়ে এল বে থেকে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর যথেষ্ট দূরে সরে এল, গোটা উপকূল রেখা দেখতে পাচ্ছে এখন। লনফিনের ভিলাটা চিনতে মোটেও অসুবিধে হল না। সাগরের মাঝখানে উঁচু একখণ্ড জমি, তার ওপর সুন্দর একটা বাড়ি। বাড়ির পাশেই চমৎকার বাগান। গোটা জমিটা ধাপে ধাপে নেমে এসে সাগরের সাথে মিশেছে। শান বাঁধান নির্জন ঘাট। ছোট একটা স্পীডবোট নোঙর ফেলে রয়েছে। বৈঠা চালিয়ে মন্থর গতিতে বাড়িটার দিকে

এগোল ও।

সত্যিই কি এই বাড়িটা ভাড়া করেছিল শফিক? পিয়া ভুল করেনি তো? দেখেই বোঝা যায়, অনেক ভাড়া এ-বাড়ির। তার মানে, হঠাৎ অনেক টাকা পড়েছিল শফিকের হাতে। হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে কি যেন দেখতে পেয়ে সতর্ক, সাবধান হয়ে গেল রানা। বাড়ির সবচেয়ে উঁচু ঘরের জানালায় ক্ষুদে দুটো বিন্দু রয়েছে, তার একটার ভেতর অকস্মাৎ কি যেন ঝিক্ করে উঠল। সরাসরি সেদিকে আর তাকালই না ও। সন্দেহ নেই, বায়নোকুলার দিয়ে কেউ লক্ষ্য করছে। সূর্যের আলো লেগেছে শক্তিশালী লেন্সে, ঝিক্ করে উঠেছে তারই প্রতিফলন। কাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে? ওকেই কি?

পেডালো ঘুরিয়ে নিল রানা। বাড়িটার পাশ ঘেঁষে চলে আসার সময় দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। কালো বিন্দু দুটো এখনও রয়েছে। আর কোন সন্দেহ নেই, ওকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে। সৈকতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হেঁটে হোটেলে ফিরে এল ও।

পরদিন সকালেও পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে পারল না রানা। দশটার দিকে আবার ফিরে এল সৈকতে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাফেরা করল কিছুক্ষণ, তারপর খানিক সাঁতার কেটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বালির ওপর। শফিকুল্লাহ খান, মুজিব খোন্দ. মীর শফিকুর রহমান, পারভিন, বুড়ো মীর মোখলেসুর রহমান, তার নাতি মীর সাদেকুর রহমান এবং সরল মেয়ে হতভাগী ওমপণ্ড পিয়াকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলল ও। পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে সাগর, মাথার ওপর অসীম নীল আকাশ-চোখ বুঁজে প্রকৃতির কাছে নিজের সমগ্র অস্তিত্বসহ আত্মসমর্পণ করল রানা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক রোদ পোহাল ও। এই সময় খুব কাছে পায়ের

আওয়াজ হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ খুলল ও। দেখল, ওর পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল একটা মেয়ে।

বেশ লম্বা মেয়েটা, মেদহীন একহারা গড়ন। ভাল করে তাকাতে বুঝল, গায়ের রঙটা যদিও ফর্সা, মেয়েটা শ্বেতাঙ্গিনী নয়। পরনে টু-পীস বিকিনি, শরীরের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণগুলো তাতে পুরোপুরি ঢাকা পড়েনি। হাতে বড় একটা সান হ্যাট, হাঁটার তালে তালে দোলাচ্ছে সেটা। সৈকতে শুয়ে আছে যারা, সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, দেখার মতোই ফিগার বটে মেয়েটার। কোমরের নিচে পর্যন্ত ঘন কাল একরাশ চুল তার অতিরিক্ত আকর্ষণ। হাঁটার ছন্দময় ভঙ্গিতে যৌবন যেন উথলে পড়ছে।

সাগরের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। এদিক ওদিক কোন দিকে না তাকিয়ে অবহেলা ভরে পিছন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সান হ্যাট, তারপর নিখুঁত ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। কয়েক সেকেণ্ড পরই বুঝল রানা, দক্ষ একজন সাঁতারু মেয়েটা। শ'খানেক গজ দূরে বিশাল একটা পাথর পানির ওপর মাথা তুলে আছে, সেটার ওপর উঠে বসল মেয়েটা। পানিতে পা ডুবিয়ে দিয়ে পাথরের গায়ে হেলান দিল সে। নির্জন পাথরের ওপর সাগরের রাণী বলে মনে হল তাকে। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করল রানা। মেয়েটার সঙ্গ পাবার লোভ অদম্য হয়ে উঠল ওর ভেতর। কখন যে বালির ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে ও, খেয়ালই নেই খানিক এগিয়ে নামল সাগরে। ধীর গতিতে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে বিশাল পাথরটার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে পানির নিচে ডুব দিল ও।

মেয়েটার কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে, পাথরের একেবারে কিনা-

রায় মাথা তুলল রানা। একদিকে কাত হয়ে বসে আছে মেয়েটা, ফলে উন্নত স্তনযুগল বিকিনির আবরণ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। পানির নিচে ডুব দেবার সময়ই দেখে ফেলেছিল রানাকে, জানত একেবারে কাছেই কোথাও মাথা তুলবে ও, কিন্তু ওর দিকে এতক্ষণে এই প্রথম সরাসরি তাকাল সে। মুখে হাসি নেই, তবে চোখের দৃষ্টিতে রাগেরও কোন লক্ষণ দেখল না রানা।

'অদ্ভুত নির্জন জায়গাটা, তাই না?' বাংলায় বলল রানা। 'আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো? বলুন, তাহলে আমি পাথরের ওপারে গিয়ে বসি।'

শান্তভাবে, চোখে কৌতূহল আর কৌতুক নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। তার এই সপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করে পরিষ্কার বুঝল রানা, বহু পুরুষের সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা রয়েছে এ-মেয়ের। চোখ দুটো শুধু যে অনুসন্ধিৎসু তাই নয়, দৃষ্টিতে অর্থপূর্ণ ভাষাও আছে।

'নিঃসঙ্গতাই বরং বিরক্ত করছিল আমাকে, বলে হাসল মেয়েটা। আশ্চর্য কামোত্তেজক কণ্ঠস্বর। খুব কম মেয়ের গলায় এই দুর্লভ গুণটি থাকে। 'আপনি···আপনাকে আগে তো কখনও দেখিনি? হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়লেন মনে হল?' রানার সুঠাম শরীরটা দেখে নিল আড়চোখে। প্রশংসার ভাব ফুটে উঠল দৃষ্টিতে।

'ডিউক, বাংলাদেশী,' মৃদু হেসে বলল রানা।

পাথরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েটা। ভাঁজ করল একটা হাঁটু। রানার বলার ভঙ্গি অনুকরণ করে বলল, 'কণিকা নন্দী, ভারতীয়। এখানেই থাকি।' চোখ বুঁজল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে, তারপর চোখ মেলে রানার মুখে তাকাল। 'নতুন চেহারা দেখতে পেলে

খুশি লাগে। বেশ কিছুদিন আছেন, নাকি ...?'

নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হল রানার। লনফিনের বাড়ির ভাড়াটে সুন্দরী নন্দীর বোনের সাথে এ ভাবে পরিচয় হয়ে যাবে, ভাবতেই পারেনি ও। কিন্তু সাথে সাথে শক্তিশালী লেন্সে রোদ লেগে ঝিক করে ওঠা আলোর প্রতিফলনটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। বাড়িটার সবচেয়ে উঁচু ঘরের জানালা থেকে ওর ওপর নজর রেখেছিল কেউ। হঠাৎ করে এই পরিচয়, এ কি সৌভাগ্য বয়ে এনেছে, নাকি ভয়ংকর কোন বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওর জন্যে?

ওয়াটারপ্রুফ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল রানা। 'বেশ কিছু দিন নয়, এই হপ্তাখানেক আছি আরো।' সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ও। 'আপনি ভাগ্যবতী।'

'কেন?' কৌতূহল ঝিলিক দিয়ে উঠল কণিকার চোখে।

'এই রকম সুন্দর জায়গায় বাস করেন।'

'ও' হেসে উঠল মেয়েটা। 'লনফিন নামে একজন বিখ্যাত জুয়াড়ী আছে, আমরা তার বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি।' একটু থেমে বলল, 'হংকং শহরকে নিয়ে একটা এই বড় বই লিখছে আমার দাদা। ওর দেখাশোনা করতে হয় আমাকে।'

কপাল কুঁচকে তাকাল রানা। 'কিন্তু আমার ধারণা ছিল, লনফিনের বাড়িট মীর শফিকুর রহমান ভাড়া নিয়েছিল।'

একটা ভুরু সামান্য একটু তুলে রানার দিকে তাকাল কণিকা। বিস্মিত হয়েছে, বোঝা গেল। 'মীর শফিকুর রহমান? আপনি তাকে চিনতেন?'

'চিনব না কেন, আমিও তো ঢাকার ছেলে।'

'নিশ্চয়ই জানেন. শফিক মারা গেছে?'

'শুনেছি। মোটর অ্যাক্সিডেন্ট। আপনার সাথে পরিচয় ছিল?'

'আপনি শফিককে চিনতেন শুনলে সুধীরদা সাংঘাতিক খুশি হবে,' বলল কণিকা। 'ওর সাথে শফিকের ভাল পরিচয় ছিল। আমিও দু'একবার দেখেছি তাকে, এক-আধটু আলাপও হয়েছিল, কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দু'জনের কেউই পাইনি। এভাবে হঠাৎ মারা গেল···চীনা বউটার জন্যে এটা একটা মারাত্মক আঘাত···'

'শফিকের স্ত্রীকেও চেনেন আপনি?'

'চিনি ঠিক বলা চলে না, দেখেছি আর কি।' একটু তাচ্ছিল্যের সাথেই বলল কণিকা। 'খুব সুন্দরী ছিল। আর সুন্দরী মেয়েদের মুঠোয় চলে গেলে যা হয়, শফিকেরও তাই হয়েছিল—সাংঘাতিক নিচে নেমে গিয়েছিল সে। শফিকের লাশ নিয়ে ঢাকায় গেছে সুজি, আর বোধহয় ফিরবে না। শুনেছি শফিকের বাবা নাকি কোটিপতি, কাজেই মনে হয় সুজিকে একেবারে পানিতে পড়তে হবে না।'

সুজি কোয়াও যে মারা গেছে সে-কথাটা আর বলল না রানা। সিগারেটে টান দিয়ে একটু একটু করে ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে বলল, 'শুনেছিলাম শফিক নাকি হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে স্ত্রীকে এক-রকম ত্যাগ করেই চলে আসে এদিকে। লনফিনের বাড়িটাও নাকি ভাড়া নিয়েছিল সে।'

'দূর! গাঁজাখুরী গল্প! এসব কথা কে বলেছে আপনাকে?'

'ব্যাপারটা তাহলে সত্যি নয়?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' উঠে বসল কণিকা। 'সুজির রোজগারে চলত শফিক, লনফিনের বাড়ি ভাড়া নেবার মত টাকা পাবে কোথায়? মরা লোক সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু তিক্ত সত্য হল,

মানুষ হিসেবে মোটেও ভাল ছিল না সে। এই সব আজগুবী কথা কে বলেছে আপনাকে বলুন তো ?'

হঠাৎ মোটর বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ, দু'জনেই সচকিত হয়ে উঠল। ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল, সাদা ফেনার V রচনা করে দ্রুত গতিতে একটা বোট ছুটে আসছে ওদেরই দিকে।

'সুধীর, আমার দাদা—দাদা বটে, কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টার ছোট বড় আমরা। একটু এদিক ওদিক হলে দিদি হয়ে যেতাম আমিই।' একটা হাত তুলে দাদার উদ্দেশে নাড়ল কণিকা।

আগেই বন্ধ হয়ে গেছে বোটের ইঞ্জিন, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বিশাল পাথরটার গায়ে ভিড়ল সেটা। প্রায় ছয় ফিট লম্বা সুধীর নন্দী, পরনে সাদা শর্টস, সবুজ ডোরা কাটা সাদা শার্ট। বোনের দিকে তাকিয়ে হাসল মৃদু। তারপর চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল রানার দিকে। মুখটা ভরাট কিন্তু নাক-নকশা ভাল, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। তবে চামড়ার নিচে নীল শিরা বাইরে থেকেও দেখা যায় —রানা অনুমান করল মদের নেশা একটু বেশিই করে লোকটা।

দাদার দৃষ্টির অর্থ ধরতে পেরে তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল কণিকা, 'সুধীর, ইনি ডিউক, বাংলাদেশী।' রানার দিকে ফিরে বলল, 'আমার ঘণ্টাদা. এক ঘণ্টার বড় কিনা, তাই ঘণ্টাদা বলে ডাকি —যদিও ওর নাম সুধীর নন্দী। জান সুধীর, শফিককে এই ভদ্রলোক চিনতেন।'

করমর্দন করল ওরা।

'শফিকের সাথে পরিচয় ছিল বুঝি ? শুনে খুশি হলাম।' বোনের দিকে ফিরল সুধীর। 'ডিউক সাহেবকে বাড়িতে ডেকেছিস ? আজ রাতে আমরা এক সাথে বসে খেতে পারি, কি বলিস ?' রানার দিকে

ফিরল সে। 'আপনার কোন অসুবিধে নেই তো? আমাদের বাবাও বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন, দেশ বিভাগের পরে ভারতে চলে আসেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কৌতূহল আছে আমার। চুটিয়ে গল্প করা যাবে, কি বলেন?'

এমন একটা ভাব দেখাল রানা, যেন এত করে যখন বলছেন, ঠিক আছে যাব।

'তাহলে ঠিক আটটার সময় বীচে চলে আসুন আপনি,' খুশি হয়ে উঠল সুধীর। 'বোট নিয়ে অপেক্ষা করব আমি। ডিনার শেষ করে আপনাকে নিয়ে একটু বেড়ানোও যাবে সাগরে। দেখবেন, খুব মজা লাগবে।' বোনের দিকে তাকাল সুধীর নন্দী। 'তোর ফিরতে দেরি আছে নাকি? আমার কিন্তু সাংঘাতিক ক্ষিদে পেয়েছে।'

রানার দিকে ফিরে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল কণিকা। তারপর সুধীরের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁ, ফিরব। কিন্তু টুপিটা ফেলে এসেছি, আগে তুমি আমাকে তীরে নিয়ে চল।' বিকিনি পরা শরীরে ঢেউ তুলে বোটে চড়ল সে। ঘাড় ফিরিয়ে আবার রানার দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে পরিষ্কার আমন্ত্রণ। ঠোঁটের দুই কোণ সামান্য একটু প্রসারিত করে সাড়া দিল রানা। গর্জে উঠল বোটের ইঞ্জিন। চলে গেল ওরা।

রাত ঠিক আটটায় সৈকতে পৌঁছুল রানা। সুধীরের বোট নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল এক চীনা যুবক, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে অনেক কষ্টে রানাকে বোঝাল সে, মিঃ নন্দী নিজে আসতে পারেননি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

লনফিনের বাড়ির শান বাঁধান ঘাটে পৌঁছুতে মাত্র পাঁচ মিনিট

লাগল ওদের। কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঁচু জমিতে উঠে এল রানা। সবুজ ঘাসের ওপর চেয়ার টেবিল সাজান হয়েছে। আরো কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে এল টেরেসে। সাদা রঙের ইভ-নিং ড্রেস পরেছে কণিকা। লোকাট ফ্রক, বুকের অনেকটাই অনাবৃত। বাঁশের তৈরি আরাম কেদারায় বসে হুইস্কির গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে, বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে সিগারেট। ওর পাশে, একটু পিছিয়ে, অন্ধকারের ভেতর হলুদ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে এক চীনা পরিচারক, হুকুমের অপেক্ষায়। আশপাশে কোথাও সুধী-রকে দেখতে পেল না রানা।

হাতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সিধে হয়ে বসল কণিকা। 'আসুন। বলুন, কি দেব আপনাকে?'

সামনের একটা আরাম কেদারায় বসল রানা। স্কচ আর সোডা চাইল। সাথে সাথে পরিবেশন করল চীনা পরিচারক।

'এখুনি এসে পড়বে সুধীর। আপনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন, আপনার চোখ দুটো ভারি সুন্দর।'

'ধন্যবাদ।' চাইনীজ স্টাইলে সাজান হয়েছে টেরেসটা। ফার্নি-চারগুলো সবই খুব দামী। দু দিকের দেয়ালে লাল সিল্কের পর্দা। মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড একটা ডাইনিং টেবিল ফেলা হয়েছে। ডিনা-রের জন্যে টেবিল সাজান হয়ে গেছে এরই মধ্যে। 'খুব সুন্দর জায়-গায় আছেন আপনারা,' কণিকার দিকে ফিরে বলল রানা।

'এই তো মাত্র কয়েক হপ্তা আগে এসেছি,' বলল কণিকা। 'এর আগে কাউলুনের একটা বাড়িতে ছিলাম। সেটাও মন্দ ছিল না, তবে এটার মতো নয়।'

'মাত্র কিছুদিন আগে এখানে এসেছেন? তার আগে কে ছিল

এখানে ?'

'কেউ ছিল বলে মনে হয় না। বাড়ির মালিক হঠাৎ এই সেদিন ঠিক করল, ভাড়া দেবে এটা। লোকটা এখানে থাকে না, ম্যাকাওয়ে তার ব্যবসা আছে।'

বাড়ির ভেতর থেকে এই সময় বেরিয়ে এল সুধীর নন্দী। হাসি মুখে করমর্দন করল ওরা। রানার সামনের আরেকটা চেয়ারে বসল সুধীর। চীনা পরিচারক তাকেও স্কচ আর সোডা নিয়ে এসে দিল। মামুলি কুশলাদি বিনিময়ের পর জানতে চাইল সে, 'আপনি কি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে হংকঙে বেড়াতে এসেছেন, মিঃ ডিউক ?'

'হপ্তাখানেকের ছুটি পেয়ে গেলাম, এই সুযোগে চলে এসেছি···'

'হংকঙ বলতে আমিও এককালে পাগল ছিলাম,' হেসে উঠে বলল সুধীর। 'তা, শফিককে নিশ্চয়ই খুব ভাল ভাবে চিনতেন ?'

'মীর মোখলেসুর রহমানকে ভালভাবে চিনি। আসার সময় তাঁর সাথে দেখা করেছিলাম. ভদ্রলোক বললেন, ছেলেটা কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করল, ওখানে কিভাবে চলাফেরা করত, ইত্যাদি ব্যাপারে যদি সম্ভব হয় তো একটু যেন খোঁজ-খবর করি।'

'আচ্ছা ?' বেশ অবাক দেখাল সুধীরকে। 'ঠিক কি কারণে এই ধরনের একটা অনুরোধ করলেন শফিকের বাবা ?'

'ছেলের সাথে তাঁর একটা ভুল বোঝাবুঝি প্রথম থেকেই ছিল,' বলল রানা। 'পাঁচ-ছয় বছর ছিল এখানে, চিঠি প্রায় লেখেনি বললেই চলে। ছেলে এখানে কি করত. কিভাবে চলত, সে-সম্পর্কে ভদ্রলোকের কোন ধারণাই নেই। তবে, বিয়ের খবরটা শফিক জানিয়েছিল। বুড়ো ভদ্রলোক খুব আঘাত পেয়েছিলেন। সম্ভবত মেয়েটা চীনা বলেই।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল সুধীর। বোনের দিকে একবার তাকাল। বলল, 'আঘাত তো পাবারই কথা।'

'এখানে কি করত শফিক তা বোধহয় বলতে পারবেন আপনারা ?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে সামান্য একটু হাসল সুধীর। 'ওর ব্যাপারে আমরা কেন, কেউই বিশেষ কিছু জানে না। বোধহয় বেকার থাকতেই ভালবাসত শফিক। ওকে আমি পছন্দ করতাম, ঠিক, কিন্তু আমার কাছে একটা রহস্য ছিল ও। নিজের সব কথা গোপন করে যাবার একটা প্রবণতা ছিল ওর মধ্যে। সেজন্যেই আমরা যারা বাঙালী আছি এখানে, তারা অনেকেই ভুল বুঝত ওকে।' ইঙ্গিতে কণিকাকে দেখাল সে। 'ও তো দেখতেই পারত না শফিককে।'

'দেখতে পারব না কেন।' গম্ভীর সুরে বলল কণিকা। ···ওর ধারণা ছিল, দেখা মাত্র সব মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে যায়। এই ধরনের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আমার একদম সহ্য হয় না।'

হো হো করে হেসে উঠল সুধীর নন্দী। 'ঠিক হ্যায়, মেনে নিলাম —তুই ওর প্রেমে পড়িসনি। কিন্তু যাই বলিস, শফিককে আমার ভালই লাগত।'

'কেউ তোমাকে আনন্দ দিলেই তাকে তোমার ভাল লেগে যায়···

চীনা পরিচারক কাছে এসে জানাল, ডিনার তৈরি। উঠে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল ওরা। চীনা স্টাইলে পরিবেশিত হলেও সমস্তই বাংলাদেশী খাবার। সুধীর ভাল বলিয়ে, নানা প্রসঙ্গে আলাপ করল রানার সাথে, কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে কণিকা। ডিনারের শেষ দিকে হঠাৎ মুখ তুলে জানতে চাইল সে, 'আচ্ছা, কথাটা আপনাকে কে বলেছিল বলুন তো ?'

'কি কথা ?' অবাক হয়ে তাকাল রানা।

'শফিক যে এই বাড়ি ভাড়া করেছিল···

'কি বললি ?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সুধীর। পরমুহূর্তে রানার দিকে তাকাল সে। 'কোত্থেকে শুনেছেন আপনি ?'

'একজন চীনা মেয়ের কাছ থেকে,' বলল রানা। 'মেয়েটার সাথে হোটেল কসমোপলিটানে পরিচয় হয় আমার। ওই হোটেলেই তো বউকে নিয়ে কিছুদিন ছিল শফিক।'

'এই রকম একটা ভিত্তিহীন কথা বলার কি মানে হতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না।' বিরক্তিতে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল কণিকার।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এ ধরনের একটা কথা কেন যে বলল আমিও বুঝতে পারছি না।' আরো কি বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু হঠাৎ মনে হল, কে যেন লক্ষ্য করছে ওকে। অলস ভঙ্গিতে টেরেসের চারদিকে তাকাল ও। ওর সামনেই বড় একটা আয়না, তাতে ওর পিছন দিকটাও দেখা যাচ্ছে। উঁচু জমির খানিকটা অংশ ধরা পড়েছে আয়নায়, সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। শরীরটা শক্ত-সমর্থ। পরনে স্যুট। আয়নার দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা, ফলে চোখাচোখি হল। উঁচু জমির অন্ধকার অংশে সরে গেল সে।

'আপনি তো নতুন এখানে, তাই জানেন না—হংকংয়ের চীনারা সাংঘাতিক মিথ্যেবাদী!' জ্ঞানদানের সুরে বলল কণিকা। 'বিশেষ করে চীনা মেয়েরা।' উঠে দাঁড়াল সে। রানার দিকে ফিরে বলল, 'চলুন, আমরা লনে গিয়ে বসি।'

সুধীরও উঠল। 'আমাকে কয়েকটা টেলিফোন করতে হবে।'

টেরেস থেকে উঁচু ফাঁকা জমিতে নেমে এল কণিকা আর রানা। ঘাসের ওপর আগেই চেয়ার পাতা ছিল, সেখানে বসল দু'জন।

মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। সাগরের পানিতে চিক চিক করছে চাঁদের আলো। ও'দের চারদিকে আবছা অন্ধকার, দূরের গাছগুলোকে ভূতুড়ে লাগছে। আশপাশে কোথাও কিছু নড়তে দেখল না রানা। লোকটা কি তাহলে চলে গেছে? কোথায় যেতে পারে? পিছন দিক দিয়ে বাড়ির ভেতর?

'নিন।' সম্বিত ফিরল রানার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, হুইস্কির গ্লাস ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করছে কণিকা।

হাতে গ্লাস নিয়ে শান বাঁধান ঘাটের ওপর এসে দাঁড়াল ওরা। চাঁদের আলোয় সাগরের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই চুপ করে আছে। অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল কণিকা। 'কতদিন হয় দেশের মুখ দেখিনি।'

'ফিরলেই পারেন,' বলল রানা।

'দেশে আছেই বা কে যে ফিরব।' উদাস গলায় বলল কণিকা। 'তাছাড়া, আমরা ভাই-বোন কেউ কাউকে ছেড়ে থাকিনি কখনও। আমি চলে গেলে সুধীরের অসুবিধে হবে।' খানিক পর প্রসঙ্গ বদলে দূর পাহাড়ের দিকে একটা হাত তুলল সে। 'দেখুন, চাঁদের আলোয় কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে ওদিকটা।'

এই রকম হঠাৎ হঠাৎ আরো কয়েকবার প্রসঙ্গ বদল করল কণিকা। কারণটা ঠিক বুঝতে না পারলেও, রানা বুঝল, যে-কোনো কারণেই হোক মনটা অস্থির হয়ে আছে কণিকার।

একটু পরই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুধীর। অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে ক্ষমা চেয়ে বোটে চড়ে সাগরে বেড়াবার প্রস্তাব দিল সে। ভাব দেখে মনে হল রানাকে নিয়ে সময়টা কাটাবার ইচ্ছে ছিল কণিকার, কিন্তু ভাইকে নিরাশ করা হবে বলেই সম্ভবত

মুখ ফুটে কিছু বলল না।

ড্রাইভারের সীটে বসল সুবীর। পিছনে পাশাপাশি বসল রানা আর কণিকা। ইঞ্জিনটা বড় বেশি আওয়াজ করে, তাই কথা বলার চেষ্টা করল না ওরা। দূর সাগরের দিকে চোখ রেখে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ল কণিকা। রানাও নিজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। পিয়া মিথ্যে কথা বলেছে, এখনও তা বিশ্বাস করতে পারছে না ও। ওর ধারণা, ঠিক খবরটা জানা নেই নন্দীদের, কিংবা এরাও হয়ত হোটেল কসমোপলিটানের সেই বুড়ো রিসেপ-শনিস্ট ক্লার্কের মতো মিথ্যে কথা বলছে। মিথ্যে কথা বলছে... কিন্তু কেন?

অদ্ভুত সুন্দর একটা গ্রাম এবারডীন। ঘাটের মুখে অসংখ্য ছোট বড় নৌকা আর মোটর বোটে গিজগিজ করছে, কাছে ঘেঁষা সম্ভবই নয়। চীনারা সপরিবারে বেড়াতে এসেছে। ঘাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে নোঙর ফেলল সুবীর। তেরো বছরের একটা চীনা কিশোরী তার সাম্পান নিয়ে দ্রুত চলে এল বোটের কাছে। সাম্পানে চড়ে তীরে পৌঁছুল ওরা। চাঁদের আলোয় আঁকা ছবির মতো লাগল গ্রামটাকে। মেঠো পথ ধরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল ওরা। ক্লান্তির অজুহাত তুলে ফেরার প্রস্তাব দিল কণিকা। আবার তীরে ফিরে এসে সাম্পানে চড়ল ওরা।

সাম্পানেও রানার পাশে বসল কণিকা। অনেকক্ষণ পর কথা বলল সে, 'এদিককার দ্বীপগুলোয় গেছেন কখনও?'

'না।'

'তাহলে বলুন, কাল আপনি সময় করতে পারবেন কিনা?' অন্তরঙ্গ সুরে বলল কণিকা। 'কাল আমি সিলভার-মাইন-বে-র এক-

জনের সাথে দেখা করতে যাব, ইচ্ছে করলে আমার সাথে যেতে পারেন। ওখানকার জলপ্রপাতটা ভারি সুন্দর, দেখলে ভুলতে পারবেন না। যাবেন নাকি? ইচ্ছে করলে আপনি আমার সাথেই ফিরতে পারেন।'

'আমার হাতে অঢেল সময়...

'সিলভার মাইন-বে-তে কার সাথে দেখা করতে যাবে কণিকা, জানেন, মিঃ ডিউক?' সকৌতুকে বলল সুধীর। 'সে এক ইতিহাস! আমার বোনের মনটা না সাংঘাতিক কোমল। শুনুন তাহলে। প্রথম যখন এখানে আসি আমরা, সে-সময় এক মহিলা আমাদের ঘর-দোর পরিষ্কারের কাজ করে দিত। এখন তার বয়স হয়েছে, সেই বুড়িকে মাসে একবার করে দেখতে যায় কণিকা, এটা সেটা দিয়েও আসে।'

বোটে চড়ল ওরা। ইঞ্জিনের আবার সেই বিকট আওয়াজ। আবার ওরা কথা বলার সুযোগ পেল নন্দীদের বাড়ির ঘাটে পৌঁছে। উষ্ণ আতিথেয়তা আর ডিনারের জন্যে ওদেরকে ধন্যবাদ জানাল রানা। নন্দীরাও জানাল, ডিউকের সঙ্গ লাভ করে তারা আনন্দ পেয়েছে। বিদায় নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল কণিকা। ঘাট থেকে আবার বোটে চড়ল ওরা। সুধীর পৌঁছে দেবে রানাকে সৈকতে।

সৈকত থেকে পায়ে হেঁটে রিপালস বে হোটেলে ফিরল রানা। সেই চীনা লোকটার মুখ এখনও ভুলতে পারেনি ও। বিশেষ সতর্কতার সাথে পিছনটা লক্ষ্য করল ও। কিন্তু ওকে কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হল না।

হোটেলে ফিরে এসে সরাসরি নিজের কামরায় গেল না রানা। দরজার দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ বসে থাকল বারে। কিন্তু আয়নার

দেখা সেই চেহারা নিয়ে বারে ঢুকল না কেউ।

নিজের ঘরে ফিরল রানা। না, কোন অবাঞ্ছিত অতিথি ওর জন্যে অপেক্ষা করছে না। কিন্তু তবু, ওর সহজাত অনুভূতি বলে দিল—রানা, সাবধান! সামনেই বিপদ!

আট

পরদিন সকাল দশটায় স্বরাষ্ট্র দফতরের বহিরাগত বিষয়ক একজন কর্মকর্তার সাথে দেখা করল রানা। ভদ্রলোক ব্রিটিশ. রানার সমস্যা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে রাজি হলেন না বটে, কিন্তু কার কাছে গেলে সাহায্য পাওয়া যাবে তার হদিশ জানিয়ে দিলেন। তেং ফান নামে একজন অফিসার আছে এই দফতরে. দীর্ঘদিন বসবাস করছে এমন বহিরাগতদের সম্পর্কে সে-ই নাকি সমস্ত খোঁজ-খবর রাখে।

বেলা এগারোটায় তেং ফানের সাথে দেখা করল রানা। লোকটার মাথায় চুলের কোন বালাই নেই, সবটাই চকচকে টাক। চোখ দুটো লাল, এবং কোটর থেকে ঝুলে আছে, মনে হয় একটু ঝাঁকি লাগলেই টপটপ করে ডেস্কের ওপর পড়ে যাবে। রানাকে বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখল সে। তবে নিজে বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল। অবশেষে পাওয়া গেল মীর শফিকুর রহমানের ফাইল।

ফাইলটা উল্টেপাল্টে দেখল তেং ফান। তারপর বলল, 'মিঃ শফিকের শেষ ঠিকানা ছিল হোটেল কসমোপলিটান। হংকঙে

আসার পর থেকে বরাবর ওই হোটেলেই ছিলেন। একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেন...'

'কি করত সে?'

ফাইলটা আবার একবার দেখে নিয়ে তেং ফান জানাল, 'হওকঙ এসেছিলেন এক্সপোর্টার হিসেবে, কিন্তু আমার ধারণা কোন কাজই আসলে করতেন না তিনি। অন্তত আমার এই ফাইলে কোন তথ্য নেই। চাকরি বা ব্যবসা করলে এখানে সেটার উল্লেখ থাকার কথা। বোধ হয় সাথে কিছু টাকা-পয়সা ছিল, তাই দিয়ে চলতেন। অথবা দেশ থেকে টাকা আসত।'

'কিন্তু আমি শুনেছি,' বলল রানা, 'হোটেল কসমোপলিটান ছেড়ে দিয়ে রিপালস উপসাগরের একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল শফিক। লনফিনের বাড়িটা চেনেন আপনি?'

ভুরু কুঁচকে ঝাড়া পাঁচ সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তেং ফান। তারপর বেশ একটু জোরেই হেসে উঠল। 'মিঃ শফিক লনফিনের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন? অসম্ভব! মাসে কম করেও ষোল শো পাউণ্ড ভাড়া ওটার, অত টাকা কোথায় পাবেন তিনি! বাড়িটায় এখন মিঃ নন্দী আছেন, তাঁর আগে ছিলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক...'

'ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন?' চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল রানার। 'ঠিক জানেন আপনি? কিন্তু আমি শুনেছি মিঃ নন্দী বাড়িটা ভাড়া নেবার আগে ওটা নাকি খালিই পড়ে ছিল?'

'আরে না! ওই ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকেই তো বাড়িটা নিয়েছেন মিঃ নন্দী। ভদ্রলোকের নামটা এই মুহূর্তে ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। তাকে অবশ্য আমি কখনও দেখিনি।'

'আরেকটা প্রশ্ন,' বলল রানা। 'চীনা মেয়েটাকে, মানে সুজি কোয়াওকে শফিক কি সত্যি বিয়ে করেছিল?'

'সেটা বলতে পারবে এখানকার কাজী অফিস,' তেং ফান ফাইলটা বন্ধ করে বলল। 'আপনাকে আমি কাজী অফিসের ঠিকানাটা জানিয়ে দিচ্ছি···

কাজী অফিসে চলে এল রানা। এক দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বিশাল বপু নিয়ে মস্ত এক চেয়ারে বসে আছেন, মাথায় সিল্কের কাপড়ের ওপর রঙচঙে রেশমী সুতোর নকশা করা টুপি। খুব কম কথা বলেন। রানার আগমনের হেতু জানার পর নিঃশব্দে একটা ফাইল বের করলেন। সেটা থেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা বের করে ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে।

সার্টিফিকেট দেখে কয়েকটা তথ্য জানতে পারল রানা। বছর খানেক আগে সুজি কোয়াওকে বিয়ে করেছিল শফিক। ওদের বিয়েতে সাক্ষী ছিল একজন বাঙালী লোক, এবং একজন চীনা মেয়ে। বাঙালী লোকটার নাম শহীদ আশরাফ। চীনা মেয়েটার নাম ইসি তাহি।

রানার প্রশ্নের উত্তরে কাজী সাহেব বললেন, 'এই বাঙালী ভদ্রলোক শহীদ আশরাফ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। সম্ভবত মিঃ শফিকের কোন বন্ধু হবেন। ভদ্রলোককে আগে বা পরে কখনও দেখিনি আর।'

'ইসি তাহি?'

'এর সম্পর্কেও আমি কিছু জানি না, মিঃ ডিউক। দুঃখিত। সাধারণত পরে আর সাক্ষীদের কোন দরকার হয় না, তাই ওদের ঠিকানা রাখার নিয়ম নেই।'

আর কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা। গাড়িতে ফিরে এসে সিগারেট ধরাল ও। সাক্ষী দু'জনকে খুঁজে বের করতে হবে। ইসি তাহি আর শহীদ আশরাফের সাথে কথা বলা দরকার। গাড়ি নিয়ে পুলিশ স্টেশনে চলে এল ও।

'শহীদ আশরাফ?' টোবাকো পাইপে কষে এক টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসন। 'এই লোকটাকে আপনি খুঁজছেন? কেন বলুন তো?'

'মীর শফিকুর রহমানের বিয়েতে একজন সাক্ষী ছিল সে। আপনি লোকটাকে চেনেন?'

'শুধু চিনি তাই নয়, ওকে আমরা গরু খোঁজা করছি,' গম্ভীর স্বরে বলল জ্যাসন। 'ও তো কুখ্যাত ড্রাগস স্মাগলার। ফাঁদ পেতে ধরার সব ব্যবস্থা শেষ করে এনেছি, এই সময় পালিয়ে গেল ব্যাটা। সম্ভবত ম্যাকাও বা ক্যান্টনে চলে গেছে সে

'ওসব জায়গায় খোঁজ করেননি?'

'ম্যাকাওতে খোঁজ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। আর সুযোগ সুবিধের অভাবে ক্যান্টনে আমরা তার কোন খোঁজই নিতে পারিনি।'

'শহীদ আশরাফ সত্যিই কি স্মাগলার? মানে, তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে?'

'বড় একটা চোরাচালানী দলের হয়ে কাজ করছে ও, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই,' দৃঢ়তার সাথে বলল চীফ ইন্সপেক্টর। 'ক্যান্টন থেকে প্রচুর হিরোইন পাচার করা হয় হঙকঙে। বড় একটা চালানের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমরা।' নিভে যাওয়া পাইপটা আবার

ফিরাল সে। 'ইনফর্মার জানাল, চলতি মাসের পয়লা তারিখে চালান আসছে। ফাঁদ পাতলাম আমরা, কিন্তু কিভাবে যেন আগেই টের পেয়ে গেল আশরাফ, পালিয়ে চলে গেল সে।'

'এ-মাসের এক তারিখে ··তার মানে, শফিকের মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগের ঘটনা।'

'হ্যাঁ···কিন্তু দুটো ঘটনার সাথে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।'

'তা আছে কিনা জানি না,' বলল রানা। 'আমি শুধু প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড় করছি।' সিগারেট ধরাল ও। 'আচ্ছা, ইসি তাহি নামে কোন মেয়েকে চেনেন? এই মেয়েটাও শফিকের বিয়েতে সাক্ষী হয়েছিল।'

'ইসি তাহি?' স্মরণ করার চেষ্টা করল জ্যাসন। 'না।'

'স্মাগলারদের সাথে শফিকের কোন রকম সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল কিনা বলতে পারেন?'

'ওর সম্পর্কে এ-লাইনে কখনও চিন্তা করিনি আমরা,' কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাসন। 'সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়। বিশেষ করে আশরাফের সাথে যখন বন্ধুত্ব ছিল।'

'হুঁ।' বিদায় নিয়ে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল রানা। গাড়ি নিয়ে চলে এল ওয়ানচাই সৈকত এলাকায়। এখানেই একটা বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টে মাদামের সাথে পরিচয় হয়েছিল ওর।

বারে ঢুকে ভেতরটা আজ একেবারে খালি দেখল রানা। স্কচ আর সোডা নিয়ে বসল ও। আধঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরও যখন দেখল মাদামের কোন চিহ্ন নেই, মনে মনে ঠিক করল অন্য আরেক সময় আসবে তার খোঁজে। ঠিক এই সময় দরজায় দেখা গেল মাদাম-

কে। রানাকে দেখে উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। সোজা এগিয়ে এসে ওর টেবিলেই বসল সে। 'আপনি আবার এসেছেন, সেজন্যে আমি খুব খুশি হয়েছি। আশা করি সেদিন মেয়েটার সঙ্গ পেয়েছিলেন…'

বাধা দিয়ে রানা বলল, 'আপনি আমাকে ঠকিয়েছিলেন। ওর নাম সুজি কোয়াও ছিল না…'

'সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী,' সবিনয়ে বলল মাদাম। 'কিন্তু সুজি কোয়াও না হোক, মেয়েটা দেখতে খারাপ ছিল তা আপনি বলতে পারবেন না।'

'যাক সেদিনের কথা আমি ভুলে গেছি,' বলল রানা। সিগারেট ধরাল ও। 'আজ অন্য আরেকটা মেয়ের খবর চাই আমি। লক্ষ্য করুন আমি সঙ্গ চাইছি না, খবর চাইছি। মেয়েটার নাম ইসি-তাহি। চেনেন? না চিনলে তাও বলুন—শুধু উত্তর দেবার জন্যে আপনাকে আমি পঞ্চাশ ডলার দেব।'

'আর যদি সন্ধ্যা-মাদের ইসি তাহিকে আপনার সামনে হাজির করতে পারি?' লোভে চক চক করে উঠল মাদামের চোখ দুটো।

'তাহলেও ওই পঞ্চাশ ডলার।'

গ্লাসের দুধটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল মাদাম। 'ঠিক আছে। ইসি তাহিকে পাবেন আপনি। আজ রাত আটটায়।'

'তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে ইসি তাহি।'

'করবে,' দৃঢ় কণ্ঠে কথাটা বলে চলে গেল মাদাম।

ফেরি-বোট। ফার্স্ট ক্লাস ডেক। রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে নিচে

পাশের কামরা

থার্ড ক্লাসের আরোহীদের বিশৃংখল ঠেলাঠেলি দেখছে রানা। লোয়ার ডেকে ওঠার জন্যে মারামারি হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে চীনারা। দেখার মতো একটা দৃশ্য বটে আরোহীদের ব্যস্ততা আর ছুটোছুটি দেখে মনে হয়, বোট বোধহয় এই ছেড়ে দিল আসলে বোট ছাড়তে এখনও পনের মিনিট বাকি। মিস্ত্রি আর কুলিরা কাঁধে, মাথায় বস্তা নিয়ে সার্কাস দেখাবার ভঙ্গিতে যেভাবে রেইলিং টপকাবার চেষ্টা চালাচ্ছে, দেখে মনে হয় ডেকে উঠতে না পারলে তাদের জীবনই বুঝি বৃথা হয়ে যাবে। গ্রাম্য প্রায় সব চীনা মেয়ের পিঠেই একটা করে বাচ্চা বাঁধা, ধাক্কাধাক্কির প্রতিযোগিতায় তারাও কারো চেয়ে কম যায় না। এক জোড়া সুন্দরী চীনা যুবতীকে দেখল রানা, দু'জনের কাঁধের মাঝখানে একটা বেতের ঝুড়ি ঝুলছে. তাতে বসে আছে একটা নাদুসনুদুস খাসী শুয়োর। তাদের সামনে রয়েছে একজন চীনা মা তার ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়ে বসে আছে পাঁচ-ছয় বছরের একটা ছেলে, পিঠে তো আরেকটা আছেই গোটা পাঁচেক প্রায় একই বয়সের শিশুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রেলিঙের দিকে। ভিড়ের একধারে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন চীনা পুলিশ. কোমরে বাঁধা হোলস্টারে হাত, প্রতিপালকসুলভ সহনশীলতার সাথে এই দৃশ্য অবলোকন করছে।

ঘাড় ফিরিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের সহযাত্রীদের দিকে তাকাল রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে একজন দু'জন করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কণিকাকে দেখা গেল না। হঠাৎ জেটির দিকে নজর পড়তেই ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। হাতে একটা ব্রীফ কেস নিয়ে জেটির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, পরনে কাল স্যুট, ফার্স্ট ক্লাস ডেকেই উঠতে যাচ্ছে। এই লোকটাকেই কি আয়নায় দেখেছিল ও, নন্দীদের বাড়ির

অন্ধকার লনে দাঁড়িয়ে ছিল ? তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। বছর চল্লিশেক বয়স হবে, বলিষ্ঠ শরীর। হাঁটার ভঙ্গিতে অ্যাথলেটের মতো স্বচ্ছন্দ একটা ভাব ফুটে আছে। আবছা অন্ধকারে দেখা চেহারাটা এখন আর পরিষ্কার স্মরণ নেই রানার, এই লোকটাই সেই লোকটা কিনা নিশ্চিত হতে পারল না ও। ওর পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল লোকটা। একটা সীটে বসে তাড়াতাড়ি মুখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে আড়াল করল নিজেকে।

বোট ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হাজির হল কণিকা। পরনে লাল পাড়ের হলুদ তাঁতের শাড়ি। হাতে একটা বেতের ঝুড়ি। পাশাপাশি সীটে বসল ওরা। শুরুতেই ভারত আর বাংলাদেশের রাজনীতি প্রসঙ্গ তুলল কণিকা, ব্যক্তিগত কোন প্রশ্নই তুলল না। অনেকক্ষণ আলাপ হল, কিন্তু শফিকের নামটা পর্যন্ত মুখে আনল না সে।

'পৌঁছে গেছি আমরা,' সিলভার-মাইন জেটিতে বোট ভিড়তেই সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কণিকা। ইশারায় হাতের ঝুড়িটা দেখিয়ে বলল, 'বুড়ির হাতে দিয়ে আসতে হবে এটা। এখানে ফিরব ঠিক দেড় ঘণ্টা পর। এই ফাঁকে জলপ্রপাতটা দেখে ফিরে আসতে পারবেন আপনি। তার মানে, এখানেই আবার দেখা হবে আমাদের।'

বোট থেকে নেমে পড়ল ওরা। জলপ্রপাতের পথটা দেখিয়ে দিল কণিকা। 'এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান, পথে বাটারফ্লাই পাহাড় পড়বে। তারপর একটা ব্রিজ। ব্রিজের ওপারেই ওয়াটারফল। সত্যি অদ্ভুত সুন্দর, দেখে মুগ্ধ হবেন।'

'এত সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা হয়ে গেছে যে আমাকে মুগ্ধ করা সত্যি কঠিন,' হালকা সুরে বলল রানা। 'তবু আপনি যখন এত করে বলছেন, চেষ্টা করে দেখা যাক একবার।'

মুখে একটু জোর করা হাসি টেনে বিদায় দিল কণিকা। তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। সেই চীনা লোকটার সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাল ও। কিন্তু লোকটা কখন যে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় চলে গেছে, বুঝতে পারল না।

বিশেষ কোন তাড়া নেই ওর, রোদের ভেতর দিয়ে ধীর পায়ে বাটারফ্লাই পাহাড়ের দিকে এগোল ও। মিনিট দশেক হেঁটে সাগর এলাকা ছাড়িয়ে এল। এদিকে পথটা একেবারে নির্জন, নিঝুম একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে সামনের দিকে চলে গেছে। গ্রামটা পেরিয়ে এসেই হঠাৎ ওর ডান দিকে দেখল বাটারফ্লাই পাহাড়। সামনে ধূ ধূ মাঠ পড়ে আছে।

জায়গাটা একেবারে নির্জন দেখে অবাকই হল রানা। জল-প্রপাতের আওয়াজ পাচ্ছে ও, অথচ পথে কোন লোক নেই। চীনারা বা বিদেশী ট্যুরিস্টরা এদিকে খুব কম আসে নাকি? জলপ্রপাতের কাছে চলে এল ও। কোথাও কোন লোকজন নেই। প্রপাতটা কিন্তু সত্যি সুন্দর। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল রানা। ঠিক করল, আরো কিছুটা সময় এখানে থাকা যেতে পারে। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। ঠিক এই সময় এল আক্রমণ।

প্রথমে মৌমাছির মতো একটা গুঞ্জন, বাতাসে শিস কেটে বিদ্যুৎ গতিতে কি যেন বেরিয়ে গেল কানের পাশ ঘেঁষে, পরমুহূর্তে কড়াৎ রাইফেলের আওয়াজ। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল রানা, দ্রুত গড়ান দিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এল মাটিতে। সাথে সাথে আবার গর্জে উঠল রাইফেল, ওর দু'গজ দূরে একরাশ ধুলো উড়ল। সেই ধুলোর ওপর দিয়েই গড়িয়ে রাস্তার ধারের উঁচু ঘাসের ভেতর চলে এল রানা। কিন্তু আবার শব্দ হল রাইফেলের। এবার অল্পের জন্যে বেঁচে গেল

রানা, মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট।

বিপদের প্রকৃতিটা ঠিক বুঝতে পারছে না রানা। পাহাড়ের ওপর থেকে গুলি করছে লোকটা? সাথে আর কেউ আছে? যদি থাকে, কোথায়? পাশে, নাকি উল্টো দিকে? এটা যে একটা সুপরিকল্পিত হামলা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে এখানে আসবে জেনে অপেক্ষা করছে রাইফেলধারী।

সারা শরীর ঘেমে গেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। ঘাসের ভেতর দিয়ে ক্রল করে এগোচ্ছে ও। মাথা নামিয়ে রেখেছে, মাটি ছুঁই ছুঁই করছে কপাল। বড় একটা পাথর পড়ল সামনে। সেটার আড়ালে চলে এসে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। অপেক্ষা করে দেখা যাক এরপর কি ঘটে।

আরো একটা গুলি হল। মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নেই। লোকটা যেই হোক, পাহাড় থেকে গুলি করছে সে। রাইফেলের সাথে নিশ্চয়ই টেলিস্কোপিক সাইট ফিট করা আছে। গুলির আওয়াজ শুনে অনুমান করা যায়, অন্তত সিকি মাইল দূর থেকে ফায়ার করছে সে।

পয়েন্ট থ্রি-এইটটা সাথে করে নিয়ে আসেনি বলে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। হাফ-শার্ট আর স্ল্যাকস পরেছে বলে ওটা আর সাথে করে নিয়ে আসা হয়নি। এখন আর ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে না ও। দ্রুত চিন্তা করছে। কোথায় রয়েছে ও, লোকটা জানে। করার মধ্যে এইটুকু করতে হবে তার; ও দেখা না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। পিছু হটে পালাবার কোন পথ আছে কিনা দেখার জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাথাটা একটু তুলল ও, তাকাল পিছন দিকে। কড়াৎ করে গর্জে উঠল রাইফেল। মাথা নিচু করে নিল রানা।

যা সন্দেহ করেছিল, তাই। রাইফেলধারী একজন নয়, দু'জন। কমপক্ষে দু'জন। শেষ গুলিটা এল রানার পিছনে বাম দিক থেকে। পেশ কাছেই রয়েছে দ্বিতীয় লোকটা।

পোশাক দেখেই ধরে নিতে পেরেছে তারা, ওর কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। দূরের গুলিগুলো ব্যর্থ হওয়ায় এখন তারা সামনে এসে গুলি করবে। এতক্ষণ বোধহয় রওনাও হয়ে গেছে।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। পাঁচটা বেজে বিশ মিনিট। জেটিতে ওকে দেখতে না পেয়ে কণিকা কি ওর খোঁজে এদিকে আসবে? ধরা যাক, আসবে। সে যদি এদের সামনে পড়ে যায়, ওর মতো তাকেও কি খুন করার চেষ্টা করবে তারা?

সন্তর্পণে ক্রল করে পাথরের কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল রানা। লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে সাপের মতো নিঃশব্দে নেমে আসছে পাহাড়ের নিচের দিকে। এভাবে পাঁচ মিনিট পিছিয়ে এল ও। আগের জায়গা থেকে প্রায় একশো ফিট সরে এসেছে। একটু একটু করে মাথা তুলে আগের জায়গাটা দেখার চেষ্টা করল ও। সাথে সাথে বাতাসে শিস কেটে, মুখের পাশ দিয়ে ছুটে গেল বুলেট, সেই সাথে শোনা গেল রাইফেলের আওয়াজ। আবার মাটিতে কপাল ঠেকাল রানা। এই প্রথম একটা শিরশিরে অনুভূতি জাগল শিরদাঁড়ার কাছে। ধীরে ধীরে একটা গড়ান দিতে শুরু করল ও। ভাগ্যিস শুরু করেছিল, তা না হলে লাশ হয়ে যেত ও। পুরো এক গড়ান দেয়া শেষ হয়নি, আগের জায়গায় একটা বুলেট এসে লাগল। আন্দাজ করে ছোঁড়া গুলি, কিন্তু ঠিক লক্ষ্যেই ভেদ করেছে—সরে গিয়েছিল বলে বেঁচে গেল রানা।

আরো খানিক ডান দিকে সরে এল ও। লম্বা ঘাসের শেষসীমা-

নায় চলে এসেছে বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। আর মাত্র চারফিট সামনে উন্মুক্ত পাথুরে জমি, খানিক দূর সমতল বটে, কিন্তু তারপর হঠাৎ ডেবে গিয়ে একটা ঢালের সাথে মিশেছে। ঢালটা প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে, সম্ভবত পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে নিচের উপত্যকায়।

নিঃসাড় পড়ে আছে রানা। কান দুটো সজাগ। কিন্তু কোথাও কোন শব্দ নেই। কি ঘটছে দেখারও কোন উপায় নেই। মাথা না তুলে দেখবে কিভাবে?

একটা কান মাটির সাথে সেঁটে রাখল ও। কয়েক মিনিট কিছুই শুনতে পেল না, কিন্তু তারপরই পরিষ্কার আওয়াজ পেল। আন্দাজ পনের কি বিশ গজ দূরে, ওর বাম দিকে রয়েছে লোকটা। লম্বা ঘাসের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। এখন আর নিঃসাড় পড়ে থাকার উপায় নেই। কিছু একটা করা দরকার ওর। তা না হলে সোজা ওর ঘাড়ে এসে পড়বে লোকটা।

ঠিক কোথায় আছে লোকটা, বুঝতে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু সঠিকভাবে তা বোঝা সম্ভব নয়। তবে অন্তত এইটুকু জানে ও, কোন্ দিক থেকে আসছে সে। ইতি কর্তব্য স্থির করতে প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড সময় নিল ও। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সটান, দ্রুত লাফ দিল প্রথমে ডান দিকে তারপর বাঁ দিকে। প্রথম লাফটা শুধু দিয়েছে রানা, খেয়াল করল, গুলির শব্দ হল দূরে। কয়েক গজ দূর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। দ্বিতীয় লাফটা দেয়ার আগেই, মাত্র ছয় ফিট দূরে, ঘাসের ভেতর ক্ষীণ একটা নড়াচড়া দেখতে পেল ও। দ্বিতীয় লাফের সাথেই ছুটল সেদিকে।

ব্রু রঙের কোট আর ট্রাউজার পরা একজন চীনা, মাথায় সুতী কাপড়ের টুপি, ঘাসের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রানার মুখের

ওপর হাসল। লোকটা বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা, শক্ত-পোক্ত শরীর। তার হাতে ধরা ছুরির ফলাটা ঝিক্ করে উঠল রোদ লেগে। উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু তাকে স্থির হবার কোন সুযোগই দিল না রানা। ডাইভ দিয়ে পড়ল ও, একটা হাত বাড়াল তার গলার দিকে, অপরটা ছুরি ধরা হাতের কব্জির দিকে।

লোকটাকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল রানা, শক্ত মাটির উপর দড়াম করে পড়ে গেল দু'জনে। লোকটার কব্জি আর গলা আগেই ধরে ফেলেছে রানা। ওর চোখের ভেতর আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু তার নাকের ওপর হাতুড়ির বাড়ির মতো বার কয়েক কপাল ঠুকতেই ক্ষান্ত হল সে। ছুরিটা হাত থেকে কেড়ে নিল রানা। দমাদম কয়েকটা ঘুঁসি চালাল তার পেটে। গোঙাতে শুরু করল লোকটা। শত্রু কিছুটা কাবু হতেই দু'হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরল রানা। শরীরটা রানার নিচে মোচড় খেতে শুরু করল, কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না সেটা। বিস্ফারিত চোখ জোড়া একটু পরই স্থির হয়ে গেল। গড়িয়ে তার ওপর থেকে নেমে পড়ল রানা। একটু একটু হাঁপাচ্ছে ও। মাথা তুলে পাহাড়ের দিকে তাকাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। প্রথম লোকটা বোধহয় পাহাড় থেকে নেমে আসতে শুরু করেছে। কিছুটা ফাঁকা মত জায়গায় সরে গেল রানা, অজ্ঞান লোকটাকে মাটিতে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল সাথে।

জ্ঞান ফিরে আসছে চীনাম্যানের। একটু নড়ে উঠতেই রানা ওর দিকে মনোযোগ দিতে যাবে, এমনি সময় এক লাফে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ধস্তাধস্তির সময় মাথার টুপিটা পড়ে গেছে। সেই জন্যেই চিনতে পারল না ওকে প্রথম জন। একটা রাইফেলের আওয়াজ হল। সাথে সাথে চীনাম্যানের মুখটা রক্তের একটা লাল মুখোশ

হয়ে গেল। দড়াম করে আছড়ে পড়ল লাশটা ঘাসের ওপর। ক্রল করে পনের ফিট পিছিয়ে এল রানা।

এখন শুধু অপেক্ষা। মাঝে মধ্যে মাটিতে কান পাতছে সে। কোন শব্দ নেই। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হল। ছ'টা বেজে পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেল। এতক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল স্নাইপার।

যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আর বেপরোয়া ভাব নিয়ে নেমে এল লোকটা। ধরেই নিয়েছে প্রতিপক্ষ মারা গেছে, অথবা, অন্তত ক্ষতি করার সাধ্য তার নেই। সামনের ঘাস সামান্য একটু ফাঁক করে পাহাড়ের বেশ খানিকটা অংশ দেখতে পেল রানা, ওদিক থেকেই শেষ গুলিটা এসেছিল। দ্রুত, হন হন করে নেমে আসছে লোকটা। রাইফেলটা বগলে। আরো কাছে চলে এল সে। মনের সন্দেহটাই সত্যি হল। বছর চল্লিশেক বয়স হবে, বলিষ্ঠ গড়ন, লোহার মতো শক্ত শরীর। এই লোকটাকেই নন্দীদের বাড়ির আয়নায় দেখেছিল রানা। আজ রানার সাথেই এসেছে বোটে করে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্রুত কয়েকটা কথা ভেবে নিল রানা। এই নির্জন দ্বীপে আসার প্রস্তাবটা এসেছিল কণিকার তরফ থেকে। নন্দীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ওকে। এই লোকটা সেখানে ছিল ওকে দেখে চিনে নেবার জন্যে। তার মানে এটা একটা সুপরিকল্পিত ফাঁদ। ওকে জীবিত ফিরতে দেবার কোন ইচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীদের নেই।

যে গতিতে এগিয়ে আসছে লোকটা, পৌঁছুতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না তার। গড়ান দিয়ে পিছিয়ে এল রানা। ছুরিটা তুলে নিল লাশের পাশ থেকে। লম্বা ঘাসের ভেতর কোথায় পড়ে আছে

রাইফেলটা, দ্রুত মাত্র একবার খোঁজার সময় পেল রানা, কিন্তু পাওয়া গেল না সেটা। রাইফেলের বদলে বড় আকারের একটা পাথর পেল ও। সেটাও তুলে নিল হাতে। তারপর সরে গেল বেশ কিছুটা ডাইনে।

মেঠো পথের ওপর চলে এসেছে লোকটা। হাঁটার গতি আগের চেয়ে অনেক মন্থর। তার আর রানার মাঝখানে গজ বিশেক উঁচু ঘাসের ব্যবধান। রানার কাছে আসার আগে নিজের সঙ্গীর লাশের কাছে আসতে হবে তাকে।

মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে আছে রানা। ডান হাতে পাথর, বাঁ হাতে ছুরি।

আঁতকে ওঠার মৃদু আওয়াজ পেল রানা। সাবধানে মাথাটা একটু তুলল ও। সঙ্গীর লাশ দেখতে পেয়েছে লোকটা। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে, তারপর ঝট্ করে মাথা তুলল সে। পরস্পরের চোখে তাকাল ওরা। বগল থেকে পিছলে নেমে এল রাইফেল লোকটার হাতে। রানাও পাথর ছুঁড়ল, সে-ও ট্রিগার টিপে দিল। ছুটে গিয়ে লাগল বটে পাথরটা, কিন্তু তাতে পুরোপুরি লক্ষ্যচ্যুত হল না বুলেট। রানার কাঁধের খানিকটা চামড়া ছিলে নিয়ে গেল। পাথরের ছুঁচালো দিকটা লোকটার ডান হাতের কোথাও গিয়ে বিঁধেছে, ব্যথায় কুঁচকে উঠেছে ওর মুখ, হাত থেকে পড়ে গেল রাইফেল। ঝুঁকে পড়ে আবার সেটা তুলতে যাচ্ছে সে, এই সময় চিতা বাঘের গতিতে তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা।

রানাকে উড়ে আসতে দেখে শরীরের একটা পাশ দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করল সে। নিরেট পাথরের একটা দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল যেন রানা। পা দুটো ফাঁক করে নিয়েছিল লোকটা, ধাক্কাটা যাতে

সামলাতে পারে। বিদ্যুৎ গতিতে উঠে এল একটা হাত, লোহার মতো শক্ত আঙুল দিয়ে রানার কব্জি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে। শূন্যে এক পাক ডিগবাজী খেয়ে লোকটার মাথার ওপর দিয়ে ওপারে গিয়ে দড়াম করে শক্ত মাটিতে পড়ল রানা। মাটির সাথে সংঘর্ষে দম আটকে এল ওর। অনুভব করল, ছুরিটা খসে গেছে হাত থেকে। সেই সাথে বুঝল, পাহাড়ের সাইডে পড়েছে ও, ঢালের ওপর। হাত পা ঢিল করে দিয়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল, সাথে সাথে দ্রুত গতিতে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। কিন্তু একই সময়ে শব্দ শুনে বুঝল, লোকটাও ওর গড়িয়ে পড়া শরীরটাকে ধাওয়া করে ছুটে নেমে আসছে। প্রায় পঞ্চাশ গজের মতো নেমে এসে নরম মাটির স্পর্শ অনুভব করল রানা। পায়ের আঙুল মাটিতে গেঁথে শরীরটাকে থামাল ও। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, মাথা ঘুরছে, হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। মাথা একটু তুলতেই লোকটাকে দেখতে পেল। বড়সড় মুখে শব্দহীন নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটে রয়েছে। কিন্তু হাতে রাইফেল নেই।

ঢালের নিচের দিকে রয়েছে রানা, ওর জন্যে এটা একটা মস্ত বেকায়দা অবস্থা। তবে, রানা উঠে দাঁড়াবার আগেই পৌঁছে যাবে মনে করে লোকটা ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে, এখন আর গতি রুদ্ধ বা মন্থর করার কোন উপায় নেই তার। ঠিক এক সেকেণ্ড আগে উঠে দাঁড়াল রানা, সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে স্যাঁৎ করে সরে গেল এক পাশে। পাশ ঘেঁষে ছুটে যাবার আগে রানাকে ধরার চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার বাঁকা আঙুলগুলো রানার কনুইয়ের ওপর থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল। বিদ্যুৎ গতিতে পিছন ফিরল রানা, ঝেড়ে একটা লাথি বসাল লোকটার চওড়া পিঠের ঠিক মাঝখানে, শির-

দাঁড়ার ওপর। ছোটার গতি তিন গুণ বেড়ে গেল লোকটার, তাল হারিয়ে ফেলল, মুখ থুবড়ে পড়ল মাটির ওপর। সের তিনেক ওজনের আরেকটা পাথর দেখতে পেয়ে তুলে নিল রানা, প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে। ঘাড়ের ওপর মাথার পিছন দিকটায় লাগল সেটা, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল সাথে সাথে। ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে শরীরটা, হাত-পা ছুঁড়ছে এলোপাথাড়ি।

একটু দম নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। জানে, লোকটা আর কখনও ওকে বিরক্ত করবে না। সিলভার-মাইন জেটির দিকে এগোল ও।

নয়

ওয়ান চাই সৈকতের বারে ঠিক আটটায় পৌঁছুল রানা। নানা দেশের খালাসীদের ভিড়ে গিজ গিজ করছে ভেতরটা। প্রায় সবার সাথেই একটা করে চীনা ললনা রয়েছে। নাচছে তা ঠিক বলা যায় না, দল বেঁধে হুল্লোড় করছে বলাই ভাল। হৈ চৈ আর ছুটোছুটির সাথে তাল দিয়ে বাজছে ইংরেজী মিউজিক। এই ভিড়ের মধ্যে মাদামকে কিভাবে খুঁজে বের করা যায় ভাবছে রানা, এই সময় ওর সামনে এসে দাঁড়াল একটা হাসি মুখ। রানাকে পথ দেখিয়ে একটা খালি কেবিনে নিয়ে এল মাদাম। সে-ই অর্ডার দিল—রানার জন্যে স্কচ হুইস্কি, নিজের জন্যে দুধ।

'একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' ওয়েটার চলে যেতে চিন্তিতভাবে বলল মাদাম। 'আপনাকে সঙ্গ দিতে ইসি তাহির কোন আপত্তি

হবে, কিন্তু সে আপনার সাথে তার ফ্ল্যাটে দেখা করবে।'

আরেকটা ফাঁদ? মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল রানার। বিকেলের ঘটনাটা ওকে শুধু যে সতর্ক করে দিয়েছে তাই নয়, একটু ভয়ও পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় শাওয়ার সেরে, দাড়ি কামিয়ে, কাঁধে ব্যাগেজ বেঁধে নিজের হোটেল রুম থেকে বেরুবার আগে পয়েন্ট থ্রি-এইটটা সাথে নিতে ভুল করেনি ও। আলতো ভাবে চাপ দিয়ে সেটার অস্তিত্ব আরেকবার অনুভব করল ও। 'কোথায় যেতে হবে আমাকে?'

'কাছেই। আমি ট্যাক্সি ডেকে বলে দেব ড্রাইভারকে।'

'কিন্তু জানব কিভাবে মেয়েটা ইসি তাহি কিনা?'

'ওর সাথে পরিচয় পত্র আছে।'

খানিক চিন্তা করে রাজি হয়ে গেল রানা। 'ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে টাকা দেবার আগে আমাকে বুঝতে হবে মেয়েটা ইসি তাহি কিনা

'বেশ,' শর্তটা মেনে নিল মাদাম। 'চলুন তাহলে, আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিই। টপ ফ্লোরে থাকে ইসি তাহি, দরজায় নেম-প্লেট আছে।'

বাইরে বেশ গরম। স্ট্যাণ্ডে অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রানাকে পিছনে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল মাদাম। একজন ড্রাইভারের সাথে চাপা গলায় কথা বলল। সম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করল ড্রাইভার। রানার দিকে ফিরল মাদাম। 'উঠে পড়ুন, ড্রাইভার আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।'

রানার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুচকি একটু হাসল ড্রাইভার। হাসি মুখে রানার পিঠ চাপড়ে দিয়ে অভয় দিল মাদাম, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল বারের ভেতর। গম্ভীর চেহারা নিয়ে

ট্যাক্সিতে চড়ল রানা। ড্রাইভার ওর গাম্ভীর্যের তাৎপর্য বুঝতে পেরেই সম্ভবত কোন রকম আলাপ জমাবার চেষ্টা করল না।

মাত্র ছয় মিনিটের পথ। একটা জুয়েলারী দোকানের সামনে থামল ট্যাক্সি। রানাকে দোকানের পাশের একটা গেট দেখিয়ে দিল ড্রাইভার। নিচে নেমে ভাড়ার সাথে মোটা টিপস্ দিল রানা। ড্রাইভারের চেহারায় বিস্ময় এবং আনন্দ ফুটে উঠতে দেখেও গাম্ভীর্যের মুখোশটা একটু বদলাল না রানার মুখে। ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল ও, গেটের দিকে এগোবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না ওর মধ্যে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার স্টার্ট দিল ড্রাইভার; ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল সেটাকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। রাস্তায় এবং ফুটপাথে প্রচুর মানুষ আর যানবাহনের ভিড়। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। কেউ রানার ওপর নজর রেখেছে কিনা বলা কঠিন। তবু চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে গেটের ভেতর ঢুকল সে। সামনেই সিঁড়ি, তার পাশে এলিভেটর। এলিভেটরে চড়ে টপ ফ্লোরে উঠে এল ও।

ল্যাণ্ডিঙের দু দিকে দুটো দরজা। একটার মাথায় ছোট ছোট লাল রঙের হরফে লেখা নাম-ফলক—ইসি ভাডি। কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল রানা।

প্রায় সাথে সাথে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল একটা সুন্দরী চীনা মেয়ে। বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স। পরনে ক্রীম কালারের সিল্কের ব্লাউজ, ধূসর রঙের গাউন, পায়ে হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি স্যাণ্ডেল। একরাশ কালো চুল খোঁপা করে বাঁধা, পিছন দিকে তাজা দুটো গোলাপ গুঁজেছে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'মাদাম পাঠিয়েছে আমাকে, আমি ডিউক,' বলল রানা।

মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত দেখা গেল মেয়েটার। হাসিটা আরো সুন্দর। 'আসুন, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

বসার ঘরটা মাঝারী আকারের। হাল্কা, কিন্তু আধুনিক ফার্ণিচার দিয়ে সাজানো। জানালার বাইরে সাগর দেখা যাচ্ছে, টিম টিম জ্বলছে সাম্পানের আলো। দরজা বন্ধ করে ঘুরল মেয়েটা। ধীর পায়ে এগিয়ে এল রানার দিকে। হাঁটার মধ্যে কোনরকম জড়তা নেই। মুখের হাবভাবও বেশ সপ্রতিভ।

'তুমি কে?' জানতে চাইল রানা। 'তোমার নাম কি?'

'ইসি তাহি।' রানার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা, হাত দুটো ভাঁজ করে রাখল বুকের ওপর।

'প্রমাণ?'

ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে উঠলেও প্রশ্নটা শুনে খুব যে অবাক হয়েছে তা মনে হল না রানার। মাদাম বোধহয় আগেই সাবধান করে বলে দিয়েছে, এ-ধরনের প্রশ্ন হতে পারে।

ইঙ্গিতে টেবিলের দেরাজটা দেখাল মেয়েটা। 'ওখানে আমার পরিচয়-পত্র আছে। কিন্তু ওগুলো বের করার দরকার আছে কি? আমার মুখের কথাই কি যথেষ্ট নয়?'

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দেরাজটা খুলল রানা। ভেতরে একটা এনভেলাপ রয়েছে। এনভেলাপের ভেতর থেকে কাগজগুলো বের করে পরীক্ষা করল ও। ইসি তাহি হঙকঙে এসেছে বছর পাঁচেক আগে। বয়স চব্বিশ। পেশা—নর্তকী। কাগজগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে মেয়েটার দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসল রানা। সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইল, 'আমি তোমার সঙ্গ পাবার জন্যে আসিনি। এসেছি কিছু তথ্য জানার জন্যে। অবশ্য তোমার যা পাওনা তার

চেয়ে কিছু বেশিই দেব আমি, কিন্তু তথ্যগুলো নির্ভুল হওয়া চাই।'

এবার নির্ভেজাল বিস্ময় ফুটে উঠল মেয়েটার চেহারায়। 'তথ্য?'

'তুমি মীর শফিকুর রহমান্ নামে কাউকে চেন?'

'এই নামের একজন মারা গেছে, আপনি তার কথা জানতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'চিনতাম। কেন?'

'ওর স্ত্রী, সুজি কোয়াওকে?'

'অবশ্যই। সুজি আমার একমাত্র বান্ধবী। ওদের বিয়েতে সাক্ষী ছিলাম আমি। কিন্তু এ সব প্রশ্ন...'

'বলতে পার, হঙকঙে কি কাজ করত শফিক? তার চলতো কিভাবে?'

ম্লান হয়ে গেল ইসি তাহির চেহারা। তারপর মুখ তুলে মৃদু গলায় বলল, 'বেচারী সুজির কপালটাই মন্দ। দেখেশুনে এমন একটা বিদেশী লোককে বিয়ে করল, যে স্ত্রীর রোজগারে খেয়ে পরে বাঁচতে চায়। সুজি বলত বটে শফিক নাকি বিরাট ধনী লোকের একমাত্র ছেলে, কিন্তু আমি কথাটা কোন দিন বিশ্বাস করিনি। ভিখিরী ছাড়া কিছুই মনে হত না ওকে আমার।'

'আচ্ছা, আমি শুনেছি, শফিক নাকি ড্রাগস স্মাগলিঙের ব্যাপারে জড়িত ছিল,' মৃদু গলায়, হাল্কা সুরে বলল রানা। 'তুমি কিছু শুনেছ?'

শিউরে উঠল মেয়েটা। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকাল রানার দিকে। অনেকক্ষণ পর বলল, 'স্মাগলার, স্মাগলিঙ এসব ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এসব ব্যাপারে আমি কোন খবর রাখি না।'

'আমাকে ভুল বুঝছ তুমি,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'তুমি এ-সবের সাথে জড়িত, তা আমি বলছি না। আচ্ছা, তুমি জান, ক্যান্টন থেকে প্রচুর হিরোইন চালান দেয়া হয় হংকঙে?'

'না।' জোর গলায়, প্রতিবাদের সুরে বলল ইসি তাহি। 'জানি না।'

'শহীদ আশরাফকে চেন তুমি, তাই না?' চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল রানার। 'সে কিন্তু এই চোরাচালানের সাথে জড়িত, জান নিশ্চয়ই?'

'না।' পরমুহূর্তে রানার চোখে চোখ রেখে কি যেন খুঁজল ইসি তাহি। 'শহীদ আশরাফ? হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু তাকে আমি একবার মাত্র দেখেছি সুজির বিয়েতে।'

'শফিকের বন্ধু ছিল, নাকি সুজির?'

'সুজির বন্ধু? মনে হয় না। শফিকের সাথে কি সম্পর্ক ছিল তাও আমি জানি না।

'রিপালস্ উপসাগরের কাছে একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল শফিক, জান?'

'রিপালস্ উপসাগরের কাছে বড় বাড়ি?'

'হ্যাঁ। লনফিনের বাড়িটা। ওমপও পিয়ার কাছ থেকে শুনেছি আমি।'

হঠাৎ তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল ইসি তাহি। 'হাসালেন। আগেই তো বললাম শফিক একটা ভিখিরী ছিল, লনফিনের বাড়ি ভাড়া নেবে কোত্থেকে। বিয়ের পর হোটেল কসমোপলিটানে ছিল সে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিল।'

লনফিনের বাড়ি ভাড়া নেয়নি শফিক, সবাই এই একই কথা

বলছে, শুধু ওমপণ্ড পিয়া ছাড়া। তবে কি সবাই সত্যি কথা বলছে, শুধু মিথ্যে কথা বলেছে পিয়া? ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না রানা।

জানতে চাইল, 'সুজি কোথাও তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, ওর সম্পর্কে যা জান সব বল আমাকে।'

'ও তো ঢাকায় চলে গেছে। বলে গেছে চিঠি দেবে…

'তার মানে, খবরটা পাওনি তুমি?'

ভুরু কুঁচকে উঠল ইসি তাহির। 'কি খবর?'

'সুজি কোথাও বেঁচে নেই। তাকে খুন করা হয়েছে।'

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল ইসি তাহির চেহারা। 'অসম্ভব আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। খুন…অসম্ভব। কেন

'কেন, তা জানি না। তবে জানার জন্যেই হন্তদন্ত হয়ে এসেছি।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ইসি তাহির। বান্ধবীর মৃত্যু সংবাদ শুনে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে সে। মুখটা ঝুলে পড়ল। এখন আর মেয়েটাকে সুন্দরী লাগছে না। প্রিয়জন হারাবার শোক সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে তার ভেতর থেকে উঠে আসছে একটা অদম্য কান্না। দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'তুমি চাও না সুজির খুনী ধরা পড়ুক?' মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা।

'আপনি চলে যান।' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'আমাকে একটু একা থাকতে দিন, প্লীজ!'

আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। 'শান্ত হও। একমাত্র তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পার। সুজি সম্পর্কে যা জান সব বল আমাকে…'

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল মেয়েটা, ছুটে চলে গেল পাশের কামরায়। দ্রুত এগোল রানা, কিন্তু তার আগেই দড়াম করে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

বন্ধ দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। কয়েকবার অনুরোধ করল, কিন্তু ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ এল না।

অগত্যা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল রানা। একটু শব্দ করেই সামনের দরজাটা বন্ধ করল ও। এলিভেটরে চড়ল। নেমে এল নিচের তালায়। তারপর কয়েক পা হেঁটে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর একটা আওয়াজ পেল রানা। ইসি তাহির ফ্ল্যাটের সামনের দরজা খুলল কেউ, একটু পর আবার সেটা বন্ধ হল। কয়েক সেকেণ্ড আর কোন শব্দ নেই। নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল রানা। ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে ইসি তাহির দরজায় কান পাতল। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাবার আওয়াজ পেল ও। তারপর শোনা গেল চাপা গলা। খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছে ইসি তাহি। কি বলছে বুঝতে পারল না রানা।

এলিভেটরে চড়ে নিচে নেমে এল রানা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকারণ্যে মিশে গিয়ে রাস্তা পেরোল ও। রাস্তার এপারে সার সার দোকান, শো-কেসের ভেতর সাজান রয়েছে অলংকার থেকে শুরু করে সব রকম মণিহারী জিনিস। এই রকম একটা শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের বাড়িটার ওপর নজর রাখল ও। আন্দাজের ওপর ভরসা করে অপেক্ষা করছে। ওর সন্দেহ সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু মিনিট দশেক পর বাড়ির

গেটে ইসি তাহিকে দেখে সন্দেহের মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল ওর।

গেট থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় লাফ দিয়ে একটা রিক্সায় চড়ল ইসি তাহি। রাস্তার এপার থেকে রানাও একটা রিক্সা নিল। নানা রাস্তা ঘুরে সামনের রিক্সা একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে থামল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ল ইসি তাহি। একটু পিছনে থেকে রানাও ঠিক তাই করল।

স্টার ফেরী স্টেশনে এসে থামল সামনের ট্যাক্সি। নিজের ট্যাক্সিতে বসেই রানা দেখল, ফেরীর তৃতীয় শ্রেণীতে উঠল ইসি তাহি। ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ঘাটে চলে এল রানা, প্রথম শ্রেণীর টিকেট কেটে উঠে পড়ল ফেরীতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাউলুন সিটি জেটিতে পৌছুল ফেরী বোট। জায়গাটা কাই তাক এয়ারপোর্টের কাছেই।

ফেরী থেকে নেমে রিক্সা নিল ইসি তাহি। রানার দুর্ভাগ্য, স্ট্যাণ্ডে পৌছে একটাও খালি রিক্সা পেল না ও। সবে মাত্র ঘাটে ভিড়েছে ফেরী বোট, ঠিক এই সময়টায় কোন রিক্সা খালি থাকার কথাও নয়। অগত্যা ছুটতে শুরু করল রানা। এরই মধ্যে চোখের প্রায় আড়ালে চলে গেছে ইসি তাহির রিক্সা।

ফুটপাথে তিল ধারণের জায়গা নেই, তার মধ্যে একজন লোক যদি কোথায় পা ফেলছে সেদিকে কোন খেয়াল না রেখে ছুটতে শুরু করে, তাহলে কি ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। রানার কাঁধের ধাক্কা খেয়ে পথচারীরা অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কেউ থেঁতলান পা ধরে কাতরাতে শুরু করল, কেউ পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ককিয়ে উঠল। কিন্তু রেগেমেগে কেউই ধাওয়া করল না রানাকে। একজন বিদেশী লোক ছুটছে, ব্যাপারটা কৌতুক-

কয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক বলেই মনে হল তাদের কাছে। কেউ কেউ যে ওকে উন্মাদ বলে মনে করল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

একটা রাস্তার মুখে এসে থামল ইসি তাহির রিক্সা। রাস্তা ধরে হন হন করে এগোল ইসি তাহি। তারপর সঁ্যাৎ করে ঢুকে পড়ল সরু একটা গলির ভেতর। অনেকটা পিছনে থেকে তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে রানা। মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ও। ওদিকে কোথায় যাচ্ছে তাহি? ম্যাপ দেখে এবং লোক মুখে শুনে হঙকঙের এই এলাকা সম্পর্কে পরিষ্কার কোণ ধারণা না থাকলেও, যতটুকু জেনেছে, ওর জন্যে সেটুকুই যথেষ্ট।

এক গলি থেকে আরেক গলিতে ঢুকছে ইসি তাহি। প্রতিটি গলিতেই গিজ গিজ করছে মানুষ। রাস্তার দু'ধারে নোংরা ড্রেন, দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। ড্রেনের ওপারে বড় বড় দোকান, হাজার রকম মাল-পত্রে ঠাসা। আরেকটা গলিতে ঢুকল ইসি তাহি। এখন আর কোন সন্দেহ নেই রানার মনে। এই গলি দিয়েই প্রাচীর ঘেরা কাউলুন শহরে ঢুকতে হয়।

হঙকঙের এই এলাকাটা ক্রিমিন্যালদের একটা শক্ত ঘাঁটি। এ ঘাঁটি আজকের নয়, পুরোন আমলের। ব্রিটিশ পুলিশ এর ভেতর ঢুকতে পারত না। শান্তি এবং আইন রক্ষক সংস্থাগুলো আজও এদিকে খুব একটা সুবিধে করতে পারে না। খুনী, ছিনতাইকারী, স্মাগলার আর নেশাখোরদের স্বাধীন রাজ্য এটা। তবে ইদানিং পুলিশের টহল এখানে জোরদার করা হয়েছে। কোন বিদেশী লোককে এই এলাকায় বড় একটা দেখা যায় না।

ইসি তাহির পঁচিশ গজ পিছনে থেকে এগোচ্ছে রানা। এর মধ্যে একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি ইসি তাহি। অবশ্য প্রয়োজন

বলে এক নিমেষে গা ঢাকা দেবার অনেক উপায় জানা আছে রানার। অন্তত এই গলির ভেতর আত্মগোপন করা মোটেও কঠিন কিছু নয়।

রাস্তার লোকজন লক্ষ্য করছে রানাকে, কিন্তু কেউই তার পথ রোধ করে দাঁড়াল না। এদিকের চীনারা প্রায় সবাই রুক্ষ চেহারার— বুক ফুলিয়ে মুখে বেপরোয়া ভাব নিয়ে হাঁটে। কেউ কেউ তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল ওকে দেখে। কেউ কেউ থোঃ থোঃ করে থু থু ছিটাল ড্রেনের ওপর। দু একজন আফিমখোর মাতাল হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর গায়ে।

গলিটা ধরে প্রায় সিকি মাইল এগোল মেয়েটা। তারপর একটা দরজার সামনে থামল সে। ভিড়ান কবাট খুলে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল, পিছন ফিরে একবারও তাকাল না। রাস্তার উল্টো দিকে থামল রানা। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে রাস্তার ওপারের দরজাটার দিকে সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারল, কয়েকজন বিশালদেহী চীনা আশপাশ থেকে লক্ষ্য করছে ওকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল ও। দেয়াল ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে কেউ, কেউ ড্রেনের পাশে বসে ঝিমাচ্ছে। সহজেই বোঝা যায়, এরা সবাই নেশাগ্রস্ত। যারা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তাদের চোখে পলক নেই. তার মানে শুধু তাকিয়েই আছে, কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয় না।

ধীরে ধীরে, চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে রাস্তা পেরোল রানা। বিপদের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও, কাজেই একটু ভয় ভয় লাগা স্বাভাবিক। বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। দ্রুত আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল দু'পাশে। যারা তাকিয়ে আছে ওর দিকে তাদের একজনকেও পুরোপুরি সচেতন বা সুস্থ বলে মনে হল না। ভিড়ান দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। সামনেই একটা সরু সিঁড়ি।

দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল ও। কয়েক-টা ধাপ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটা মেয়েলি গলা ভেসে আসছে ওপর থেকে। নিজের অজান্তেই রিভলভারটা একবার স্পর্শ করল রানা। তারপর আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

বারান্দায় কেউ নেই। সিঁড়ির মাথার ঠিক উল্টো দিকে একটা দরজা, আরেকটা দরজা ওর ডান দিকে। আড়াআড়ি ভাবে বারান্দা পেরিয়ে সামনের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল ও। ভেতর থেকে কর্কশ, চাপা গলায় কথা বলে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'চোপ, কুত্তী মাগী! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাওনি, শা-আ-লী! যদি...'

'মিছে কথা বললে সাপে কাটবে আমাকে!' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল ইসি তাহি। 'লোকটা বলল, ঢাকায় পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুন হয়েছে সুজি!'

কোমল একটা মার্জিত কণ্ঠস্বর রানার ঠিক পেছন থেকে বলল, 'নড়বেন না, মিঃ ডিউক।' পরিচিত কণ্ঠস্বর। কথাটা ইংরেজীতে বললেও লোকটা যে চীনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। গলাটা শান্ত হলেও, নির্দেশের ভেতর হুমকিটুকু স্পষ্ট। একচুল নড়ল না রানা। 'ধীরে ধীরে হাত তুলে দরজা খুলুন। তারপর ভেতরে ঢুকুন। কোন রকম চালাকী নয়, প্লীজ।'

এক পা এগোল রানা। হাতল ঘুরিয়ে কবাট দুটো উন্মুক্ত করল। প্রায় খালি একটা কামরা। আসবাব বলতে লম্বা একটা কাঠের বেঞ্চ, তাতে কাঠেরই একটা হেডরেস্ট দেখে বোঝা গেল বিছানা হিসেবেও ব্যবহার করা হয় এটাকে। ঘরের একধারে একটা প্যাকিং বাক্স, তার ওপর কেটলী, চায়ের কাপ ইত্যাদি। ঘরের আরেক কোণে একটা নোংরা রশি টাঙান হয়েছে, তাতে ততোধিক নোংরা আণ্ডার

ওয়্যার, গেঞ্জি, তোয়ালে ইত্যাদি ঝুলছে। রশিটার নিচে একটা বেসিন। বেসিনের ওপর একটা টিনের গ্লাস।

মেঝেতে বসে আছে দু'জন, রানাকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল তারা। ইসি তাহি লাফ দিয়ে উঠতে গেল, কিন্তু রানার পিছনে দৃষ্টি পড়তেই ক্ষান্ত হল সে। তার মুখোমুখি বসে আছে একজন লোক। পরনে চীনা পোশাক। কাঁধ দুটো সরু, রোগাটে চেহারা। মাথায় কাল টুপি, ভুরু পর্যন্ত নামান। প্রথম দর্শনে রানার মনে হল, লোকটা চীনা। কিন্তু এক মুহূর্ত পরই ভুলটা ধরতে পারল ও। চীনা নয়, বাঙালী।

'এই লোকই!' চেঁচিয়ে উঠল ইসি তাহি। 'এর কথাই···

সামনে বসা লোকটা ঠাস করে একটা চড় কষাল ইসি তাহির গালে। 'চোপ শালী। ট্যাঁ-ফোঁ করবি তো জ্যান্ত পুঁতে ফেলব!' উঠে দাঁড়াল লোকটা। পিছিয়ে যাবার ভঙ্গি করে হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে ঝেড়ে একটা লাথি মারল ইসি তাহির কোমরে। 'বেশ্যা মাগী। পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিস হারামজাদাকে, কেমন?' দাঁতে দাঁত ঘষল সে। 'বেরো। বেরো এখান থেকে। গেলি!'

রানার শিরদাঁড়ার ওপর শক্ত কি যেন ঠেকল। পিছন থেকে লোকটা বলল, 'আগে বাড়ুন, মিঃ ডিউক।'

ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়াল ইসি তাহি, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। সামনে এগোল রানা। হিংস্র খুনীর চেহারা নিয়ে রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে সামনের লোকটা।

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল রানা। কেউ কিছু বলার আগে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। ওয়াম পিণ্ড হো, সেই

ংরেজী বলিয়ে গাইড, ওর চোখে চোখ রেখে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল একটু। তার হাতে একটা পয়েন্ট থোর-ফাইভ রয়েছে, রানার শিরদাঁড়ার ওপর তাক করা। দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে।

সামনে দাঁড়ান লোকটাকে ভাল করে দেখল রানা। অসুস্থ, ক্ষুধার্ত মনে হল তাকে। দাড়ি কামায়নি বেশ কয়েক দিন, গায়ে নোংরা পোশাক। 'ওর কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা দেখ,' ভারি গলায় বলল সে।

রানার শিরদাঁড়ার ওপর পিস্তল চেপে ধরল ওয়াম পিঙ হো। বাঁ হাত দিয়ে ওর শরীরটা চেক করল সে। রিভলভারটা বের করে নিল কোটের ভেতরের পকেট থেকে। পিছিয়ে গেল আবার।

সামনে দাঁড়ান লোকটা শহীদ আশরাফ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না, ভাবল রানা। এ লোক শহীদ আশরাফ না হলে ওর সমস্ত সন্দেহের তাহলে আর কোন ভিত্তি থাকে না। 'তুমি শহীদ আশরাফ, তাই না? তোমাকেই তো খুঁজছি আমি'

'কিন্তু পা [illegible] পেয়েও কোন লাভ হবে না তোমার।' সাথে সাথে জবাব দিল লোকটা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওয়াম পিঙ হো-র দিকে তাকাল রানা। সেই ক্ষমা প্রার্থনার হাসিটা এখনও লেগে আছে তার মুখে। রানা বলল, 'তোমার ফাঁদটা বেশ ভালই ছিল। সেই এয়ারপোর্ট থেকে আমার ওপর নজর রেখেছ তুমি তোমাকে সন্দেহ করিনি, সেটা আমার বোকামি। আমি আসছি, খবরটা তোমাকে জানাল কে?'

খক খক করে হাসল ওয়াম, যেন খুব আমোদ অনুভব করছে। 'এসব খবর পেতে আমাদের অসুবিধে হয় না। বড় বেশি নাক

পালিয়ে ফেলেছেন আপনি, মিঃ ডিউক। হংকঙে আসা উচিত হয়নি আপনার।'

ঠোঁট বাঁকা করে এই প্রথম একটু হাসল রানা। 'জান না বুঝি? নাক গলানোই তো আমার পেশা।'

'কি চাও তুমি?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল শহীদ আশরাফ।

'কিছু তথ্য। সুজি কোয়াও খুন হল কেন?'

আশরাফের চেহারায় ধূর্ত একটা ভাব ফুটে উঠল। 'ঠিক বলছ, খুন হয়েছে সুজি?'

'হ্যাঁ।'

মাথার টুপিটা খুলে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে দিল আশরাফ। লম্বা চুলে কাঁধ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল। 'ঠিক কি ঘটেছে খুলে বল আমাকে।' মাথার চুলে বারবার আঙুল চালাতে শুরু করল সে। রানা লক্ষ্য করল, লোকটার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বাঁকা হয়ে আছে।

আতিকুল্লাহ খানের সেই রহস্যময় টেলিফোন কলের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করল রানা। শেষ করল মোখলেসুর রহমানের প্রস্তাব দিয়ে। '...পুত্রবধূর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্ভাব্য সব কিছু জানতে চান তিনি। ছেলের প্রতি এটা তাঁর একটা দায়িত্ব বলে মনে করছেন...'

'কিন্তু পুলিশ থাকতে তোমাকে কেন বেছে নিল বুড়ো?'

'পুলিশ কোন কিনারা করতে পারছে না। এখানে এসে আমিও কোন সুবিধে করতে পারছি না। সেজন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম।'

'আমাকে খুঁজছিলে? কেন? আমি সাহায্য করতে পারব এ-কথা তোমার মনে হল কেন?' অদ্ভুত একটা অস্থিরতা প্রকাশ পেল শহীদ আশরাফের লালচে চোখে। জুলফি বেয়ে ঘামের ধারা নেমে আসতে দেখল রানা। ওর মনে হল, যে কোন কারণেই হোক, ভয়

পেয়েছে লোকটা। সেজন্যেই বোধহয় চেহারায় হিংস্র, বন্য একটা ভাব ফুটে উঠেছে।

'তুমি আমাকে শফিক সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে পার,' বলল রানা। 'তোমার মতো সে-ও কি ড্রাগ স্মাগলিঙের সাথে জড়িত ছিল?'

'জানি না। শফিক সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। এসব ব্যাপারে নাক গলিয়ো না। মরতে চাও নাকি? যাও, ভাগো এবার। শফিক মারা গেছে। মরেই থাকতে দাও তাকে। বেরোও, ভাগো!'

আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল রানার। কিন্তু ব্যাপারটা যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওর পেছনে দাঁড়ান ওয়ামের দিকে তাকাল আশরাফ। সাথে সাথে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরল রানা। পিস্তল দিয়ে ওর পেটে গুঁতো দিল ওয়াম। তাল হারিয়ে ফেলল রানা, ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। খটাশ করে ওর মাথার মাঝখানে বাড়ি মারল ওয়াম পিস্তলের বাঁট দিয়ে। তারপর কি ঘটল বলতে পারবে না রানা।

দশ

মাথায় তীব্র ব্যথা নিয়ে জ্ঞান ফিরে পেল রানা। ধীরে ধীরে চোখ মেলল, কিন্তু দেখতে পেল না কিছু। ভাবল, কোথায় রয়েছি? অন্ধকার কোন টানেলে? তারপর পরিচিত একটা গন্ধ পেল ও, বুঝল,

সেই ঘরেই রয়েছে ও। ধীরে ধীরে উঠে বসল, দাঁড়াল, অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে স্পর্শ করল ভিড়ান দরজাটা। কবাট খুলতেই ল্যাণ্ডিঙের আলো দেখতে পেল সামনে। সেই সাথে নিচের রাস্তা থেকে লোকজনের গলার আওয়াজ ভেসে এল। চৌকাঠ ধরে কিছু-ক্ষণ দম নিল ও। তারপর আঘাতটা অনুভব করার জন্যে একটা হাত তুলল মাথায়। ফোলা জায়গাটা স্পর্শ করতেই ইলেকট্রিক শকের মতো তীব্র একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি।

এই সময় সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। পিছিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকতে যাবে রানা, ল্যাণ্ডিঙে দেখা গেল সার্জেন্ট নিকলসনকে। 'এই যে!' ওকে দেখেই হাঁক ছাড়ল সার্জেন্ট। 'এখানে কি করছেন আপনি?'

'খাবি খাচ্ছি,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'আপনি?'

পিছনে একজন চীনা পুলিশ অফিসারকে নিয়ে দোতালায় উঠে এল সার্জেন্ট। 'এই ডেঞ্জারাস এলাকায় দেখা গেছে আপনাকে, খবরটা পেয়েই চলে এসেছি। আপনার মতলবখানা কি জানার ইচ্ছে ছিল।'

'দেরি করে ফেলেছেন,' বলল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল ও। প্রায় এক ঘণ্টা জ্ঞান ছিল না ওর। 'ঘণ্টাখানেক আগে এলে শহীদ আশরাফকে ধরতে পারতেন।'

'শহীদ আশরাফ!' উত্তেজিত হয়ে উঠল সার্জেন্ট। 'বলেন কি?'

'ওয়াম পিঙ হো নামে একজন লোক আছে তার সাথে ...'

রানাকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল সার্জেন্ট। ভেতরে কেউ নেই দেখে বেরিয়ে এল তখুনি। 'চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসন আপনার

সাথে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছেন, চলুন।'

'চীফ ইন্সপেক্টর ইসি তাহি নামে একটা মেয়ের সাথেও কথা বলতে চাইবেন,' বলল রানা। সার্জেন্টকে ইসি তাহির ঠিকানাটা জানিয়ে দিল ও। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন খোঁজ নিন মেয়েটার।'

'এসবের সাথে তার সম্পর্ক?'

'তার পিছু নিয়েই তো শহীদ আশরাফের এই আস্তানায় পৌঁচেছি আমি। তাড়াতাড়ি করুন, সার্জেন্ট। দেরি করলে পাখি উড়াল দেবে।'

চীনা অফিসারকে দ্রুত ক্যান্টনীজ ভাষায় কি যেন বলল সার্জেন্ট। অফিসার ঘুরে দাঁড়িয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

আধ ঘণ্টা পর। চীফ ইন্সপেক্টর স্টুয়ার্ট জ্যাসনের অফিসে বসে আছে রানা। সামনে ধূমায়িত চায়ের কাপ। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। এই মাত্র ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছে পুলিশ সার্জেন।

টেলিফোন করে ঘুম থেকে তুলে আনা হয়েছে চীফ ইন্সপেক্টরকে। রেগে বোম হয়ে আছে সে। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে রাগটাকে সামলে রাখতে হয়েছে তাকে। চোখ দুটো সতর্ক, গভীর মনোযোগের সাথে রানার কথা শুনছে। সিলভার মাইন বে-তে যা ঘটেছে সেটা চেপে গেল রানা। কেন এবং কিভাবে যোগাযোগ করল ইসি তাহির সাথে, সেটা বলল। সুজি খুন হয়েছে শুনে ইসি তাহির প্রতিক্রিয়ারও বর্ণনা দিল। 'সুজির মৃত্যু সংবাদ পাচার করবে ও, এই রকম একটা সন্দেহ ছিল বলেই ওকে আমি অনুসরণ করি,' বলল ও। তারপর, কিভাবে হঠাৎ পিছনে হাজির হল ওয়াম পিঙহো, কিভাবে ওর মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল সে,

তাও জানাল।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর চীফ ইন্সপেক্টর বলল, 'নিজের ঘাড়ে বিপদ টেনে নিলে কার কি করার থাকতে পারে। এতসব না করে প্রথমেই আমার কাছে আসা উচিত ছিল আপনার।'

উত্তরে রানা কিছু বলার আগেই ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে অপর প্রান্তের বক্তব্য শুনল জ্যাসন। তার-পর কঠিন সুরে বলল, 'খুঁজতে থাক। ওকে আমি চাই।'

রিসিভার রেখে দিয়ে রানার দিকে তাকাল জ্যাসন। 'নিজের ফ্ল্যাটে ফেরেনি ইসি তাহি। ওখানে দু'জন লোককে পাহারায় রাখা হয়েছে। সম্ভাব্য অন্যান্য জায়গাতেও খোঁজ করা হচ্ছে।'

শেষ পর্যন্ত হয়ত ওমপও পিয়ার মতো ইসি তাহিকেও প্রণালী থেকে উদ্ধার করবে পুলিশ, ভাবল রানা।

'কি ভাবছেন?'

'আপনার কাছে শহীদ আশরাফের কোন ফটো আছে?' জানতে চাইল রানা। 'এই লোকটা শহীদ আশরাফ কিনা সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

একজন কনস্টেবলকে ডেকে শহীদ আশরাফের ফাইল চেয়ে পাঠাল জ্যাসন। একটু পরই ফাইল থেকে একটা ফটো বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

ফটোটার দিকে তাকাতেই রানার শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হল। পারভিন ওকে যে ফটোটা দিয়েছিল, এটা সেটারই আরেকটা কপি। রোগাটে একটা মুখ। নীচ, স্থূল চেহারা। চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। পারভিন বলেছিল, এটা মীর শফিকুর রহমানের ফটো।

'শহীদ আশরাফের ফটো এটা ? আপনি ঠিক জানেন ?'

'নিশ্চয়ই।' অবাক দেখাল চীফ ইন্সপেক্টরকে। 'কেন বলুন তো ?'

'কিন্তু আজ রাতে যার সাথে কথা হল আমার এই ফটো তো সে-লোকের নয়। অথচ লোকটা স্বীকার করল সে-ই শহীদ আশরাফ।'

'তাহলে কার সাথে কথা বলেছেন আপনি ?'

'আচ্ছা, শফিককে কখনও দেখেছেন আপনি ?'

'দেখেছি। কেন ?'

'তার কোন ফটো আছে আপনার কাছে ?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'না, তা নেই।'

'তার চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন আমাকে ?'

'রোগা, চোখ দুটো সতর্ক, চোয়াল ভাঙা, মোট কথা খুব বাজে একটা চেহারা...'

'মনে হচ্ছে এই লোকের সাথেই কথা বলেছি আমি।'

অনেকক্ষণ কথা বলল না ওরা। তারপর ভারি গলায় চীফ ইন্সপেক্টর বলল, 'শফিক মারা গেছে। মোটর অ্যাক্সিডেন্টে। তার লাশও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ঢাকায়।'

'শফিক বেঁচে আছে...অন্তত ঘণ্টা দেড়েক আগেও তাকে জীবিত দেখেছি,' বলল রানা। 'আপনার বর্ণনার সাথে তার চেহারা মিলে যাচ্ছে।'

'কিন্তু এ অসম্ভব। গাড়িতে যে লাশটা পাওয়া গিয়েছিল তার সাথে শফিকের আকার, আকৃতি এবং গড়ন মিলে গিয়েছিল, লাশটা শফিকের ছাড়া আর কার হতে পারে ?' ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেকেই যেন বিশ্বাস করাতে চাইছে চীফ ইন্সপেক্টর। 'শরীরটা এমন ভয়ংকর

ভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওর স্ত্রী আঙটি আর সিগারেট কেস দেখে লাশ সনাক্ত করেছিল। উঁহু,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'ওটা শফিকের লাশ না হয়েই যায় না।'

'ওটা শফিকের লাশ ছিল না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'আমি ভাবছি, লাশটা তাহলে কার ? কার লাশ আপনারা ঢাকায় পাঠালেন ?'

'দেখুন, মিঃ ডিউক, আপনি শুধু শুধু পানি ঘোলা করছেন।' চটে উঠে বলল জ্যাসন। 'শফিক বেঁচে আছে তা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করার কোন কারণও নেই।'

'লম্বা একজন লোক, ঠোঁট জোড়া পাতলা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল,' বলল রানা, চুপ করে থেকে কি যেন স্মরণ করল, তারপর আবার বলল, 'ডান হাতের কড়ে আঙুলটা বাঁকা, মনে পড়ছে, বোধহয় অনেক দিন আগে ভেঙে গিয়েছিল, তারপর আর ঠিক ভাবে সেট হয়নি...'

'কড়ে আঙুল বাঁকা ? তাহলে আর কোন সন্দেহই নেই। এই লোকই শফিক।' এই প্রথম কথা বলল সার্জেন্ট নিকলসন।

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে চীফ ইন্সপেক্টরের। 'তাহলে ঢাকায় পাঠিয়ে কবর দেয়া হল কাকে ?'

'আমার ধারণা,' শান্ত ভাবে বলল রানা, 'ঢাকায় পাঠানো হয়েছে শহীদ আশরাফের লাশ। যে-কোন কারণেই হোক, শফিক আমার কাছে নিজেকে শহীদ আশরাফ বলে চালাবার চেষ্টা করেছে।'

'কারণ ?'

'জানি না,' বলল রানা। 'এবার আমি উঠব। আমার ঘুম পেয়েছে।'

'এক মিনিট, মিঃ ডিউক,' তাড়াতাড়ি বলল চীফ ইন্সপেক্টর। 'ওয়াম পিঙ হো দেখতে কেমন সেটা বলে যান। দেখি ব্যাটাকে ধরা যায় কিনা।'

ওয়ামের চেহারার বর্ণনা দিল রানা।

সার্জেন্ট নিকলসনকে বলল জ্যাসন, 'যত লোক লাগে সাথে নাও। কাউলুনের প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশী চালাতে হবে। ওয়াম আর শফিক, দু'জনকেই চাই আমি।'

রানার সাথে অফিস থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলল সার্জেন্ট. 'দেয়াল ঘেরা কাউলুন থেকে কাউকে খুঁজে বের করা অসম্ভব একটা ব্যাপার। ওখানে পুলিশের সাথে কেউ সহযোগিতা করে না। তাছাড়া জানেনই তো, সব চীনাই এক রকম দেখতে। ওয়াম আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও টের পাব না আমি। অথচ চীফ ঢালাও অর্ডার দিয়ে বসলেন, দু'জনকেই চাই তার। বলুন তো এখন কি করি!'

'চেষ্টা চালিয়ে যান,' বলল রানা। 'দেখুন কি আছে ভাগ্যে।' সার্জেন্টকে বারান্দায় দেখে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে রিপালস বে হোটেলে ফিরে এল ও। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছে। এলিভেটরে চড়ে উঠে এল পাঁচতালায়। এলিভেটর থেকে নামতেই সামনে পড়ে গেল হোটেলের নাইট বয়। সতের কি আঠারো বছর বয়েস, পরনে সাদা ড্রিল জ্যাকেট, কাল ট্রাউজার। রানাকে দেখে একগাল হাসল। মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে বাড়িয়ে দিল ঘরের চাবি। ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। তালা খুলে সিটিংরুমে ঢুকল। বেডরুম আর সিটিং রুমের মাঝখানে কোন দেয়াল নেই, শুধু একটা মোটা

কাপড়ের পর্দা। আলো খেলে জ্যাকেটটা খুলে ফেলল রানা। শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানির নিচে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবে এখন ও। ট্রাউজারের বোতাম খুলতে খুলতে পর্দা সরিয়ে বেডরুমে ঢুকল ও। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বলছে।

বিছানার ওপর শুয়ে আছে একটা মেয়ে। পরনে কাল আর সোনালী রঙের ককটেল ড্রেস। কণিকা নন্দী। পায়ের জুতো খুলে রেখেছে খাটের নিচে।

কণিকাকে দেখে মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় বোধ করল রানা। প্রথমে ধরেই নিল, মারা গেছে সে। কিন্তু বুকের ওঠা-নামা লক্ষ্য করে ভুলটা ভাঙল। তারপরই প্রশ্ন জাগল, ঘরে ঢুকল কিভাবে? সেই সাথে মনে পড়ে গেল নাইট বয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। ছোকরাকে ঘুষ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে কণিকা। কিন্তু এখানে কি মনে করে?

ধীরে ধীরে চোখ মেলল কণিকা। তারপর মাথা তুলে তাকাল রানাকে দেখতে পেয়েই ঝট্ করে বিছানার ওপর উঠে বসল সে। পা দুটো ঝুলিয়ে দিল বিছানার কিনারা থেকে।

'দুঃখিত,' বলে হাসল সে। 'আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানিও না।' জুতোয় পা গলাচ্ছে সে।

পিছিয়ে এসে একটা আর্মচেয়ারে বসল রানা। 'কখন এসেছ তুমি?' সম্বোধনটা ইচ্ছে করেই পরিবর্তন করল ও। যে তাকে খুন করার জন্যে ফাঁদ পাতে তাকে সম্মানসূচক সম্বোধন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

সিটিংরুমে ঢুকল কণিকা। 'সেই দশটা থেকে। আপনার কথা ভেবে ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।' রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বলে চলেছে সে, 'আপনার ব্যাপারটা কি? কোন্ ঘাটে পৌঁছ-

লেন না যে? আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে আরেকটু হলে মিসই করতাম বোট। কোথায় ছিলেন আপনি?'

'আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'সিলভার বে মাইনে তুমি আর আমি যাব, প্রস্তাবটা তোমার মুখ থেকে শুনেছিলাম। ওটা কি তোমারই প্রস্তাব ছিল, না কি আর কেউ তোমাকে দিয়ে প্রস্তাবটা বলিয়েছিল?'

রানার সামনের আর্মচেয়ারের হাতলে বসল কণিকা। 'আমার প্রস্তাব? আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...'

'জলপ্রপাতটা আমাকে দেখে আসতে বলার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল,' বলল রানা। 'জলপ্রপাত দেখতে যাবার পরামর্শটা কার? তোমার? নাকি অন্য কারো পরামর্শ ছিল ওটা?'

ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল কণিকা। তারপর বলল, 'এ-ধরনের প্রশ্ন কেন করছেন আপনি, বুঝতে পারছি না। তবে, আমার ভাই কথাচ্ছলে বলেছিল, ডিউক সাহেবকে সিলভার বে মাইনটা দেখিয়ে আনতে পারিস। ওর ধারণা, আপনি খুব একা বোধ করেন, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে আপনি খুব খুশি হবেন।'

'ও কি সত্যি তোমার ভাই?'

চমকে উঠে শক্ত হয়ে গেল কণিকা। ঝট্‌ করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

প্রশ্নটা আবার করল রানা।

অন্য দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল কণিকা, 'আশ্চর্য সব প্রশ্ন করছেন আপনি। এসবের মানে কি?'

'তোমার সাথে সুধীরের চেহারার কোন মিল নেই,' বলল রানা। 'তাছাড়া, তোমার মতো একটা মেয়ে তার ভাইয়ের সেবায় আত্মোৎ-

পণ করবে, এটা আমার কাছে বিশ্বাস্য বলে মনে হয়নি।'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করতে দেখল রানা কণিকাকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল সে। বলল, 'না, ও আমার কেউ নয়। মাত্র ছ'মাস আগে ওর সাথে আমার পরিচয়। এখন বুঝতে পারছি, ওর সাথে পরিচয় হওয়াটাই আমার জন্যে কাল হয়েছে...'

সিগারেট ধরাল রানা। ওর হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে কণিকাও একটা সিগারেট ধরাল। চোখ বুঁজে ধোঁয়া টানল সে।

'কোথায় ওর সাথে দেখা হয় তোমার?'

'সিঙ্গাপুরে। কলকাতা থেকে একটা ছেলের সাথে পালিয়ে আসি। কিন্তু বিয়ে না করে ও আমাকে ফেলে কেটে পড়ে। দেশে ফেরার কোন উপায় নেই দেখে একটা নাইট ক্লাবে ক্যাবারে নাচের চাকরি নিই। আমার নাচ দেখতে আসতো সুধীর। দু'হাতে টাকা ওড়াত ও, আমাকে এখানে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইত। এর মধ্যে একদিন পুলিশ হামলা করল নাইট ক্লাবে। অনেকেই পালাল, কিন্তু আমি ধরা পড়ে গেলাম। খবর পেয়ে থানা হাজত থেকে সুধীরই আমাকে উদ্ধার করে। তারপর ওর বাড়িতে গিয়ে উঠি আমি। কিন্তু কয়েকদিন পরই টের পেলাম, আমাকে নয়, আমার শরীরটাকে ভালবাসে ও। অনেক ভেবে চিন্তে দেশে ফেরার জন্যে কিছু টাকা চাইলাম ওর কাছে। কিন্তু মুখের ওপর বলে দিল আর যা চাও পাবে, কিন্তু টাকা দেব না। তারপর হঠাৎ সিঙ্গাপুরের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এল ও। চাকরি নেই, টাকা নেই, অগত্যা আমাকেও আসতে হল ওর সাথে।'

'পাসপোর্ট?'

'কোত্থেকে জানি না আমার জন্যে একটা জাল পাসপোর্ট যোগাড় করেছিল ও।' রানার দিকে তাকাল কণিকা। 'এখানে আমরা ভাই-বোন হিসেবে আসি। আপনি...' কি যেন বলতে গিয়েও ইতস্তত করে থেমে গেল সে।

'কি বলবে বল ?'

'আপনি...আপনি আমাকে কিছু টাকা দেবেন ? আমি দেশে ফিরে যেতে চাই।' একটু থেমে আবার বলল, 'দেশে ফেরার দু'-মাসের মধ্যে টাকাটা আমি ফেরত পাঠাতে পারব।'

'জাল পাসপোর্ট যোগাড় করল কিভাবে ?'

'তা জানি না। টাকা দেবেন আমাকে ?'

'টাকা আমি কাউকে ধার হিসেবে দিই না।'

চেহারাটা কাল হয়ে গেল কণিকার। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল সে। রানার মনে হল, মেয়েটা ভয় পেয়েছে। 'ধার হিসেবে দেবেন না ? কিন্তু আমার কাছে কিছুই তো নেই যা আপনাকে কিনতে বলব...আচ্ছা, আমি যদি...মানে, আমি যদি, ধরুন, আপনাকে সঙ্গ দিই, আপনার সেবা করে টাকাটা রোজগারের প্রস্তাব দিই, আপনি রাজি হবেন ?'

'গলাটা শুকিয়ে গেছে,' বলল রানা। 'নাইট বয়কে ডেকে কিছু আনতে বলি, কেমন ?'

'না।' চেয়ারের হাতল থেকে দ্রুত নেমে পড়ল কণিকা। চেহারায় পরিষ্কার আতংক ফুটে উঠল। 'আমি এখানে আছি তা কাউকে জানাতে চাই না।'

'নাইট বয় তো জানেই,' বলল রানা। 'সে-ই তোমাকে ভেতরে ঢুকিয়েছে, তাই না ?'

'না, না। আপনার কামরার নাম্বার জেনে নিয়ে নিচের বোর্ড থেকে চাবি খুলে নিয়ে এসেছি। দুটো চাবি ছিল বোর্ডে। নাইট বয় জানে না আমি এখানে আছি।'

মাথার আঘাতটা আবার ব্যথা করতে শুরু করেছে রানার।

'কিসের এত ভয় তোমার?' জানতে চাইল ও।

'ভয়? কোথায়? ভয় পাব কেন? আমি শুধু হঙকঙ ছেড়ে চলে যেতে চাই।' এগিয়ে এসে রানার একটা হাত চেপে ধরল কণিকা। 'প্লীজ। আপনি আমাকে বাঁচান। আমি দেশে ফিরতে চাই।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা। 'কিন্তু হঠাৎ করে দেশে ফেরার জন্যে এতখানি ব্যাকুল হয়ে উঠেছ—কারণটা কি?'

'একের পর এক এত প্রশ্ন না করলেই কি নয়?' করুণ চোখে তাকাল কণিকা। 'টাকা দেবেন কিনা বলুন। দেবেন জানলে আপনার সাথে···শুতেও আমার আপত্তি নেই। দেবেন?'

'না,' বলল রানা। 'শুধু এক শর্তে দিতে পারি—সুধীর নন্দী সম্পর্কে যা জান সব আমাকে বলতে হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল কণিকা, তারপর বলল, 'বিশ্বাস করুন, ওর সম্পর্কে খুব কমই জানি আমি। প্লেবয় টাইপের লোক, ফুর্তি করে সময় কাটাচ্ছে···'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল রানা। 'ওর সম্পর্কে সবই জান তুমি, কিন্তু বলতে রাজি নও। বেশ। তোমার জেদই বজায় থাক, আমারও টাকা বেঁচে যাক।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। টেলিফোনের দিকে এগোল। 'ড্রিঙ্কের অর্ডার দিতে যাচ্ছি আমি। গলাটা না ভেজালে ঘুম আসবে না। ওয়েটার আসার আগেই তুমি বরং কেটে পড়।'

না···দাড়ান।

রিসিভার তুলে রুম সার্ভিসকে স্কচের একটা বোতল আর বরফ দিতে বলল রানা। দ্রুত ওর সামনে এসে দাঁড়াল কণিকা।

'ওর সম্পর্কে যা জানি বললে আপনি আমাকে দেশে ফেরার টাকা দেবেন?'

'দেব,' রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল রানা।

বুক ভরে দম নিল কণিকা, যেন সাহস সঞ্চয় করল, তারপর বলল, 'আমার ধারণা সুধীর ড্রাগ স্মাগলিঙের সাথে জড়িত।' হাত দুটো ঘন ঘন কচলাচ্ছে সে।

'এরকম ধারণার কারণ?'

'গভীর রাতে লোকজন দেখা করতে আসে ওর সাথে। আমরা যখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম প্রায়ই ডকে গিয়ে নাবিকদের সাথে কথা বলত ও। সিঙ্গাপুরে আমরা যে বাঙলোয় ছিলাম সেখানে একবার হানা দিয়েছিল পুলিশ। সুধীর খুব হাল্কাভাবে নেয় ব্যাপারটাকে। পুলিশ অবশ্য সার্চ করে কিছু পায়নি। এখানেও গভীর রাতে চীনারা ওর সাথে দেখা করতে আসে। ভোর অন্ধকারে ঘুম থেকে উঠে বোট নিয়ে কোথায় যেন চলে যায় ও।'

'লনফিনের যে বাড়িটায় তোমরা আছ, তোমাদের আগে সেখানে শফিক থাকত?'

ঢোক গিলল কণিকা। 'থাকত। কথাটা আপনাকে জানাতে নিষেধ করে সুধীর। শফিক মারা যাওয়ায় সিঙ্গাপুর থেকে সুধীরকে ডেকে পাঠানো হয় তার জায়গাটা পূরণ করার জন্যে। বাড়িটা তো দেখেছেন, ড্রাগ রিসিভ করার জন্যে আদর্শ একটা জায়গা।'

মৃদু টোকা পড়ল দরজায়।

'ওয়েটার এসে গেছে,' বলল রানা। 'দেখা দিতে না চাইলে বাথ-রুমে লুকাতে পার।'

দ্রুত বাথরুমে গিয়ে ঢুকল কণিকা। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল রানা।

দরজার সামনে ওয়েটার নয়, রানার বুকের দিকে পয়েন্ট থ্রি-এইট অটোমেটিক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে সুধীর নন্দী। 'পিছু হটো। সাবধান, হাত দুটো যেন নড়ে না।' চাপা গলায় বলল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। পিছিয়ে এল ঘরের ভেতর

'চেহারা দেখে বুঝতে পারছি কিসের আশায় আছ।' ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সুধীর, কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ওয়েটার আসছে না মাঝপথ থেকে বিদায় করে দিয়েছি তাকে, বলেছি, মত বদলেছ তুমি, এত রাতে আর ড্রিঙ্ক করবে না

'বসতে পারি?' শান্ত গলায় বলল রানা। 'একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার স্নায়ুগুলোকে অবশ করে তুলেছে।' অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে এক চেয়ারে বসে পড়ল সে হাত দুটো সুধীরের চোখের সামনে, দুই হাঁটুর ওপর রাখল। দেখল নিঃশব্দ হাসিটা স্থির হয়ে আছে সুধীরের মুখে। চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা ভাব। মনে মনে ভয়ই পেল রানা। অটোমেটিক ধরা হাতটা একচুল নড়ছে না, লক্ষ্যস্থির হয়ে আছে রানার দুই ভুরুর মাঝ-খানে।

'বুদ্ধিমান লোক তুমি,' বলল সে। 'কতটা, তা তুমি নিজেও জান না। গত তিন হপ্তা ধরে চেষ্টা করেও যা পারিনি আমি, তুমি করেক ঘণ্টার চেষ্টায় তাই পেয়েছ।'

'কি সেটা?'

'খুত্তার বাচ্চা শফিককে খুঁজে পেয়েছ। তোমাকে খুন করার জন্যে লোক লাগিয়েছিলাম, ভাগ্যিস খুন হওনি তুমি।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কথাগুলো,' বলল রানা। 'রিভলভারটা আমার দিকে এভাবে তাক করে রাখার কোন দরকার আছে কি? বিশ্বাস কর, আমি নার্ভাস ফিল করছি।'

রানার দিকে রিভলভার ধরে রেখেই পা বাড়াল সুধীর। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে খানিক আগে কণিকা যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটায় বসল। 'রিভলভারটাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি কোনরকম চালাকি করার চেষ্টা না করলে এটা থেকে গুলি বেরুবে না। পুলিশকে কি বলেছ তুমি?'

'পুলিশকে কিছু বলেছি তা তুমি ভাবছ কেন?'

'লনফিনের বাড়ির ব্যাপারে কৌতূহল আছে জানার পর থেকেই তোমার পেছনে লোক লাগিয়েছিলাম আমি। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নজরবন্দী ছিলে তুমি আমার। পেডালোয় তোমাকে দেখার পর থেকে তোমার ওপর থেকে চোখ সরাইনি আমরা।'

'আমরা? মানে ড্রাগ স্মাগলারদের রিঙ?'

চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে তুলে সুধীর বলল, 'তোমার ঘটে যে বুদ্ধি আছে তা আমি আগেই স্বীকার করেছি। হ্যাঁ, ডিউক, আমরা মানে ড্রাগ স্মাগলারদের একটা রিঙ। এই চক্রটা বিরাট— এত বড়, তোমার কল্পনাতেও তার সবটা ধরা পড়বে না। সে যাই হোক, তোমাকে খুন করার জন্যে লোক লাগিয়েছিলাম, কথাটা মনে পড়লেই ঘেমে উঠছি আমি। ওটা আমারই ভুল হয়েছিল। তোমাকে ঘাঁটান উচিত হয়নি আমার। কিন্তু একথাও ঠিক যে তখন আমি জানতাম না তুমি শফিকের পেছনে লেগেছ।'

'তা আমি লাগিনি,' বলল রানা। 'আমি জানতাম শফিক মারা গেছে।'

'প্রথমে আমরাও তো তাই ভেবেছিলাম। আমাদেরকে বোকা বানায় ও। ও মারা গেছে ধরে নিয়ে আমরা তো খুঁজছিলাম শহীদ আশরাফকে। এই সময় তুমি ঢাকা থেকে এসে পথ দেখিয়ে আমাদেরকে নিয়ে গেলে শফিকের কাছে।'

'বুঝলাম, শফিককে পেয়ে খুশি হয়েছ তোমরা। এখন?' কণিকা কি করছে বাথরূমে, ভাবল রানা।

'শুধু শফিককেই নয়, তার সাথে ওয়ামকেও আমরা পেয়েছি।' ক্রূর, হিংস্র একটুকরো হাসি ফুটল সুধীরের ঠোঁটে।

'ওয়াম আসলে কে?'

'আমাদেরই একজন সদস্য, কিন্তু বোকাটা শফিকের সাথে হাত মিলিয়ে পালিয়ে যায়। ঠিক এই মুহূর্তে ধোলাই করা হচ্ছে ওদেরকে। ধোলাইয়ের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, সাগরে ফেলে দেয়া হবে।'

'কি করেছে ওরা তোমাদের?'

'বেঈমানদের শাস্তি দেয়ার এটাই আমাদের রীতি,' বলল সুধীর। 'আবার কে কখন বেঈমানী করে, তাই সুযোগ পেলেই আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকি।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'কি বলেছ তুমি পুলিশকে?'

'এমন কিছু বলিনি যা তারা জানে না।'

ঝাড়া দশ সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সুধীর। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠব আমরা, চল।'

'কোথায়?'

'সময় হলে জানতে পারবে,' মুখে হাসি নেই সুধীরের, গলার আওয়াজটা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা শোনাল। 'প্যাসেজে নাইট বয় আছে, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা কর না। সে আমাদের দলেরই একজন। বাইরে অপেক্ষা করছে চারজন লোক, প্রত্যেকের কাছে ছুরি আছে। চল্লিশ ফিট দূর থেকে আপেল গাঁথতে পারে ওরা—কাজেই বোকার মতো কিছু করে বসলে অকালে মারা পড়বে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। পিছিয়ে গিয়ে দরজা খুলল সুধীর, সরে দাঁড়াল একপাশে 'লবিতেও একজন লোক আছে,' বলল সে। 'সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সাবধান!'

প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। সিঁড়ির দিকে এগোল। পিছনে সুধীর, রিভলভার ধরা হাতটা পকেটে। বাঁকের কাছে দেখা গেল নাইট বয়কে সেই গালভরা হাসিটা এখন আরো উথলে পড়ছে।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল রানা।

'নামো!' পিছন থেকে বলল সুধীর।

চার প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে নিচের লবিতে নেমে এল রানা। এক পলক তাকিয়েই লবির পরিবেশটা অস্বাভাবিক লাগল ওর। লবি প্রায় খালি. শুধু দু'জন লোক বসে আছে, তাদের মধ্যে একজন সার্জেন্ট নিকলসন। অপরজনের পরনেও সাদা পোশাক, কিন্তু তার চেহারা দেখেই বোঝা গেল, সে-ও একজন পুলিশ।

'হ্যাণ্ডস আপ!' সুধীরকে দেখেই হুংকার ছাড়ল সার্জেন্ট নিকলসন।

সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। ডাইভ দিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। পরমুহূর্তে শোনা গেল গুলির আওয়াজ।

সুধীর এবং সার্জেন্ট দু'জনেই গুলি করল, কিন্তু শব্দ শুনে মনে হল একটাই গুলি হয়েছে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল রানা।

'উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন।' তাগাদা দিল সার্জেন্ট নিকলসন। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন।'

উঠে দাঁড়াল রানা। দেখল, চিৎ হয়ে কার্পেটের ওপর শুয়ে রয়েছে সুধীর। বুকের একটা ক্ষত থেকে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও।

'ওকে খুন না করলে কি চলত না?'

'আমরা নিজেদের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে রাজি আছি,' গম্ভীর স্বরে বলল সার্জেন্ট নিকলসন, 'কিন্তু ওকে খুন করার জন্যে গুলি না করলে ঝুঁকিটা আপনার প্রাণের ওপর নিতে হত—সেটা আমি নিতে চাইনি।' রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'ওর সাঙ্গপাঙ্গ এখানে যারা ছিল তাদের কোমরে দড়ি দিয়েছি। মেয়েটা কে, আমাদেরকে ফোন করল?'

'মেয়ে?' অবাক হল রানা। 'ফোন করল? তা জানি না। তবে ওপর তালায় একজন নাইট বয় আছে, সে-ও এদের দলের লোক।'

সার্জেন্টের সঙ্গী পুলিশ হাতে উদ্যত রিভলভার নিয়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল।

'মেয়েটার টেলিফোন পেয়েই তো এখানে এসেছি আমরা। কে সে?'

'বললাম তো, জানি না।'

ছয়জন চীনা পুলিশ ঢুকল লবিতে। তাদেরকে কয়েকটা নির্দেশ

দিয়ে ঝট্‌ করে রানার দিকে ফিরল সার্জেন্ট। 'চলুন, মিঃ ডিউক। চীফ ইন্সপেক্টর আপনার সাথে কথা বলবেন।'

এগার

চীফ ইন্সপেক্টরের খাস কামরাটা খালি ছিল, ডিভানে শুয়ে সেখানেই তিন ঘন্টা ঘুমিয়ে নিল রানা। সাড়ে চারটের সময় ওর ঘুম ভাঙাল সার্জেন্ট নিকলসন। হাত-মুখ ধুয়ে নিল ও। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেল চীফ ইন্সপেক্টর, দু'জনের সামনে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল একজন কনস্টেবল। কামরার দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট নিকলসন, মাঝে মধ্যে মুখের সামনে হাত এনে হাই তুলছে।

'সুধীরের স্পীডবোট নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল একজন লোক,' ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল জ্যাসন। 'মেরিন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।'

'বাঙালী?'

'না। চীনা—ক্যান্টন থেকে এসেছে,' বলল জ্যাসন। 'আপনি খুজি কোয়াও মার্ডার কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, কাজেই আমরা কতদূর এগোলাম সেটা আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই।'

'ধন্যবাদ,' সিগারেট ধরিয়ে বলল রানা। 'শফিককে পাওয়া গেছে?'

'গেছে। আধ ঘন্টা আগে উপসাগরে একটা লাশ ভাসতে দেখে

পুলিশ সেটাকে ডাঙায় তোলে।' চোখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল চীফ ইন্সপেক্টর। 'বাজি ধরে বলতে পারি, প্রথমবার মরতে পারলেই খুশি হত শফিক। খুন করার আগে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে তার ওপর।' শেষ চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা সরিয়ে রাখল সে। 'কেসটা এখন আমাদের কাছে পানির মতো পরিষ্কার।'

'একটা বিশ্লেষণ তাহলে আশা করতে পারি আ'ম?'

'অবশ্যই,' টোবাকো পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল চীফ ইন্সপেক্টর। 'আমার ব্যাখ্যাটা এই রকম—হঙকঙে আসার পর থেকেই সুজি কোয়াও-র ঘাড়ে চেপে দিন কাটাচ্ছিল শফিক। সুজি-কে কেন সে বিয়ে করল তা আমার জানা নেই, তবে মুখ বন্ধ করা একটা কারণ হতে পারে। শহীদ আশরাফের সাথে প্রথম পরিচয়ের কয়েক হপ্তা পরই সুজিকে বিয়ে করে সে। ড্রাগ স্মাগলিঙ র‍্যাকে-টের একজন উঁচু দরের অপারেটর ছিল শহীদ আশরাফ, এ-কথা আগেই আপনাকে জানিয়েছি আমি। রিপালস বে র লনফিনের বাড়িটা ভাড়া করেছিল সে। বাড়িটা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে তা লনফিনের জানা ছিল কিনা এখনও জানি না আমরা, তবে জানার চেষ্টা চলছে। ড্রাগস খালাস করার জন্যে বাড়িটা অত্যন্ত উপযোগী হয়েছিল। জায়গাটা একেবারে নির্জন, শান বাঁধানো একটা ঘাট আছে, আছে একটা স্পীডবোট। কিন্তু নানা কারণে পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছিল। আশরাফকে গ্রেফতার করার জন্যে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করি আমরা। ক্যান্টনে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় সে, ঠিক করে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। কিন্তু ড্রাগ ডেলিভারী নেয়ার জন্যে রিপালস বে র বাড়ি-টায় কারো থাকা দরকার। সেজন্যেই আশরাফ রিপালস বে-র ওই

বাড়িতে শফিককে পাঠায়। সুজি কোয়াওকে এক রকম ত্যাগ করে ওখানে গিয়ে ওঠে শফিক। এর পর আশরাফ ক্যাণ্টনে চলে যায়।'

টোবাকো পাইপে আগুন ধরাল চীফ ইন্সপেক্টর। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করল, 'এরপর প্রায় দু'হাজার আউন্স হিরোইনের একটা চালান গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। চালানটা কিভাবে ডেলিভারী নিতে হবে তা শফিককে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্যে ক্যাণ্টন থেকে রিপালস বে-র ওই বাড়িটায় এক রাতে আসতে হয় আশরাফকে। সেই রাতেই হিরোইন ডেলিভারী নেয় ওরা। বাড়ির গুদাম ঘরে সেটা তুলেও রাখা হয়। ঠিক তখন থেকেই হঠাৎ বিরাট ধনী হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে শফিক। দু'হাজার আউন্স হিরোইন বলতে গেলে সাত রাজার ধন। কিন্তু এত বড় একটা চালান গাপ করে দেবার সাহস তার ছিল না। সে জানত, হিরোইন নিয়ে পালালে অর্গানাইজেশন তাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেবেই। তাছাড়া, চালানটা নিজের হাতে একবার এসে গেলে সেটা কোথায় কিভাবে কার কাছে বিক্রি করবে সে সম্পর্কেও কোন ধারণা ছিল না তার। মনে মনে হঠাৎ ধনী হবার আশাটা ত্যাগ করছিল সে, এই সময় ভাগ্যই তাকে একটা সুযোগ করে দিল।'

'কি রকম?'

'গাড়ি নিয়ে লেকি পাস-এর দিকে যাচ্ছিল ওরা, ওখান থেকে ক্যাণ্টনে কেটে পড়া খুব সহজ। কিন্তু পথে অ্যাক্সিডেন্ট করল গাড়ি, মারা গেল শহীদ আশরাফ। সুযোগটা বুঝতে ভুল করেনি শফিক। নিজের হাতের আঙটি খুলে আশরাফের আঙুলে পরিয়ে দিল সে। তার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল নিজের সিগারেট কেস। তারপর আগুন ধরিয়ে দিল গাড়িতে। নির্জন পার্বত্য এলাকা, সময়টা ছিল ভোর

ভারটে, কাজেই কারো চোখে ধরা পড়তে হয়নি শফিককে। কাছাকাছি শহর থেকে একটা সাইকেল চুরি করে সে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে রিপালস বে-র বাড়িতে। হিরোইনটা কোথায় সরিয়েছিল সঠিক জানি না. বোধহয় হোটেল কসমোপলিটানেই নিয়ে গিয়েছিল। এইটুকু আমি অনুমান করে বলছি, তবে অন্য কিছু ঘটেছিল বলেও মনে হয় না। আশরাফের লাশটাকে ওর নিজের লাশ হিসেবে সনাক্ত করার জন্যে সুজিকে রাজি করায় সে। তারপর কাউলুনের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গিয়ে গা ঢাকা দেয়।'

'তা করল কেন?'

'কাজটা তো আসলে ঝোঁকের মাথায় হুট করে হঠাৎ ধনী হবার সুযোগ পেয়ে সাথে সাথে গ্রহণ করে সেই, কিন্তু তারপরই উপলব্ধি করল, ফেঁসে গেছে সে। মোটর অ্যাক্সিডেন্টের খবর পাবার সাথে সাথে দলের লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠল। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল, বাড়িতে হিরোইন নেই। ওরা ধরে নিল, শহীদ আশরাফ পুরো চালান নিয়ে ভেগেছে। তার খোঁজে চারদিকে লোক পাঠাল ওরা। এদিকে শফিকের সমস্যা হল, হঙকঙ থেকে কিভাবে পালানো যায়। কিন্তু পালাবে কিভাবে? সবাই জানে, শফিক মারা গেছে। কাজেই পাসপোর্টটা কাজে লাগছে না। জাল পাসপোর্ট যোগাড় করতে হলে বাইরে বেরিয়ে লোকজনকে ধরতে হবে, সে সুযোগও নেই। তার মানে, আটকা পড়ে গেল সে।'

'হিরোইন?'

এদিক ওদিক মাথা নেড়ে জ্যাসন বলল, 'ওটা বোধহয় আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। শফিকের কাছ থেকে ওটার হদিস না জেনে তাকে ওরা খুন করেনি।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝছি না,' বলল রানা, 'শহীদ আশরাফের লাশ শফিকের বাবার কাছে নিয়ে যেতে রাজি হল কেন সুজি কোয়াও?'

'হঙকঙ থেকে কেটে পড়ার দরকার ছিল সুজির। অথচ ভাড়ার টাকা ছিল না তার কাছে। লাশটা নিয়ে গেলে শফিকের বাবা টাকা দেবেন জেনেই...

'হয়ত তাই...আচ্ছা, ওয়ামের ব্যাপারটা কি?'

'সে-ও ওদের দলের লোক, হিরোইনের ভাগ পাবে আশা করে শফিকের সাথে হাত মেলায়...'

'এয়ারপোর্টে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওয়াম। ঢাকা থেকে আমি আসছি জানল কিভাবে? নিশ্চয়ই কেউ খবরটা জানিয়েছিল তাকে —কে হতে পারে সে? ওয়ামের উদ্দেশ্য ছিল শফিকের কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখা। ওগুপগু পিয়া আমাকে ক্লু না দিলে সুধীরের অস্তিত্বই আমার কাছে অজানা থেকে যেত।'

'মিঃ মোখলেসুর রহমান কি শফিকের লাশটা ফেরত চাইবেন?'

'বোধহয় চাইবেন। ওয়ামের লাশ পাওয়া গেছে?'

'এখনও খোঁজ করছে মেরিন পুলিশ। স্পীডবোট থেকে যে চীনা লোকটাকে ধরেছি আমরা তার মুখ থেকে জানা গেছে, দুটো লাশ একই জায়গায় ফেলা হয়েছে।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'অনর্গল কথা বলেছে লোক-টা, তাই না? খুব কড়া দাওয়াই দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

পাইপের ঢাউস ডগা দিয়ে নাকের পাশটা চুলকাল চীফ ইন্স-পেক্টর। 'চীনারা শাস্তি দেবার সময় স্বজাতি বা স্বজনপ্রীতির ধার ধারে না। আমার হাতে লোকটাকে তুলে দেবার আগে আধঘন্টা

ধরে নিজেদের ইচ্ছে মতো তাকে বানিয়েছে মেরিন পুলিশ। ওদের একজনকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছিল লোকটা। কাজেই তার ওপর ওরা একটু কঠোর আচরণই করেছে।' রানার চোখে চোখ রেখে কি যেন ভাবল সে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল, 'সিলভার মাইন বে থেকে একটা লাশ পাওয়া গেছে, সে সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি? লী-এনফিল্ড রাইফেল দিয়ে তার মাথা গুলি করা হয়েছে।'

'তাই নাকি?' নির্লিপ্ত দেখাল রানাকে।

'আজ বিকেলে ওদিকে গিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ মনে পড়ছে, গিয়েছিলাম। জলপ্রপাতটা খুব দেখার ইচ্ছে ছিল কিনা।'

'ওখানেই তো পাওয়া গেছে লাশটা।' তীক্ষ্ণ হল চীফ ইন্স-পেক্টরের দৃষ্টি।

'তাই?' চেহারায় অবাক ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল রানা।

'আপনি গুলির আওয়াজ পাননি?'

'কই না।'

কয়েকমুহূর্ত একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাসন। 'আমি ভেবেছিলাম আপনাকে প্রশ্ন করলে এই লাশ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাব। কিন্তু এখন দেখছি কিছুই আপনি জানেন না। তার মানে, এই খুনের রহস্যটা চিরকাল অমীমাংসিতই থেকে যাবে।'

রানা কোন উত্তর করল না।

নিভে যাওয়া পাইপে তামাক ভরে নিল চীফ ইন্সপেক্টর। 'সুধী-রের একটা বোন আছে। ভারি সুন্দর দেখতে। কোথায় আছে সে,

জানেন ?'

'নিশ্চয়ই রিপালস বে-র বাড়িতে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে···

'ওখানে নেই সে···খবর নিয়েছি আমরা,' গম্ভীর স্বরে বলল জ্যাসন। 'শেষ কখন, কোথায় তাকে দেখেছেন আপনি ?'

'সিলভার মাইনে যাবার সময়, ফেরী বোটে। এক বুড়ি চাকরাণীকে কি যেন দেবার জন্যে যাচ্ছিল সে।'

'তারপর তাকে আর দেখেননি আপনি ?'

'কই দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আমার ধারণা, সুধীরের ওই বোন কণিকাই পুলিশ স্টেশনে ফোন করে জানায় আপনার ঘরে সুধীর আছে।'

'অসম্ভব নয়। মেয়েটা আসলে খারাপ না। সুধীরের বোনও নয় সে। সুধীর ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে নিজের কাছে আটকে রেখেছিল···'

হঠাৎ হাসল চীফ ইন্সপেক্টর। 'এসব আমরা জেনেছি, মিঃ ডিউক। জাল পাসপোর্ট নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে এখানে আসে সে।'

'আরো কিছু বলতে চান মনে হচ্ছে ?' ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা।

'ওর টেলিফোন কলটা ট্রেস করতে পেরেছি আমরা। হোটেল থেকে অপারেটর জানায়, কলটা করা হয়েছে আপনার স্যুইটের সংলগ্ন বাথরুম থেকে। রাত দশটার দিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও দেখা গেছে তাকে। আমার বিশ্বাস, মেয়েটা এখনও আপনার স্যুইটেই আছে।'

'সম্ভবত···আমিও তাই আশা করছি।' হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে চোখ রেখে বলল রানা। তারপর মুখ তুলল ও। 'মেয়েটা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, চীফ ইন্সপেক্টর। কি আশা করেন আপনি ?

আপনার হাতে ওকে তুলে দেব?'

'কিন্তু একজন পুলিশ অফিসারের কাছে মিথ্যে কথা বলাও তো ভাল কথা নয়।' সী-গালের পালক দিয়ে টোবাকো পাইপটা পরিষ্কার করতে করতে বলল চীফ ইন্সপেক্টর। 'যাই হোক, মেয়েটার বিরুদ্ধে আমরা কোন অ্যাকশন নিচ্ছি না। ও যে শুধু আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছে তাই নয়, ড্রাগ স্মাগলারদের এই রিঙটাকে ভাঙার একটা সুযোগও করে দিয়েছে আমাদেরকে। কিন্তু,' মুখ তুলে তাকাল সে, 'আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হঙকঙ ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। চব্বিশ ঘন্টা পর যদি এখানে তাকে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে কিছু না করে আমাদের উপায় থাকবে না। আশা করি কথাটা তাকে আপনি জানিয়ে দেবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। বলব ওকে। হঙকঙ ছেড়ে আমার নিজেরও চলে যাবার সময় হয়েছে। এখানে আর কিছু করার নেই আমার। যদিও সুজি কোয়াঙ-র খুনী কে তা এখনও আমি জানতে পারিনি। সে যেই হোক, ঢাকাতেই আছে সে। এখানে আসার পর যা কিছু জেনেছি, সেগুলোর সাহায্যে খুনীকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করি।'

'হঙকঙ ছাড়ার আগে আমাকে একটা খবর দেবেন,' বলল জ্যাসন। 'অনুমতি নিতে হবে, তা বলছি না। নতুন কোন তথ্য পেলে সেটা আপনাকে জানাতে চাই।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল ও। 'এখন আমি হোটেলে ফিরে গিয়ে ঘুম দেব।'

'কিন্তু ওই রকম একটা সুন্দরী মেয়ে আপনাকে আদৌ ঘুমাতে দেবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।' চেহারায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য

ফুটিয়ে বলল চীফ ইন্সপেক্টর।

রিপালস বে হোটেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল রানা। প্যাসেজে নতুন একটা চীনা ছেলেকে দেখল ও। তার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলল।

ভেতরে আলো জ্বলছে। একটা আর্মচেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছে কণিকা। খুটখাট আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সে, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। দু'চোখে রাজ্যের ভীতি ফুটে উঠেছে।

'শান্ত হও,' দরজাটা বন্ধ করে বলল রানা। 'ভয় পাবার আর কোন কারণ নেই তোমার।'

'গুলির আওয়াজ শুনে আমি মনে করেছি, আপনাকে ওরা মেরে ফেলেছে…।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কণিকা।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা। 'পুলিশকে ফোন করে আমাকে বাঁচিয়েছ তুমি,' বলল ও। 'ধন্যবাদ।'

'ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম, সুধীর যদি শুনতে পেত ডায়া-লের আওয়াজ…।'

'সে যাক,' বলল রানা। 'তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে। দেশে ফিরতে পারবে এখন, পুলিশ বলেছে তোমার বিরুদ্ধে ওরা কিছু করবে না, যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হঙকঙ ত্যাগ কর। ভাড়ার টাকা আমার কাছ থেকে পাওনা হয়েছে তোমার। নিজের পাসপোর্টই ব্যবহার করতে পারবে। আছে তো?'

গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল কণিকা। 'আছে। কিন্তু সুধীর…?'

'পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। তার জন্যে বরং ভালই হয়েছে ব্যাপারটা। সারা জীবন জেল খাটতে কষ্ট হত ওর।'

'সত্যি মারা গেছে?' শিউরে উঠল কণিকা।

'আমি এখন ঘুমাব,' দ্বিতীয়বার একই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। 'তার আগে শাওয়ারটা সেরে আসি। তুমিও তো সারারাত জেগে বসে আছ...ঠিক আছে, বিছানাটা তোমার, আমি ডিভানে শোব।'

শাওয়ার সেরে বেডরুমে ফিরে এল রানা।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছে কণিকা। তার পরনের সব কাপড়-চোপড় পড়ে রয়েছে মেঝেতে। বিছানার ওপর একটা চাদরের নিচে শুয়ে আছে সে।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। তারপর চাদরের ভেতর থেকে হাত দুটো বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল কণিকা।

ঢাকা। পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

একজন কনস্টেবলের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদের চেম্বারের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। মনোযোগ দিয়ে একটা ফাইল দেখছিল ফয়েজ আহমেদ, অনুমতি না নিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকেছে বুঝতে পেরে রাগের সাথে মুখ তুলল সে। রানাকে দেখেই নিজেকে সামলে নিল, চেহারায় ফুটে উঠল বিস্ময় এবং আগ্রহের ছাপ। 'হ্যালো, ডিউক! ফিরে এসেছ তাহলে? আমি তো ভাবলাম, হওকঙের মতো জায়গায় তোমার মতো বাজী কি আর ঠাঁই পাবে। ওখানকার মাস্তানরা তোমাকে গোখরুর গায়েবই করে ফেলবে। কিন্তু এখন দেখছি বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছ। বস, বস। কি খাবে বল? চা?'

কথা না বলে ডেস্কের সামনের চেয়ারটায় বসল রানা, পায়ের

ওপর পা তুলে দিয়ে সরাসরি তাকাল ফয়েজ আহমেদের দিকে।
'আপনার কেসের খবর কি তাই বলুন। খুনীকে ধরতে পেরেছেন?'

'আরে না। তার পিছনে এখনও লাগিনি আমরা। সময় কোথায়। প্রথমে আমরা সেই রহস্যময় আতিকুল্লাহ খানকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। তাকে পেলেই সুজি কোয়াও র...'

'বুঝেছি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা, 'যেখানে দেখে গিয়েছিলাম সেখানেই আছেন আপনারা, একচুলও এগোতে পারেননি।'

'তুমি?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ, ঝুঁকে পড়ল ডেস্কের ওপর। 'ওখানে গিয়ে তুমি কি উদ্ধার করে এলে শুনি?'

'আপনার জন্যে চমকপ্রদ একটা তথ্য উদ্ধার করে এনেছি,' বলল রানা। 'সুজি কোয়াও যে লাশটা হংকং থেকে নিয়ে এসেছিল সেটা কার লাশ জানেন?'

'শফিকের।'

'না। ওটা শফিকের লাশ নয়।'

বোকার মতো কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ফয়েজ আহমেদ। তারপর রুমাল বের করে ধীরে ধীরে মুখের ঘাম মুছল সে। 'দেখ ডিউক, আমার সাথে চালাকি কর না। মিছে কথা বলে আমাকে যদি বোকা বানাবার চেষ্টা কর...'

'বড় বেশি বাজে কথা বলেন আপনি,' বিরক্তির সুরে বলল রানা। 'যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। মাত্র দু'দিন আগে খুন হয়েছে শফিক। সাগর থেকে ব্রিটিশ পুলিশ উদ্ধার করেছে তার লাশ। এই হপ্তার মধ্যে প্লেনে তুলে ঢাকায় পাঠানো হবে।'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল ফয়েজ আহমেদ। তারপর

ফিসফিস করে বলল, 'কি আশ্চর্য। তাহলে কফিনের ভেতর কার লাশ ছিল ওটা?'

'শহীদ আশরাফ নামে আর একজন বাংলাদেশীর ড্রাগ স্মাগলার।'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে জানতে চাইল ইন্সপেক্টর, 'মিঃ মোখলেসুর রহমানের সাথে দেখা করেছ?'

'করব।'

নড়েচড়ে বসল কয়েজ আহমেদ। 'আগাগোড়া পুরো ঘটনাটা খুলে বল আমাকে···না, এক মিনিট অপেক্ষা কর, তোমার বক্তব্য লিখিয়ে নিতে চাই আমি।' কলিং বেল বাজিয়ে একজন স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে পাঠাল সে।

যুবা বয়সের একজন স্টেনোগ্রাফার ঢুকল ভেতরে রানার পাশেই বসল সে। শুরু করল রানা। কণিকাও ওর সাথে ঢাকায় এসেছে, এই কথাটা বাদ দিয়ে হংকংএ যা যা ঘটেছে সব এক এক করে বলল ও।

ঢাকা বিমান বন্দরেই রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে কণিকা। নাগরিকত্ব আর চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে বাংলাদেশে থেকে যাবে, আভাসে এই রকম একটা ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল রানাকে সে। কিন্তু রানা তাকে নিরাশ করেছে। বলেছে, ভাবাবেগের বশে এ-ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিল বলে আরেকবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে রানা, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে কিছু টাকা আর কিছু উপহার কিনে দিয়েছে তাকে। বিদায় নেবার সময় চোখ দুটো ছল ছল করছিল কণিকার। 'আর আমাদের দেখা হবে না?' ধরা গলায় জানতে চেয়েছিল সে।

সিঁড়িপথে ধাপ বেয়ে নেমে চলে এসেছে রানা।

রানার বলা শেষ হতে স্টেনোগ্রাফারকে বিদায় করে দিল ফয়েজ আহমেদ। নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে রানাকে খুঁটিয়ে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর জানতে চাইল, 'কিন্তু এসব থেকে বোঝা গেল না, মুজি কোয়াও খুন হল কেন?'

'বোঝার সময় পেরিয়েও যায়নি,' বলল রানা। 'ওই কফিনটা খুলে দেখতে হবে একবার। ওতে তো আর শফিকের লাশ নেই, কাজেই কবর থেকে তুলতে দিতে মীর সাহেব বোধহয় আপত্তি করবেন না?'

'আপত্তি করতেও পারেন...'

'সেটা আমি দেখব,' বলল রানা।

কাগজে হিজিবিজি দাগ কাটতে কাটতে বলল ফয়েজ আহমেদ, 'ওখানেই আমার মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। কফিনটা প্রথমেই আমার খুলে দেখা উচিত ছিল।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'চললাম। মীর সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে।'

'তুমি তাঁর অনুমতি পেলেই জানাবে আমাকে, কেমন? তোমার ফোনের আশায় থাকব আমি, তাই তো?'

'অনুমতি পেলেই জানাব আপনাকে,' বলে বেরিয়ে এল রানা।

গাড়িতে ফিরে এসে সিগারেট ধরাল ও। মীর সাহেবের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। তার আগে পারভিনকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা দরকার। সেটা বিকেলের দিকে হলেই ভাল হয়। ঠিক করল, আগে রঞ্জি বিল্ডিঙেই ফেরা যাক। ওর অফিসটার অস্তিত্ব এখনও আছে কিনা সেটা একবার দেখা দরকার।

রক্সি বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি থেকে নামল রানা। লিফটে চড়ে উঠে এল টপ ফ্লোরে।

করিডোরের দু'পাশে সারি সারি অফিস কামরা। দরজায় হরেক রকম নামফলক। প্রথমেই বর্ণবীথি বাণী চিত্র, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সংস্থা। তারপর জোহরা ট্রাভেল। ছোট একটা প্যাসেজ, প্যাসেজের ওপাশেই—ডিউক, কনসালট্যান্ট' তার পরই বেশ বড় একটা সাইনবোর্ড, 'জাকের আলি চৌধুরী, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট'।

নিজের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। বর্ণবীথি বাণী-চিত্রের দরজার আড়াল থেকে ঠিকই ওকে দেখতে পেয়েছে হুকুম আলি। প্রায় ছুটে কাছে চলে এল সে। রানা ঘাড় ফেরাতেই একগাল হাসল সে। 'স্বে, স্যার। আমি হুকুম আলি। হঙকঙ থিকা আইয়া পড়লেন, স্যার? লগে কিছু দেকতাছি না ক্যান, কিছু আনেন নাই?'

'কিছু আনতে গেছি তা কে বলল তোমাকে?' দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। 'যাও, চা নিয়ে এস।'

চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল হুকুম আলি, 'আনতাছি, স্যার।'

ঘরের জানালাগুলো সব খুলে দিল রানা। পাশের কামরা থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট জাকের আলি চৌধুরীর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর পাচ্ছে ও। সেক্রেটারীকে ডিকটেশন দিচ্ছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় মিনিট দুয়েক ধরে ওর গলাটা শুনল রানা। তারপর ধীর পায়ে ডেস্কের কাছে ফিরে এল। চিঠিপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখল একবার। মনটাকে স্থির করতে পারছে না ও। কোন ব্যাপারই বেশিক্ষণ ধরে ভাবতে পারছে না। মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বারবার। চা নিয়ে

ফিরে এল হুকুম আলি, দেখল, চেয়ারে বসে ডেস্কের ওপর মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে রানা। চা রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

পাঁচ মিনিট পর চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলল রানা। মীর মঞ্জিলের বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করতেই অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিল পারভিন। 'হ্যালো?'

'ডিউক। মীর সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। আজই বিকেলে।'

অপরপ্রান্তে ঝাড়া ছয় সেকেণ্ড চুপ করে থাকল পারভিন। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'বেশ তো। তিনটের দিকে আসতে পারেন।'

'ভেরি গুড' বলল রানা, কিন্তু তারপরও ফোন ছাড়ল না। পারভিন কিছু জিজ্ঞেস করবে আশা করে অপেক্ষা করল।

'কিছু জানতে পেরেছেন?' কয়েক সেকেণ্ড পর চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল পারভিন। গলার আওয়াজটা ব্যাকুল কিনা ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

'দেখা হলে বলব,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা।

লাঞ্চ সেরে নিজের সেই পুরনো ডেরায় ফিরল রানা। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল, পোশাক পাল্টাল, তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে

মীর মঞ্জিল। উর্দি পরা বাটলার দরজা খুলে দিল রানাকে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল অন্দরমহলের দিকে। সোজা পারভিনের অফিস কামরার সামনে এসে থামল বাটলার, নক করল, পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল এক পাশে। ভেতরে ঢুকল রানা। ডেস্কে বসে কাজ করছে পারভিন। চেহারাটা ম্লান, চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি। 'আসুন, মিঃ

ভিউক। বসুন।'

এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। সিগারেট ধরাল। মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল পিছনের দরজাটা। রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পারভিন। তার চোখের কোলে রাত জাগার কাল ছাপ।

'মিনিট দশেক পর আপনার সাথে দেখা করবেন মিঃ রহমান,' বলল সে। 'আপনার হঙকঙ যাওয়া সফল হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সফল এবং সার্থক হয়েছে,' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বলল রানা। ব্যাগটা থেকে একটা ফটো বের করল ও। শহীদ আশরাফের ফটো, যেটা ওকে এই পারভিনই দিয়েছিল। ফটোটা পারভিনের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। 'আমাকে দিয়েছিলেন এটা, মনে পড়ে? বলেছিলেন, এটা শফিকুর রহমানের ফটো।'

ছবিটার দিকে তাকাল পারভিন। চেহারায় ভাবের কোন পরিবর্তন নেই। কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে 'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'মীর সাহেবের সাথে দেখা হলে ফটোটা তাকে দেখিয়ে বলব, আপনি বলেছিলেন এটা তাঁর ছেলের ফটো।'

মাথা নিচু করে নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল পারভিন। 'ও কেমন আছে?'

'কে, শফিক? এখন সে মৃত।'

পারভিনকে শিউরে উঠতে দেখল রানা। মুহূর্তের জন্যে এক চুল নড়ল না সে। তারপর আবার মুখ তুলে তাকাল। চেহারাটা আগের চেয়ে ম্রিয়মান দেখাল, চোখের দৃষ্টিতে সব হারাবার ব্যথা ফুটে উঠেছে। 'কি ঘটেছিল?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'ড্রাগ স্মাগলিঙের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল সে, জানতেন আপনি?'

'হ্যাঁ··জানতাম।'

'ডাবল ক্রস করার চেষ্টা করে সে, কিন্তু সঙ্গীদের হাতে ধরা পড়ে যায়। আপনি জেনেছিলেন কিভাবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পারভিন। তারপর বলল, 'সেই জানিয়েছিল আমাকে। কেউ জানে না, স্ত্রী হিসেবে আমাকে ও অস্বীকার করার পরও আমি ওকে ভুলতে পারিনি। আমি একটা বোকা মেয়ে। ওর ওপর আমার দুর্বলতা আছে, বুঝতে পেরে এই দুর্বলতার সুযোগ নিত ও। ওর সমস্ত অপরাধের কথা আমাকে জানাত। বুঝতাম এসব আমাকে জানিয়ে ও এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পেত।'

'কিন্তু শহীদ আশরাফের ফটোটাকে শফিকের ফটো বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন কেন?'

'মিঃ রহমান একজন মহৎপ্রাণ, আদর্শ মানুষ। তাঁর মতো সৎ এবং ভাল মানুষ আমার জীবনে আমি আর দেখিনি। এই নিরীহ ভদ্রলোকের কাছে গোপন করতে চেয়েছিলাম আমি। ছেলে একজন ড্রাগ স্মাগলার এটা আমি তাঁকে জানতে দিতে চাইনি।'

'ফটোটা আপনি পেয়েছিলেন কোত্থেকে?'

'শফিক ওর বাবার কাছে বছরে একটার বেশি চিঠি না লিখলেও, আমার কাছে প্রায়ই লিখত,' বলল পারভিন। 'একটা চিঠির ভেতর ফটোটা সেই আমাকে পাঠিয়েছিল। শুধু শহীদ আশরাফের ফটো নয়, হঙকঙে ওর সাথে যাদের পরিচয় হত তাদের প্রায় সবারই ফটো পাঠাত ও বেশিরভাগই চীনা মেয়েদের ফটো। মেয়েদের ফটো পাঠিয়ে খুব মজা পেত ও, জানত আমি তাতে দুঃখ পাই। শহীদ আশরাফের ছবিটা হঠাৎ করেই একদিন পাঠায় ও। চিঠিতে লিখে-

ছিল, আশরাফের সাথে ব্যবসা করতে যাচ্ছে ও। ব্যবসার কথাটা যে মিথ্যে নয় সেটা বিশ্বাস করাবার জন্যেই বোধহয় পাঠিয়েছিল ওটা। ওর বাবাকে বলে আমি যেন ওকে পাঁচ হাজার ডলার পাঠাবার ব্যবস্থা করি, যাতে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে।'

'টাকা পাঠিয়েছিলেন?'

'মিঃ রহমানকে আমি কথাটা বলতেই সাহস পাইনি' বলল পারভিন। 'আমার নিজের অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ছিল তা থেকে হাজার দশেক টাকা পাঠিয়েছিলাম। তারপরই ওর চিঠি এল, সাংঘাতিক বিপদে জড়িয়ে পড়েছে ও। চিঠি পড়েই বুঝেছিলাম ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে ও। চিঠিতে লিখেছিল, একটা ড্রাগ স্মাগলারদের দলের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল সে। তারা এখন ওকে খুন করার চেষ্টা করছে। লিখেছিল কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে যাচ্ছে ও। শহীদ আশরাফ মারা গেছে, কিন্তু দলের লোকেরা জানে শহীদ আশরাফ নয়, মারা গেছে শফিক। ওর স্ত্রী সুজি কোয়াও আশরাফের লাশ নিয়ে ঢাকায় আসছে। ও যে মারা গেছে তা দলের লোকদের দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করাবার সেটাই নাকি একমাত্র উপায় ছিল' কাঁধ ঝাঁকাল পারভিন। 'ও যে এতটা নীচে নেমে গেছে, ভাবতেও পারিনি আমি। আমাকে অস্বীকার করায় যতটা না আঘাত পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত পেলাম ওর এই অধঃপতন দেখে। যাই হোক, আমি চাইনি এসব কথা মিঃ রহমানের কানে উঠুক। কাজটা অন্যায় হচ্ছে, ফটোটা আপনাকে দেবার সময়ই ভেবেছি কথাটা, কিন্তু মিঃ রহমানের মুখ চেয়ে অন্যায়টা না করে পারিনি।'

রানা কিছু বলল না দেখে আবার শুরু করল পারভিন। 'ওয়াম পিও হো নামে একজন চীনার ঠিকানা দেয় আমাকে ও। কোন জরুরী

খবর থাকলে আমি যেন এই লোককে চিঠি লিখি। ঢাকায় পৌঁছে মুজি যখন মারা গেল, এবং মিঃ রহমান যখন ঠিক করলেন আপনাকে তিনি হংকঙে পাঠাবেন, চিঠি লিখে আমি তখন এই ওয়াম পিঙ হো-কে সাবধান করে দিই। আমি যে আপনাকে শহীদ আশরাফের ফটো দিয়েছি, সে কথাও তাকে জানাই। মিঃ রহমানের কাছ থেকে সত্য গোপন রাখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমি।'

'কিন্তু এখন তো তাঁকে সব কথা আমার জানাতেই হবে,' বলল রানা। 'সত্য জানার জন্যেই তো আমাকে তিনি হংকঙে পাঠিয়েছিলেন।'

'নিঃসঙ্গ একজন বৃদ্ধ, তাঁকে শান্তিতে মরতে দিলে ক্ষতি কি?' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল পারভিন। 'তাঁর ছেলে অসৎ সংসর্গে পড়ে একেবারে গোল্লায় গিয়েছিল, এ-কথা জানালে তাঁর অশান্তি আরো শুধু বাড়ানোই হবে।'

'এখন আর তা সম্ভব নয়। কবর খুঁড়ে লাশ বের করে সেটা পরীক্ষা করতে হবে। পুলিশও এখন নাক গলাবে।' পারভিনের চোখে চোখ রেখে আবার বলল রানা, 'এসবের সাথে আপনি যাতে জড়িয়ে না পড়েন, সেটা আমি দেখব। এইটুকুই করতে পারি আমি।'

দরজায় নক হল, ভেতরে ঢুকল বাটলার। 'মিঃ রহমান আপনার সাথে দেখা করবেন, স্যার।'

বাটলারকে অনুসরণ করে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

নির্জন লিভিং রুমে বসে আছেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান। যেখানে তাঁকে বসে থাকতে দেখেছিল রানা, সেখানেই, সেই বেডসাইড চেয়ারে বসে আছেন তিনি। রানার মনে হল, সেই থেকে একবারও যেন তিনি

চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি। তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে, রানার উপস্থিতি যেন টেরই পেলেন না। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এস, ডিউক। বস।' রানার দিকে তাকালেন না, তবে একটা হাত তুলে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন। 'আমার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু খবর নিয়ে এসেছো তুমি?'

'এনেছি' মৃদু গলায় বলল রানা। 'কিন্তু তার কোনটাই সুসংবাদ নয়, মিঃ রহমান।'

'তা না হোক,' বললেন বৃদ্ধ। 'আমি দুঃসংবাদ শোনার জন্যেই তৈরি হয়ে আছি কি জেনেছ সব বল আমাকে।'

শফিক সম্পর্কে যা জানা গেছে, সবই বলল রানা। কিন্তু শফিক কিভাবে মারা গেছে সেটা শুধু চেপে গেল। বলল, লাশটা সাগর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সেই জানালার দিকে চোখ রেখেই সব শুনলেন বৃদ্ধ। রানার কথা শেষ হতেও কিছু বললেন না। পাশ থেকে রানা দেখল, বৃদ্ধের চোখ দুটো ছলছল করছে।

অনেকক্ষণ পর জানতে চাইলেন, 'আর কি ঘটতে বাকি থাকল তাহলে?'

'কবর খুঁড়ে লাশটা পরীক্ষা করতে চাইবে পুলিশ,' বলল রানা, 'সেজন্যে আপনার অনুমতি দরকার।'

'আমার কোন আপত্তি নেই। মৌখিক অনুমতিই বোধহয় যথেষ্ট?'

'যথেষ্ট.' বলল রানা। 'আপনার ছেলের লাশ ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি আমি। এই হপ্তার শেষ দিকে পৌছুবে।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।' মৃদু গলায় বললেন তিনি। তার-

পর ধীরে ধীরে, এই প্রথম রানার দিকে তাকালেন। 'ভাবতেও পারিনি শফিক এতটা নীচে নেমে গিয়েছিল···ড্রাগ স্মাগলার, কি জঘন্য ব্যাপার।'

চুপ করে থাকল রানা।

আবার জানালার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু গলায় বললেন, 'তবু, আমার ছেলে ছিল সে। আমার একমাত্র সন্তান। মীর বংশের শেষ প্রতিনিধি। ওর সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিতে পারি, দিয়েছিও। দুঃখ, মীর বংশে আলো জ্বালার মতো কেউ থাকল না।' ধীরে ধীরে আবার রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আমার মতো দুর্ভাগা কোথাও আর দেখেছ? তুমি জান না, কেউ জানে না, সুজিকে বিয়ে করার আগে ঢাকায় আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল শফিক। কিন্তু সেই বিয়েটাকে স্বীকার করেনি ও। সমাজের কথা ভেবে, বংশ মর্যাদার কথা ভেবে বিয়েটাকে আমিও স্বীকৃতি দিতে পারিনি। কি করে দেব। সাক্ষী প্রমাণ কিছুই যে ছিল না।' হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি উপলব্ধি করলেন বাইরের একজন লোকের কাছে অনেক বেশি কথা বলে ফেলছেন। রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছলেন। খোলা জানালাটা আবার তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিল। 'ওর স্ত্রী, সুজি কোয়াও সম্পর্কে কিছু জানা গেল? কে তাকে খুন করেছে?'

'এখনও জানতে পারিনি,' বলল রানা। 'তার খুনীকে খুঁজে বের করি, এখনও আপনি তা চান?'

'নিশ্চয়ই চাই।' জোর দিয়ে বললেন বৃদ্ধ।

'তাহলে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দরকার হবে আমার,' বলল রানা। 'আপনার ছেলের অবর্তমানে আপনার সম্পত্তির মালিক হবে কে?'

অবাক হলেন বৃদ্ধ। তাড়াতাড়ি রানার দিকে তাকালেন। 'তা জেনে তোমার কি দরকার ?'

'ব্যাপারটা যদি একান্তই গোপনীয় হয়, তাহলে না হয় থাক।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। শিরা ওঠা হাত দুটো চেয়ারের হাতলে সেঁটে গেল। 'না, গোপনীয় কিছু নয়। কিন্তু তুমি জানতে চাইছ কেন ?'

'শফিকের দ্বিতীয় স্ত্রী বেঁচে থাকলে আপনার উইলে কি তার নাম থাকত ?'

'অবশ্যই।'

'সম্পত্তির কতটা অংশ পেত সে ?'

'অর্ধেক।'

'তাহলে বাকি অর্ধেক কে পেত ?'

'পারভিন, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাকে আমি মেয়ের মতো ভালবাসি।'

'তার মানে এখন পারভিনই সবটা পাবেন ?'

চিন্তিতভাবে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, সবটা এখন তাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এত কেন কৌতূহল তোমার ?'

'কৌতূহলী হওয়াই আমার পেশা,' বলে বিদায় নিল রানা।

অফিস কামরার ডেস্কে এখনও বসে আছে পারভিন। পায়ের আওয়াজে মুখ তুলল সে। 'আসুন, মিঃ ডিউক।'

ডেস্কের সামনে দাঁড়াল রানা। 'শফিকের বন্ধু-বান্ধবদের একটা তালিকা আর তাদের ফটো চেয়েছিলাম আমি, মনে আছে ?'

'মাত্র পাঁচটা ফটো পাওয়া গেছে অ্যালবাম থেকে,' দেরাজ থেকে

একটা এনভেলাপ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল পারভিন। 'আমাদের বিয়েতে এরা কেউ উপস্থিত ছিল না। কিন্তু তালিকায় নাম আছে সাত জনের, এরাও কেউ আমাদের বিয়েতে উপস্থিত ছিল না। তার মানে, এদের যে-কেউ একজন সেই দাড়িওয়ালা নকল মৌলভী হতে পারে।'

এনভেলাপ খুলে ফটো এবং নামের তালিকাটা দেখল রানা। একজনও ওর পরিচিত নয়। 'ধন্যবাদ।' ফটো আর নাম ঠিকানা লেখা কাগজটা এনভেলাপে ভরে সেটা পকেটে রাখল রানা।

'কি বললেন মিঃ রহমান?'

'মীর বংশে আলো জ্বালার কেউ রইল না, সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ।'

মাথা নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকাল পারভিন, একটা নিঃশ্বাস চাপল। 'এরপর?'

'তিনি চান তাঁর পুত্রবধূর খুনী ধরা পড়ুক,' বলল রানা। 'দায়িত্বটা নিয়েছি আমি।'

'কিন্তু খুনীকে কি ধরা সম্ভব?'

তীক্ষ্ণ হল রানার দৃষ্টি। 'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি। সব হত্যাকাণ্ডের পিছনেই একটা মোটিভ থাকে। সুজি হত্যাকাণ্ডের পিছনেও নিশ্চয়ই কোন মোটিভ আছে। মোটিভটা কি হতে পারে, সে-সম্পর্কেও আমার একটা ধারণা আছে। যাই হোক, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। চলি।'

রানার গমন পথের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল পারভিন।

বার

ডেরায় ফিরে এল রানা। ফোন করে ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদকে জানাল, কবর খুঁড়তে দিতে কোন আপত্তি নেই মীর সাহেবের। দল-বল নিয়ে এখুনি রওনা হয়ে যাচ্ছে জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল ইন্সপেক্টর।

আধঘণ্টার পর ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো?'

'কবর খুঁড়েছিল কেউ। কবর থেকে লাশ উধাও।' অপর প্রান্তে সাংঘাতিক উত্তেজিত ফয়েজ আহমেদের কণ্ঠ। 'কফিন বক্সে কিছু সীসা ছাড়া আর কিছু নেই।'

'সীসা।'

'হ্যাঁ, সীসা।'

'তার মানে, কফিনে বোধহয় আদৌ কোন লাশ ছিল না।' বলল রানা।

'সে কি। লাশ ছিল না।' আঁতকে উঠল ফয়েজ আহমেদ। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড রাগের সাথে হুঙ্কার ছাড়ল, 'কাজটা তুমি ভাল করছো না, ডিউক।'

'কোন্ কাজটা?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'এই যে, যা যা জান তা আমাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করছ

না। এই রকম আর কি গোপন করে রেখেছ আমার কাছ থেকে?'

'আমি যা জানি সবই আপনাকে জানিয়েছি,' শান্তভাবে বলল রানা। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারপর আমি আর মাথা ঘামাব না।'

'মাথা ঘামিয়ে কি জানতে পেরেছো তাড়াতাড়ি বল আমাকে।' খানিকটা হুমকি, খানিকটা আবদারের সুরে বলল ইন্সপেক্টর। 'কফিনে লাশ ছিল না, এ-কথা তোমার মনে হল কেন?'

'ওটা আমার একটা অনুমান। আশরাফের লাশ পুড়ে একে-বারে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেটা কফিন থেকে চুরি করে কার কি লাভ? ওটা আর সনাক্ত করা সম্ভব নয়। কবর থেকে লাশ চুরি করার ঝুঁকি আছে, কেউ সে ঝুঁকি অকারণে নেবে কেন? কফিনে শফিকের লাশ ছিল না, এটা জানার পর আমি মনে করেছিলাম ওটায় বোধহয় শহীদ আশরাফের লাশ আছে। কিন্তু এখন ভাবছি, কফিনে কোন লাশই ছিল না। সীসা ভরে ঢাকায় পাঠান হয়েছে ওটা।'

'তাহলে কবর খোঁড়া হয়েছে কেন?'

'তাই তো।' চিন্তায় পড়ে গেল রানা। পরমুহূর্তে কারণটা পরি-ষ্কার হয়ে গেল। বাঁ হাত দিয়ে নিজের উরুর ওপর চাপড় মারল ও। 'কি বোকা আমি! পানির মতো সহজ ব্যাপার, অথচ মাথায় ঢোকেনি।'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' অপরপ্রান্ত থেকে শাসানির সুরে বলল ইন্সপেক্টর।

'কফিনের ভেতর হিরোইন ছিল।' বলল রানা। 'দু'হাজার আউন্স হিরোইন। হঙকঙ থেকে ঢাকায় স্মাগল করার চমৎকার একটা

মাধ্যম···

'ঠিক।' উৎফুল্ল গলা শোনা গেল ফয়েজ আহমেদের। 'ঠিক ধরেছ। আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি, ডিউক···'

'জিনিসটা শফিক হাইজ্যাক করার পর,' বলল রানা, 'আবিষ্কার করল, সে ফেঁসে গেছে। হঙকঙ ছেড়ে বেরুবার উপায় নেই তার, ওদিকে দলের লোকেরা তাকে খুঁজছে। দু'হাজার আউন্স হিরো-ইন নিশ্চয়ই বিরাট একটা সম্পদ। দলের লোকদের বিশ্বাস করা-বার দরকার ছিল শফিকের, যে সে মারা গেছে। কাজেই এক ঢিলে দুটো পাখি মারার ব্যবস্থা করল সে। তার লাশ ঢাকায় পাঠাতে হবে, সেজন্যে টাকা দরকার, এই কথা জানিয়ে সুজিকে দিয়ে বাবার কাছে চিঠি লেখাল শফিক। মনে রাখবেন শফিকের কাছে কোন টাকা সে সময় ছিল না। কফিন ঢাকায় আনার জন্যে বুড়ো মীর সাহেব টাকা পাঠালে তবেই হিরোইনটা হঙকঙ থেকে পাচার করা সম্ভব, এবং এটাই একমাত্র উপায় ছিল। সুজিকে পাঠিয়ে লাশ নিয়ে আসার দরকারী অনুমতি আদায় করা হয়। পরে কোন এক সময় আশরা-ফের লাশটা নিশ্চয়ই ফেলে দেয়া হয় সাগরে, তার জায়গায় কফিনে ভরা হয় হিরোইন আর সীসা। শফিক হঙকঙে আটকা পড়লেও, হিরোইন এবং নিজের স্ত্রীকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিল সে।'

'কবর খুঁড়ে কফিন থেকে হিরোইনটা তাহলে সরাল কে?' বুক ভরা আশা নিয়ে জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ।

'আমি কিভাবে জানব। চীফ ইন্সপেক্টর জ্যাসন বলেছিল, খুন করার আগে শফিকের ওপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালানো হয়। হিরোইন কোথায় আছে তা হয়ত বলতে বাধ্য হয়েছিল শফিক। দলের লোকেরা হয়ত আমার পৌঁছবার আগেই লোক পাঠিয়েছিল

ঢাকায়। কাজটা তাদের হওয়া বিচিত্র কি ?'

'হতে পারে, তাও হতে পারে।' গম্ভীর স্বরে বলল ফয়েজ আহমেদ। 'যাই হোক, হিরোইন-টিরোইন নারকোটিক ডিপার্টমেন্টের মাথাব্যথা, আমি কেন নাক গলাতে যাই। যাক, সব সমস্যারই তাহলে মীমাংসা হয়ে গেল।'

'কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান এখনও যে হল না।'

'সেকি! আবার কিসের সমস্যা।'

'চীনা মেয়েটা আমার অফিসে কেন এসেছিল, কে তাকে গুলি করে খুন করল, এসব প্রশ্নের উত্তর কি পাওয়া গেল ?'

থমথমে গলায় অপরপ্রান্ত থেকে বলল ইন্সপেক্টর, 'না।'

'হিরোইনের সাথে এই হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই, এটা ধরে নিয়ে কেসটা নিয়ে মাথা ঘামালে দাঁড়ায় সুজি কোয়াও মীর সাহেবের অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হত—মীরসাহেব নিজে আমাকে বলেছেন কথাটা। সেইসাথে বলেছেন, সুজি মারা যাওয়ায় এখন তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে সেক্রেটারী পারভিন।'

'আচ্ছা!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল ফয়েজ আহমেদ। 'তাই নাকি ? তুমি তাহলে মনে করছ সুজিকে ওই সেক্রেটারী পারভিন খুন করেছে ?'

'ঠিক তা মনে করছি না,' বলল রানা। 'আমি শুধু বলতে চাইছি প্রায় দশ কোটি টাকার একটা মোটিভ আছে তার। আপনাকে আমি আগেও বলেছি, পারভিনের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বয়-ফ্রেণ্ড থাকতে পারে। কিন্তু আমার এসব অনুমান সত্যি হলেও কিন্তু চীনা মেয়েটার আমার অফিসে এসে খুন হবার ঘটনাটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।'

'আরেকটু মাথা ঘামাও, সব সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে,' দ্রুত বলল ইন্সপেক্টর। 'আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি মেয়েটার কোন বয়-ফ্রেণ্ড আছে কিনা। নতুন কিছু জানতে পারলেই ফোন করবে আমা-কে, তাই তো?' রানার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে রিসিভার রেখে দিল সে।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। বিকেল পাঁচটা। একটু ব্যস্তভাবেই দরজায় তালা লাগিয়ে ডেরা থেকে বেরিয়ে এল ও। গাড়ি নিয়ে ছুটল রব্রি বিল্ডিঙের দিকে। পথে একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে থামল একবার। ছবি আঁকার সরু একটা তুলি আর এক শিশি কাল কালি কিনল।

অফিস কামরার দরজা খুলল রানা। ভেতরে ঢুকে ভাল করে চারদিকটা দেখে নিল একবার। তারপর ঢুকল নিজের চেম্বারে। কার্পেটের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালা খুলল। একটু পর পরি-চিত একটা কণ্ঠস্বর ঢুকল কানে। পাশের কামরার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট জাকের চৌধুরী, তার সেক্রেটারী মেয়েটাকে বলছে, 'আমি গেলাম! সকালে দেখা হবে!' প্যাসেজে তার পায়ের আওয়াজ পেল রানা। ভাবল, অফিস খোলা দেখে নিশ্চয়ই ঢুঁ মারবে একবার। কিন্তু না, ভারী পায়ের আওয়াজ থামল না, ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল দূরে।

পকেট থেকে পারভিনের দেয়া এনভেলাপটা বের করে ডেস্কের কাছে ফিরে এল রানা। ডেস্কের ওপর এনভেলাপটা রেখে চিন্তিত-ভাবে খোলা দরজার দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল ও, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে। জাকের আলি চৌধুরীর অফিস ডেস্কের ওপর, কাঁচের নিচে অনেকদিন আগে একটা জিনিস দেখেছিল ও, সেটা এখন দরকার ওর।

প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। সাড়ে পাঁচটার ওপর বাজে, বেশির-ভাগ অফিসই বন্ধ হয়ে গেছে। প্যাসেজ একেবারে ফাঁকা। ইন-ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্টের অফিস খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল রানা। সামনের কামরায় কেউ নেই। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল ও। ভেতরের কামরা থেকে অস্পষ্টভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে আসছে।

এক মিনিট পর খুক খুক করে কাশল রানা। প্রায় সাথে সাথে পর্দা সরিয়ে ভেতরের কামরা থেকে উঁকি দিল সুন্দরী সেক্রেটারী মেয়েটা। তার হাতে একটা টেপ রেকর্ডার দেখল রানা। 'ও, আপনি!' স্বস্তির সাথে হাসল সে। 'আমি ভেবেছিলাম বস্ বোধহয় আবার ফিরে এলেন। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, মিঃ ডিউক!'

'জাকের সাহেব চলে গেছেন?' একটু নিরাশ দেখাল রানাকে। 'একটা ব্যাপারে পরামর্শ দরকার ছিল আমার ·· ঠিক আছে, কাল সকালে কথা বলব।' চোখের দৃষ্টি নামিয়ে মেয়েটার হাতে ধরা টেপ রেকর্ডারের দিকে তাকাল রানা। 'গান শুনছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, মানে, না!'

'হ্যাঁ, মানে, না—তার মানে?'

ফিক করে হেসে ফেলল মেয়েটা। 'না, মানে, বস্ তো গান শোনার জন্যে এটা ব্যবহার করেন না, তাই এখানে গানের কোন ক্যাসেট নেই। কিন্তু আজ আমি বাড়ি থেকে একটা ক্যাসেট নিয়ে এসেছি গান শুনব বলে। বস্ হয়ত অফিসে গান-বাজনা পছন্দ কর-বেন না, তাই···'

'বুঝেছি,' হেসে উঠে বলল রানা। 'তাই গান শোনার কথাটা স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছিলেন। ভয় নেই, তাকে আমি কিছু বলব

না। তা, টেপ রেকর্ডারটা এখানে রাখা হয়েছে কেন ?'

'বস্ এটা ডিকটেশন দেবার জন্যে ব্যবহার করেন।'

'ও,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, আপনি গান শুনুন।' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে এল জাকের আলি চৌধুরীর অফিস কামরা থেকে।

এক ঘণ্টা পর। মীর মঞ্জিল। সেক্রেটারী পারভিনের অফিস কামরা।

এনভেলাপ থেকে ছয়টা ফটো বের করে পারভিনের সামনে ডেস্কের ওপর এক এক করে রাখল রানা। ফটোর প্রতিটি লোকের মুখে রঙ তুলি দিয়ে দাড়ি আঁকা রয়েছে।

ফটোগুলোর দিকে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিয়েই মুখ তুলল পারভিন। 'আপনাকে তো আমি পাঁচটা ফটো দিয়েছিলাম, ছয়টা হল কিভাবে।'

'কোন প্রশ্ন নয়,' বলল রানা। 'ফটোগুলো দেখে বলুন, সেই নকল মৌলভী এদের মধ্যে আছে কিনা ?'

ফটোগুলোর দিকে আবার তাকাল পারভিন। প্রথম ফটোটা সরিয়ে রাখল ও। দ্বিতীয়টাও। কিন্তু তৃতীয় ফটোর দিকে চোখ পড়তেই চোখ দুটো ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। ঝট করে রানার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকাল সে, তারপর আবার ঝুঁকে পড়ল ফটোটার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড গভীর মনোযোগের সাথে দেখল ছবিটা। তারপর আবার তাকাল রানার দিকে। 'কোন সন্দেহ নেই। এই সেই লোক। কে ও ? আমি যাদের ফটো দিয়েছি, তাদের মধ্যে কেউ ? নাম··· ?'

হাত বাড়িয়ে তিন নম্বর ফটোটা তুলে নিল রানা। শার্টের পকেটে ফেলল সেটা। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'আপাততঃ বিদায়। তবে, আবার আমি আসতে পারি। তখন হয়ত মীর সাহেবের সাথে দেখা করার দরকার হবে আমার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পারভিনও। 'দাঁড়ান!' চোখে ব্যাকুলতা ফুটে উঠল তার। 'লোকটার পরিচয় বলে যান আমাকে। প্লীজ!'

'কিছু বলার সময় এখনও হয়নি,' বলে বেরিয়ে এল রানা।

গাড়ি নিয়ে সোজা আবার নিজের অফিসে ফিরে এল ও। সাতটার ওপর বাজে। রক্সি বিল্ডিঙের সব অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। নিজের অফিসের তালা খোলার সময় ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল, জাকের আলি চৌধুরীর অফিসেও তালা ঝুলছে।

নিজের অফিসে কিছুক্ষণ বসল রানা। প্যাসেজে লোকজনের আসা যাওয়া নেই। দেরাজ খুলে চাবির একটা রিঙ বের করল ও, তাতে এক গোছা চাবি। নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে প্যাসেজটা দেখে নিল ভাল করে। কেউ নেই কোথাও। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্টের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। তালা খুলতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না ওর। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল, ভেতর থেকে আবার তালা লাগাল। দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও, তাকাল চারদিকে। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো রয়েছে বড় একটা স্টীলের ফায়ারপ্রুফ আলমিরা। তালাটা পরীক্ষা করল ও। ওর রিঙের কোন চাবি দিয়ে খোলা যাবে না এটা। নিজের অফিসে ফিরে এল ও, কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে আবার ঢুকল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্টের অফিসে।

আলমিরার তালা খোলার জন্যে একটানা পনের মিনিট ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। একবার ভাবল, তালাটা ভেঙে ফেলবে কিনা, কিন্তু খানিকক্ষণ ইতস্তত করার পর ইচ্ছেটাকে বাতিল করে দিল। ভেতরের কামরাটা পরীক্ষা করল ও। এখানে ডেস্ক, টেপরেকর্ডার, টাইপরাইটার, চেয়ার এবং ফাইলিং কেবিনেট ছাড়া আর কিছু নেই। টেপরেকর্ডারের পাশে একটা ক্যাসেট পড়ে রয়েছে। ফাইলিং কেবিনেটটা পরীক্ষা করল ও। কাগজ-পত্র ছাড়া আর কিছু নেই। ও যা খুঁজছে তা যদি এই অফিসে থাকে তাহলে সেটা স্টীলের ওই আলমিরাতেই আছে।

অফিসের আলো জেলে এবং ঘর দুটোর দরজা খোলা রেখে ফিরে এল রানা। টেলিফোন গাইড খুলে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্টের বাড়ির ফোন নাম্বার বের করল ও। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল। কিন্তু অপরপ্রান্তে কেউ রিসিভার তুলল না।

ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদকে ডাকবে কিনা ভাবল রানা। কিন্তু এই কেসের শেষ অংশে কাউকে হাত লাগাতে দিতে মন চাইল না। ওর সন্দেহ মিথ্যেও হতে পারে, কিন্তু মিথ্যে হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঠিক করল, আগে কথা বলবে জাকের আলি চৌধুরীর সাথে, তারপর খবর দেবে ফয়েজ আহমেদকে।

আবার ডায়াল করল ও। খানিক পর আবার। রাত ন'টার দিকে অপরপ্রান্তে পাওয়া গেল তাকে।

'আমি ডিউক বলছি।'

'আরে, মিঃ ডিউক··· ব্যাপার কি বলুন তো! আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি আমাকে ফোন করবেন! বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি? হঙকঙে কেমন বেড়ানো হল?'

'ভাল,' বলল রানা। 'আমার অফিস থেকে বলছি, মিঃ চৌধুরী। ভুল করে একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম, সেটা নিতে এসে দেখি আপনার অফিসের দরজা খোলা, আলোও জ্বলছে, অথচ ভেতরে কেউ নেই। আপনার নাম ধরে ডাকলাম, আপনার সেক্রেটারীর নাম ধরে ডাকলাম, কিন্তু কারো সাড়া পেলাম না। আপনার সেক্রেটারী বোধহয় যাবার সময় দরজায় তালা দিতে ভুলে গেছে। দারোয়ানকে ডেকে তালা লাগিয়ে দিতে বলব, নাকি··· ?'

জাকের চৌধুরীর নিঃশ্বাস আটকে যাবার আওয়াজ পেয়েছে রানা। কোনমতে বলল, 'সে কি! আজব ব্যাপার! এমন তো হবার কথা নয়! ঠিক আছে, আমি আসছি···'

'চোর-টোর এসেছিল বলে মনে হয় না···

'টেপ রেকর্ডার আর টাইপ রাইটার ছাড়া চুরি হবার মতো কিছু নেই ওখানে,' দ্রুত বলল জাকের চৌধুরী, 'তবু আমার বোধহয় একবার যাওয়া দরকার।'

'আপনার ইচ্ছে। আমি কিন্তু দারোয়ানকে ডেকে তালা লাগাবার ব্যবস্থা করতে পারতাম।'

'না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমিই আসছি। মেয়েটা তালা লাগায়নি কেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এর আগে কখনও এ ধরনের ভুল হয়নি তার।'

'কোন কারণে হয়ত তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরে গেছে। যাই হোক, আমি কিন্তু অফিস থেকে চলে যাচ্ছি। নাকি আপনি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব ?'

'না-না। তার কোন দরকার নেই। খবরটা দিয়েছেন সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, মিঃ ডিউক। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না। ছাড়লাম।'

রিসিভার রেখে দিয়ে অফিসের আলো নিভিয়ে দিল রানা প্যাসেজে বেরিয়ে এসে তালা দিল দরজায়। তারপর জাকের আলি চৌধুরীর অফিসে ঢুকল। দরজা খোলাই থাকল, আলোও নেভাল না রানা। বসল ভেতরের কামরার ডেস্কের ওপর। পকেট থেকে রিভলভার বের করে অফ করল সেফটিক্যাচ। কোলের ওপর রাখল সেটা। তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

দশ মিনিট পর প্যাসেজে দ্রুত পায়ের আওয়াজ পেল রানা হাঁটার ভারি শব্দটা পরিচিত, কে আসছে বুঝতে অসুবিধে হল না। ডেস্ক থেকে নিঃশব্দে নেমে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। দরজার ফাটলে চোখ রেখে সামনের কামরার ভেতর তাকাল। প্যাসেজে দেখা গেল জাকের চৌধুরীকে। উদ্বিগ্ন চেহারা, মাথার চুল এলোমেলো, চোখ দুটো উদভ্রান্ত। দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। সামনের কামরাটা দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল একবার। ভেতরে ঢুকল। ভেতর থেকে বন্ধ করল অফিসের দরজা। তারপর সোজা এগিয়ে এল ভেতরের কামরার দরজার দিকে।

দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিল রানা। দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল জাকের চৌধুরী। ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখল। তারপর পিছু হটে ফিরে এল সামনের কামরার মাঝখানে। পকেট থেকে একটা চাবির রিঙ বের করল সে। তারপর এগোল স্টীল আলমিরার দিকে।

আবার দরজার ফাটলে চোখ রাখল রানা। দেখল, স্টীল আলমিরার তালা খুলছে জাকের চৌধুরী। দরজার সামনে থেকে সরে এল রানা। ডেস্ক থেকে রেকর্ডার আর ক্যাসেটটা নিয়ে চৌকাঠ

পেরিয়ে ঢুকল সামনের কামরায়। ওর উপস্থিতি টের পায়নি লোকটা। হাঁটু মুড়ে বসে আছে স্টীল আলমিরার সামনে, কপাট দুটো উন্মুক্ত। ভেতরে দেখা যাচ্ছে বোতল, বাক্স, গ্লাস ফাইল এবং অন্যান্য কেমিস্ট স্যাম্পল।

'হিরোইনটা চুরি যায়নি তো?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা।

শিউরে উঠল জাকের চৌধুরী। তারপর ধীরে ধীরে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল। রানাকে দেখে থরথর করে কেঁপে উঠল তার সারা শরীর। হাতের রিভলভারটা সামান্য একটু তুলল রানা, যাতে দেখতে পায় জাকের চৌধুরী। সাদা খড়িমাটির মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার চেহারা। একটা ঢোক গিলল। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। রিভলভারের দিকে নয়, তাকিয়ে আছে টেপ রেকর্ডারের দিকে।

'আপনি···এখানে কি করছেন আপনি?' গলার আওয়াজটা খসখসে, কাঁপা।

'আলমিরাটা খোলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তালাটা সাংঘাতিক!' লোকটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বলল রানা। 'তাই ভাবলাম আপনি এসে যদি তালাটা খুলে দেন তো খুব ভাল হয়। সরে যান! কিন্তু সাবধান, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন না!'

বিড় বিড় করে কি বলল জাকের চৌধুরী, বোঝা গেল না। টলতে টলতে এগোল সে। নিজের চেয়ারে ধপাস করে বসল। তারপর মুখ ঢাকল দু'হাত দিয়ে।

খোলা আলমিরার নিচের শেলফে তাকাল রানা। ছোট আকারের প্রায় পঞ্চাশটা পার্সেল নিটোলভাবে সাজানো রয়েছে।

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ডেস্কের কিনারায় বসল ও। টেপরেক-

র্ডারটা ডেস্কের ওপর রাখল। রিভলভারটা কোলের ওপর। পকেট থেকে বের করল ক্যাসেটটা। নেড়েচেড়ে দেখে কিছু বোঝা গেল না, ক্যাসেটের গায়ে কোথাও কিছু লেখা নেই। এটা সেক্রেটারী মেয়েটার ক্যাসেটও হতে পারে, হয়ত ভুল করে ফেলে রেখে গেছে। তা যদি হয় এতে রবীন্দ্র সংগীত আছে। আর তা যদি না হয়, এতে হয়ত জাকের চৌধুরীর ডিকটেশন আছে।

'পরিষ্কার উত্তর দেবেন,' বলল রানা। 'মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই, কারণ আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ আমি যোগাড় করে ফেলেছি। একটু অপেক্ষা করুন,' বলে টেপটা অন করল রানা। দেখল ব্যাটারী আছে। অফ করল সেট। তারপর ক্যাসেটটা রেকর্ডারে ঢুকিয়ে আবার সেটা অন করল।

প্রথমে অস্পষ্ট আওয়াজ। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল, আওয়াজটা একটা প্লেনের ইঞ্জিন থেকে বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল শব্দ। মুখ থেকে হাত নামিয়ে রানার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে জাকের চৌধুরী। সারা শরীরে একটা ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করল রানা। টেপ রেকর্ডার থেকে এখন বেরিয়ে আসছে একটা জেট প্রপেলড এয়ারক্র্যাফটের টেক-অফ করার আওয়াজ। ঠিক এই শব্দটাই শুনেছিল ও টেলিফোনে, আতিকুল্লাহ খান যখন ফোন করে উত্তর বাগাবোর একটা খালি বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে অনুরোধ করছিল ওকে।

সেট অফ করে ভেতর থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল রানা। 'অপরদিকে কিছু আছে, নাকি খালি?'

বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জাকের চৌধুরী। রানার প্রশ্ন যেন বুঝতেই পারেনি। ক্যাসেটের অপর দিকটাও পরীক্ষা করল রানা।

খালি। নড়েচড়ে বসল ও। কোলের ওপর থাকল রিভলভারটা। রেকর্ডারের বোতাম টিপে আবার সেটা অন করল, বলল, 'রেডি।' ইঙ্গিতে আলমিরায় সাজানো পার্সেলগুলো দেখাল জাকের চৌধুরী-কে। 'এই ড্রাগসই কি হাইজ্যাক করেছিল শফিক?'

জাকের চৌধুরীর সারা মুখ ঘামে ভিজে গেছে। ঘন ঘন ঢোক গিলল সে। তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কিভাবে এগুলো আমার কাছে আছে?'

'জানতাম না, অনুমানে বুঝেছিলাম। প্রথম থেকেই ছোট খাট অনেক ভুল আপনি করেছেন, অন্তত আমার মনে সন্দেহ জাগাবার জন্যে সেগুলো যথেষ্ট ছিল। সুজি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একটু বেশি কৌতূহল দেখিয়ে ফেলেছেন আপনি। খুন খারাবীর কাছ থেকে সাধারণত দূরে সরে থাকতে চায় মানুষ, অথচ পুলিশ আমাকে খুনী বলে সন্দেহ করছে জানার পরও আপনি আমার কাছে এসে তদন্তের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, যেচে পড়ে কিছু কিছু তথ্য দিয়েছেন, এমন কি জানতে চেয়েছেন আপনার কোন সাহায্য আমার দরকার আছে কিনা। ডিউককে এমনিতেই সবাই এড়িয়ে চলে, সুজি খুন হবার আগে পর্যন্ত আপনিও সযত্নে আমাকে এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু সুজি খুন হবার পর থেকেই আপনি আমার বুজুম ফ্রেণ্ড হয়ে গেলেন। এছাড়া আপনার উপায়ও ছিল না। পুলিশ কেসটা সম্পর্কে কি ভাবছে তা জানার দরকার ছিল আপনার, আমার কাছ থেকে ছাড়া আর কার কাছ থেকে জানতে পারতেন আপনি?' পকেট থেকে একটা ফটো বের করল রানা। জাকের চৌধুরীর ফটো। দাড়ি আঁকা। ডেস্কের ওপর, জাকের চৌধুরীর সামনে রাখল সেটা।

ফটোর দিকে চোখ পড়তেই আরেকবার শিউরে উঠল জাকের

চৌধুরী।

'আপনিই সেই নকল মৌলভী!' বলল রানা। 'পারভিন চিনতে পেরেছে আপনাকে। আপনিই শফিক আর পারভিনের বিয়ে পড়িয়েছেন। তার মানে শফিকের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন আপনি। ছোটখাট ভুল আপনি আরো করেছেন। পারভিন সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় আপনি বলেছিলেন, ওর সম্পর্কে তেমন কিছুই আপনার জানা নেই। অথচ পারভিনের বাবার নাম কি তাও আমাকে বলেছেন আপনি। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক নয়? আরো আছে। হংকং যাবার আগে আপনার অফিসে একবার ঢুকেছিলাম আমি, আপনার ডেস্কে তখন এই টেপ রেকর্ডারটা ছিল। এটার দিকে অন্তত একবার আড়চোখে তাকিয়েছিলেন আপনি, এবং আমি কিছু জিজ্ঞেস না করলেও আপনি উপযাচক হয়ে বলেছিলেন মাঝে মধ্যে গান টান শুনে সময় কাটান। আপনি যখন কথাটা বলেছিলেন তখনই আমি স্মরণ করার চেষ্টা করেছিলাম, কই, আপনার অফিস থেকে তো কখনও গানের আওয়াজ পাইনি। আজ আপনার সেক্রেটারী বরং উল্টো কথাই বলল, আপনি গান শোনার জন্যে টেপটা ব্যবহার করেন না। এমন কি, অফিসে আপনি গান-বাজনা পছন্দ করেন কিনা সে-ব্যাপারেও মেয়েটার সন্দেহ আছে।' একটু থামল রানা, তারপর আবার বলল, 'সব কিছুই নিরেট প্রমাণ নয়, কাজেই আপনার খুনী কিনা সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ খানিক আগে পর্যন্ত ছিল। কিন্তু আল মিরায [illegible] পার্সেল দেখার পর আমার সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটেছে।' হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল ও। ডায়াল করল পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে। [illegible] আহমেদকে চাইল ও। [illegible] বলল [illegible]। রিসি-

ভার রেখে দিয়ে জাকের চৌধুরীকে বলল, 'পুলিশী জেরার জবাব দেয়া বড় ঝামেলার কাজ। তারচেয়ে আপনি বরং একটা স্বীকারোক্তি দিন, টেপ হয়ে যাক। কি বলেন ? নিন, শফিক-পারভিনের বিয়েটা দিয়েই শুরু করুন।'

রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে সত্যিই কথা বলতে শুরু করল জাকের চৌধুরী। তার যে আর কোন আশা নেই এটুকু সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। বিয়ের পুরো ঘটনাটা গড়গড় করে বলে গেল সে। তারপর এল খুনের প্রসঙ্গে।

'আপনার সাথে ঘন ঘন কথা বলা উচিত হচ্ছে না, এটা আমিও বুঝতে পেরেছিলাম,' ভাঙা, শুকনো গলায় শুরু করল সে। 'জানতাম, কিছু একটা ভুল দেখে আপনার সন্দেহ জাগবে, আপনার চোখে ধরা পড়ে যাব আমি। আপনি হঙকঙ যাচ্ছেন শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, আপনাকে খুন করার জন্যে একটা গুণ্ডাকে ভাড়া করেছিলাম। কিন্তু তাতে যখন কাজ হল না, বুঝলাম, আমার কোন আশা নেই। শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরা পড়তেই হবে। কিছুই আমার করার ছিল না, ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া।'

'সুজির খুনী হিসেবে প্রথমে আমি সন্দেহ করি পারভিনকে, কারণ তার একটা মোটিভ ছিল।'

'আপনি যাতে পারভিনকে সন্দেহ করেন সেজন্যেই শফিকের সাথে তার বিয়ে এবং পরবর্তী ঘটনার কথা খুলে বলি আপনাকে। কিন্তু যখন শুনলাম আপনি হঙকঙ যাচ্ছেন, বুঝলাম, ওখানে আপনার সাথে শফিকের দেখা হবেই। আর শফিকের সাথে কথা বললে ব্যাপারটার সাথে আমি যে জড়িত তাও আপনার অজানা থাকবে না।'

'সুজি হিরোইন নিয়ে ঢাকায় আসছে তা আপনি জানলেন

কিভাবে?'

'সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। শফিক সম্পর্কে আপনাকে যা কিছু বলেছি সব সত্যি, শুধু একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম, ওকে আমি পছন্দ করি না। আসলে বরাবরই আমি ওর বন্ধু ছিলাম। আমাদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল। গত দু'বছর ধরে ব্যবসা করছি আমি, কিন্তু কোন রকম সুবিধে করতে পারছি না। আসলে যাকে বলে ব্যবসায়ী, আমি তা কোনদিনই হতে পারিনি। আমার ধৈর্য কম, এক লাফে লাখপতি হতে চাই। সেজন্যেই প্রতিটি বিজনেস ডিলেই আমি মার খেয়েছি। এ-ব্যাপারে শফিকের সাথে আমার পুরো মিল আছে। যাই হোক, ব্যবসার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমি। এই সময় শফিক চিঠি লিখে জানাল, তার কাছে প্রচুর হিরোইন আছে, আমি কি তা কিনতে রাজি আছি? আমি একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট, হিরোইন বিক্রি করার অনেক চ্যানেল আমার জানা আছে। প্রচুর পরিমাণে হিরোইন কেনার টাকা আমার কাছে না থাকলেও শফিকের প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে গেলাম। বোকার মতো শফিক আমাকে জানাল, হংকঙে আটকা পড়ে গেছে সে, সুজি যদি ঢাকায় গিয়ে টাকা যোগাড় করে ওর জন্যে জাল পাসপোর্ট আর প্লেন ভাড়ার ব্যবস্থা না করতে পারে, কয়েক হপ্তার মধ্যে খুন হয়ে যাবে সে। জানাল, দলের সাথে বেঈমানী করেছে সে, তারা ওকে খুঁজছে।' একনাগাড়ে কথা বলে হাঁপাতে শুরু করল জাকের চৌধুরী। একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল সে।

'আমি দেখলাম, ধনী হবার এই সুযোগ। কাজেই চিঠি লিখে শফিককে জানালাম, হিরোইন কিনব আমি। ঠিক হল, এয়ারপোর্ট

থেকে সরাসরি আমার কাছে আসবে সুজি কোয়াও, হিরোইন দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নেবে। কিন্তু কোন্ প্লেনে আসছে সুজি তা আমাকে জানায়নি শফিক। অথচ মনে মনে আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, সুজিকে খুন করব।' চোখ নামিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল জাকের চৌধুরী। হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে: 'একটা বিদেশী মেয়েকে খুন করা কঠিন বলে মনে হয়নি তখন। কিন্তু লাশটা নিয়ে কি করব, কোথায় লুকাব এসব আমার মাথায় ঢুকছিল না। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, আপনার অফিসেই করব খুনটা, ওখানেই থাকবে লাশ। পাশের কামরাটাই আপনার অফিস, তাই সেটাই সহজ হবে। শহরে এমনিতেই আপনার বদনাম আছে, সবাই জানে ডিউক একজন খারাপ লোক, পুলিশ আপনার কামরায় লাশ দেখলে আপনাকেই খুনী বলে বিশ্বাস করবে। সবাই ধরে নেবে চীনা মেয়েটা আপনার কোন মক্কেল ছিল, তাকে আপনি ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা ফেঁসে যাচ্ছে দেখে খুন করতে বাধ্য হয়েছেন।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল জাকের চৌধুরী। চোখ বুঁজে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। রিভলভারটা জাকের চৌধুরীর বুক লক্ষ্য করে ধরল।

একটু পর শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল জাকের চৌধুরী। ডেস্কের ওপর চোখ রেখে বলল, 'আগেই প্লেন টেক-অফ আর এয়ারপোর্টের আনুষঙ্গিক শব্দ টেপ করে রেখেছিলাম আমি। সেটা চালু করে আপনাকে এই অফিস থেকেই ফোন করি। সুজি এখানে এসে পৌঁছুবার আগেই অফিস থেকে আপনাকে সরাবার দরকার ছিল। আপনি আমার ফোন পেয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার

পর আপনার অফিসে গিয়ে বসলাম। আমার অপেক্ষার পালা শুরু হল। শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল সুজি কোথাও। আমাকে সে অবিশ্বাস করেনি। বলল, হিরোইনটা কফিনের ভেতর আছে। তারপর টাকা চাইল। দেরাজ খুলে আপনার পিস্তল বের করে গুলি করলাম ওকে।' থরথর করে কেঁপে উঠল জাকের চৌধুরী। 'তারপর বেরিয়ে এলাম। সে-রাতে এই অফিসেই একা বসে ছিলাম আমি···'

প্যাসেজে ভারি জুতোর আওয়াজ। এক মুহূর্ত পরই কামরায় ঢুকল ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ। জাকের চৌধুরী আর রানার দিকে একবার তাকিয়েই যা বুঝবার বুঝে নিল সে। গম্ভীর গলায় বলল, 'সাবাস, ডিউক। মাথা বটে একখানা। কিন্তু এই কেস সুরাহা করার কৃতিত্বটা কে নেবে বল তো?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'তুমি তো পুলিশে চাকুরি কর না,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'কাজেই কৃতিত্ব তুমি নিলেও তোমার পদোন্নতির কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমি একটা চাকরি করি, তাই কৃতিত্বটা যদি আমি নিই, প্রমোশন হয়ে যেতে পারে। কাজেই সমস্ত কৃতিত্ব আমাকেই নিতে হচ্ছে। বিনিময়ে ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকে বুদ্ধি ধার চাইব আমি, একটু খাতির আদর করব, তাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কি বল?'

ডিউকের ছদ্ম-পরিচয়ে থাকতে হবে রানাকে আরও বেশ কিছুদিন। সাধারণ মানুষের চোখে সে এক দুঃসাহসী গুণ্ডা, বেপরোয়া মস্তান; পুলিশের চোখে সে একটা প্রব্লেম—ওর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দাঁড় করান যাচ্ছে না বটে, কিন্তু লোকটা সে বেয়াড়া, ত্যাঁদোড় এবং ধুরন্ধর; আর এন. এস. আই-এর চোখে সে অত্যন্ত

সৎ এক যুবক, বড় সাহেবের সাথে ঝগড়া করে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে বেরিয়ে এসে অধঃপাতে যাচ্ছে। আসলে বুড়ো মেজর জেনারেলের (অবঃ) নির্দেশ : এই ভাবেই কাটাতে হবে আরও কিছুদিন, কি নাকি বিশেষ কাজ আছে, যার জন্যে রানার এই পরিচয় দরকার। ঠিক আছে, রানা ভাবল, এই বোকাটা খুশি থাকলে ভালই হবে—ভবিষ্যতে কাজ দেবে। মুচকি হাসল ও। বলল, 'তাই তো! আমি আর কি করলাম? সবই তো আপনার কৃতিত্ব!'

একগাল হাসল ফয়েজ আহমেদ। 'তোমার ফোন পেয়েই বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই ডিউক খুনের একটা সুরাহা...'

'দুর! কে বলল আমি ফোন করে আপনাকে ডেকেছি? আপনিই না আমাকে ফোন করে বললেন, যেন সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকি, হাতকড়া নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন আপনি পাঁচ মিনিটে!'

'ঠিক, ঠিক!' দুই কানে গিয়ে ঠেকল ফয়েজ আহমেদের হাসি। তারপর কটমট করে চাইল জাকের চৌধুরীর দিকে। দৃঢ়পায়ে এগোল সামনে।

মাথা নিচু করে বসে আছে জাকের চৌধুরী। চোখ থেকে টপ টপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে কোলের ওপর।

রাত এগারটা। মীর মঞ্জিল।

বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান তাঁর লিভিংরুমের সেই বেড সাইড চেয়ারে বসে আছেন। জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে তাঁর উদাস দৃষ্টি। সব হারাবার যাতনা তাঁর বয়স যেন আরো দশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখেমুখে বেদনার ছাপ।

নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকে রানা দেখল, আজ বিকেলে ঠিক যেখানে যেভাবে দেখে গিয়েছিল ভদ্রলোককে, এখনও সেখানে সেভাবেই বসে আছেন তিনি, যেন সেই থেকে একচুলও নড়েননি।

'কে ?' রানার দিকে তাকালেন না তিনি। 'ডিউক ?'

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসল রানা। হাতের টেপরেকর্ডারটা টেবিলের ওপর রাখল। 'জ্বী।'

'তুমি আবার দেখা করতে চেয়েছ শুনে আমি একটু বিরক্তই হয়েছি,' স্পষ্টভাবে বললেন মোখলেসুর রহমান। 'কিন্তু প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ তুমি, তাই দেখা না করে পারলাম না। ব্যাপারটা কি ? আমাকে একটু একা থাকতেও দেবে না ?'

'আপনি বিরক্ত হয়েছেন, সেজন্যে আমি ক্ষমা চাই,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি আপনার পরিবারের মঙ্গল কামনা করি, সেজন্যেই আবার আমাকে আসতে হয়েছে। আপনার দ্বিতীয় পুত্রবধূর খুনী ধরা পড়েছে, শুনেছেন নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ। ইন্সপেক্টর ফয়েজ আহমেদ ফোন করেছিল খানিক আগে। লোকটাকে যত বোকা মনে করতাম, এখন দেখছি তত বোকা নয় সে। যাক, তোমার ব্যাপারটা কি ?'

'আমি এসেছি আপনার প্রথম পুত্রবধূ সম্পর্কে আপনাকে একটা কথা জানাতে…'

'প্রথম পুত্রবধূ।' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালেন মীর মোখলেসুর রহমান। 'কি বলতে চাও তুমি ?'

'আপনার ছেলে সুজিকে বিয়ে করার আগে ঢাকায় আরেকটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল, তাই না ?'

'করেছিল। কিন্তু আমার ছেলে কথাটা স্বীকার করেনি। কাজেই আমিও সেই বিয়ের স্বীকৃতি দিইনি। যে বিয়ে করেছিল সে-ই যখন স্বীকার করেনি, আমার কিছু করার ছিল না। পুরনো ঘা খুঁচিয়ে লাভ কি। সেই ঘটনা এখন মৃত অতীত, ভুলে যাওয়াই সবার জন্যে ভাল।'

'ঘটনাটা বোধহয় মৃত বা অতীত নয়,' বলল রানা। 'বিয়েটা যে হয়েছিল, তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।'

'অসম্ভব!' চেয়ারের ওপর সিধে হয়ে বসলেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান। 'পারভিনকে আমি জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, ওদের বিয়ের বরযাত্রীরা সবাই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। নকল এক মৌলভী ওদের বিয়েটা পড়িয়েছিল, কিন্তু পরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমিও কম খুঁজিনি তাকে। কোথাও পাইনি।'

'আমি পেয়েছি।' বলল রানা।

'হোয়াট! কি বললে!' উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ।

'শফিকেরই একজন বন্ধু ছিল সে, জাকের আলি চৌধুরী। সে-ই খুন করেছে সুজিকে। পারভিন আর শফিকের বিয়ে সে-ই পড়িয়েছিল। তা স্বীকার করেছে সে।' বলে টেপটা অন করে দিল রানা।

গোড়া থেকেই পারভিনকে চিট করার ইচ্ছে ছিল শফিকের,' টেপ চালু হতেই জাকের আলি চৌধুরীর গলা শোনা গেল। 'ঠিক হয়, নকল মৌলভী সেজে বিয়েটা আমিই পড়াব। বরযাত্রী থাকবে আমাদেরই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু, যারা পরে এই বিয়ের কথা অস্বীকার করবে। এরা ভবিষ্যতে বেঈমানী করত কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু শফিকের ভাগ্য বলতে হবে যে এরা সবাই শহরে ফেরার

পথে অ্যাক্সিডেন্ট মারা যায়। একমাত্র আমিই বেঁচে গিয়েছিলাম। মুখ বন্ধ রাখার জন্যে শফিক আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিল। তা-ছাড়া, ও ছিল আমার একমাত্র বন্ধু, ওর সাথে বেঈমানী করার কথা আমি কোনদিন ভেবেও দেখিনি—অন্তত এই ব্যাপারে। ইসলামী রীতি অনুযায়ী ওদের এই বিয়েটা নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। যেহেতু গোটা ব্যাপারটাই চিটিং, তাই দশ লাখ টাকা দেনমোহরে আপত্তি করেনি শফিক। আমি হলপ করে বলছি, পারভিন শফিকের আইন সম্মত স্ত্রী…'

থরথর করে কাঁপছেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল রানা। 'আ-আমাকে নয়।' কাঁপা গলায় বললেন তিনি। 'আমি ঠিক আছি। তুমি এখুনি ছুটে গিয়ে পারভিনকে ধরে নিয়ে এস, বাবা। শুনেছিলাম ওর একটা ছেলে হয়েছে, আমার নাতি, কোথায় সে। আমার বংশে বাতি দেবার জন্যে এখনও তাহলে আছে একজন। কোথায়। কোথায় সে? বৌমা। পারভিন। বৌমা।' বৃদ্ধের দু'চোখ বেয়ে আনন্দ-অশ্রু নামল। 'দাঁড়িয়ে থেক না, বাবা। তুমি আমার জন্যে যা করেছ, এ ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। আরেকটু কর। প্লীজ, মাই বয়। আমার বৌমাকে ডেকে নিয়ে এস, আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, আমার নাতি কোথায়…'

বৃদ্ধকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল রানা। বলল, 'উত্তেজিত হবেন না। আপনার নাতিকে আমি বোর্ডিং স্কুল থেকে নিয়েই এ বাড়িতে এসেছি।' দরজার দিকে তাকাল রানা। গলা একটু চড়িয়ে বলল, 'বাটলার, নিয়ে এস ওকে।'

ছয় বছরের মীর সাদেকুর রহমানকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল বাটলার।

রানার হাত সরিয়ে দিয়ে আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান। অস্থির পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে বাটলারের কোল থেকে একরকম ছিনিয়ে নিলেন নাতিকে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরময় পায়চারি শুরু করলেন তিনি, পায়চারি না বলে নাচানাচি শুরু করলেন বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

মাথায় ঘোমটা দেয়া একটা নারী মূর্তি দেখা গেল খোলা দরজার পাশে। সেদিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বৃদ্ধ। তারপর ছুটে গেলেন সেদিকে। 'মা! বৌমা!'

ঘরে ঢুকে শ্বশুরের পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসল পারভিন। কদমবুসি করে উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। পুত্রবধূর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধ মোখলেসুর রহমান।

—শেষ—